6/12

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-I

No. 2/18

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

26.9.76				
25-2.77				

2/18

書/[illegible]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

৫ম ভাগ

LIBRARY
No. 2/18
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চম ভাগ

প্রাপ্তিস্থান

১। আনন্দময়ী আশ্রম, ২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস।

২। আনন্দময়ী মন্দির,
৪।৪, একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

৩। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু সেন,
কুইন্সওয়ে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, নিউ দিল্লী।

৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য,
'রুবীলজ', রিসলদারবাগ, লক্ষ্ণৌ।

৫। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,
"দেবালয়", ২৮, ডি, এ, ভি, কলেজ রোড, দেরাদুন।

৬। শ্রীযুক্ত সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়,
১২৯ এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চম ভাগ

[জ্যৈষ্ঠ—চৈত্র ১৩৪৪]

ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস

—প্রথম মুদ্রণ—
আশ্বিন, ১৩৫৫

দুই টাকা মাত্র

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, ৪।৪ একডালিয়া রোড হইতে শ্রীকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ৩।১ মোহনবাগান লেন কলিকাতা হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রিন্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত

প্রকাশকের কথা

এই ভাগের বিশেষ কথা যে, কৈলাশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে জ্যোতিষচন্দ্র রায় মহাশয় আলমোড়ায় পাতালদেবী নামক স্থানে পরলোক গমন করেন। তার পূর্ব্বেই মানস সরোবরে তাঁহার এক দিব্য তীব্র অবধূত ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল ও মায়ের শ্রীমুখ হইতে স্বতঃই সন্ন্যাস মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় জ্যোতিষবাবু—"পেয়েছি, পেয়েছি"—বলিয়া মানবের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পান। এইরূপে তাঁহার "বিদ্বৎ-সন্ন্যাস" আপনা আপনি হইয়া যায়। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে পাকস্থলীতে ক্ষত হইয়া মায়ের সন্তান তাঁহার চিরশান্তিময় ক্রোড়ে স্থান নিলেন।

তাঁহার অসুস্থাবস্থায় তাঁহার প্রতি মায়ের যে সন্তান ভাব প্রকাশ হইয়াছিল ও তাঁহার মৃত্যুতে বাহ্যভাবে মায়ের যে বিষাদ মূর্ত্তি আমাদের চোখে পড়ে তাহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মর্ম্মস্পর্শ করে।

সন্ন্যাসের পর মায়ের প্রশ্নে জ্যোতিষবাবুর উত্তর—"আমার কি কিছু স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিয়াছেন?"—আবার—"আমি ত জানি, আমি যাহা কিছু করিতেছি আপনিই করাইতেছেন……" ইত্যাদিতে আমরা যেন লক্ষ্য খুঁজিয়া পাই, অনুভব করি তাঁহার হাতের যন্ত্র হইয়া তাঁহার সেবাই পরম ও চরম গতি। মাতৃদর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণ পান্থের পত্রেও এই মহাপুরুষের শেষ গতির আভাষ আছে।

শেষ ভাগে কুম্ভ স্নান উপলক্ষ্যে মার হরিদ্বার অবস্থানকালে শ্রীমুখ-নিঃসৃত যে সাধনার বিবরণ ও পূর্ব্ব কথার ইতিহাস আমরা দেখি—তাহাতে

কি করুণাবৃষ্টি যে নিরন্তর আমাদের কল্যাণে হইতেছে, তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। "কল্যাণবণে"র ঘটনাটি মায়ের চরিত্রে আলোকপাত করিয়া আমাদের আরও বিস্ময় উৎপাদন করে।

যাঁহাদের আনুকূল্যে এই পুস্তক প্রকাশ সহজসাধ্য হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস সর্ব্বপ্রধান। শ্রীযুক্তা যূথিকা দেবীর চিত্র-সংগ্রহ হইতে এই পুস্তকের চিত্র নির্ব্বাচনে সাহায্য পাইয়াছি। মুদ্রণকার্য্য, বাঁধাই ইত্যাদি অতি দ্রুত হওয়া সত্বেও যথাসাধ্য সুন্দর করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে— তাহার পরও যে সব ভুল-চুক থাকিল তজ্জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। এই গ্রন্থ পাঠে কোন মাতৃ সন্তানও যদি আনন্দ পান তবেই ইহা সার্থক।

মহালয়া—১৩৫৫
আনন্দময়ী আশ্রম,
২।৯৪ ভদৈনী, বেনারস

বিনীত—
প্রকাশক

বিষয়-সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
কৈলাস যাত্রা	১
প্রত্যাবর্ত্তন	৬১
ভাইজীর মৃত্যুশয্যা	৯৩
ভাইজীর মহাপ্রয়াণের পর মা	১২৮
নর্ম্মদা ব্যাস ও চান্দোদের পথে	১৩০
তারাপীঠে	২০৯
দাদামহাশয়ের দেহরক্ষা	২৪৯
হরিদ্বারে মা-নানাকথা	২৬২

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চম ভাগ

প্রথম অধ্যায়—কৈলাস যাত্রা

৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার, বাং ১৩৪৪ সাল, ইং ১৯৩৭ সাল—আজ বেলা ৮টায় আমরা 'মা'র সহিত কৈলাসের পথে যাত্রা করিলাম। সঙ্গীয় সকলে আলমোড়া হইতেই নীচে ফিরিবেন। মাকে ছাড়িবার সময়ে সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে নগেনদাদা, দিল্লী হইতে নরেন চৌধুরী সপরিবারে আসিয়াছিলেন, দেরাদুন হইতে হরিরাম ও মাণিক সঙ্গেই ছিল—সকলেই ফিরিয়া গেল। মা, আমি, ভোলানাথ, জ্যোতিষদাদা, অখণ্ডানন্দস্বামী, টুনু (প্রাণকুমার বাবুর ছেলে), দাসুদা ও একটি চাকর (কেশব সিং), রওনা হইলাম। পাহাড়ী মেয়ে পার্ব্বতীও আমাদের সঙ্গে চলিল। মার সঙ্গে যাইবে বলিয়া সে আলমোড়ায় অপেক্ষা করিতেছিল।

কৈলাস যাত্রা

বেলা ১১টায় আমরা 'বারছিনা' নামক স্থানে একটা ফরেষ্ট বাংলায় পৌছিলাম। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। তথায় আমরা জল খাইয়া বেলা ৩টা অবধি বিশ্রাম করিলাম। এই বাংলাটি আলমোড়া হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। তথা হইতে রওনা হইয়া আরও প্রায় ৫৷৷০ মাইল দূরে 'ধবলচিনা'তে আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৌছিলাম। তথায় রান্না ও

খাওয়া হইল, আমরা রাত্রিটা ডাকবাংলার বারান্দায় কাটাইলাম। সোমবার ৩১শে ভোর পাঁচটায় আবার রওনা হইয়া ১১ মাইল দূরে অবস্থিত 'সেরাঘাটে' পৌছিলাম।

সেরাঘাটে নদী সামনে, বড় বড় কয়েকটি গাছ আছে, আমরা গাছ-তলায় পাক করিয়া খাওয়া দাওয়া করিলাম। পরে গাছতলাতেই শয়ন করিয়া রহিলাম। রৌদ্রে পথ চলাই দুষ্কর। প্রায় দশ বার জন কুলি বোঝা নিয়াছে। ডাণ্ডি ৫টি আসিয়াছে তাহার সঙ্গেও ২৫ জন কুলি। পার্ব্বতীর সঙ্গে আরও একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশু-কন্যা ও ভাইকে নিয়া চলিয়াছে। তাহাদের সঙ্গেও দুইজন কুলি। কুলিরাও পৌছিয়া গাছ-তলায় রুটি করিয়া খাইল, পরে সকলেই বিশ্রাম করিতে লাগিল। ২৫ সেরের অধিক একটা কুলি নিতে পারে না। আলমোড়ার টুনুর জন্য ঘোড়া পাওয়া গেল না—রাস্তা হইতে ঘোড়া নেওয়া হইবে। একটা ডাণ্ডি খারাপ থাকায় সেরাঘাটে আর একটা ডাণ্ডি যোগাড় করিয়া লওয়া হইল।

একখানা করিয়া দোকান এখনও দেখিতেছি, তাহা হইতেই ডাল, চাল, ঘি, লবণ, ইত্যাদি, আনিয়া নেওয়া হইতেছে। শুনিতেছি, পরে ইহাও পাওয়া যাইবে না। সঙ্গেও কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী আনা হইয়াছে। গারবিয়ানের উপরে নাকি কিছুই পাওয়া যায় না তাই 'মেওয়া'—(শুষ্ক ফল), মিশ্রি, গোল মরিচের গুঁড়া, তেঁতুল, আচার, এই সব সঙ্গে আনা হইয়াছে। বরফের পথে চলিতে নাকি এ'সব সঙ্গে দরকার হয়। গরম কাপড়, চশমা, ওয়াটার প্রুফ, সবই সঙ্গে রাখিতে হয়। শুনিলাম, গারবিয়ানের পরে পথ চলিতে চলিতে অনেকে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। সেইজন্য আলমোড়া হইতে একটি স্ত্রীলোক গোলমরিচ, আমচুর এবং আরও কি কি মিলাইয়া পাউডার তৈরী

করিয়া দিয়াছে। সে বলিয়াছে যে, ইহা খাইলে মাথা ভাল থাকে। গারবিয়ানের পরে নাকি আগুন আর বড় জ্বালান যায় না। আটা, ছাতু জলে গুলিয়া খাইয়া সকলে পথ চলে। জিনিষের দামও অসম্ভব।

বেশ আনন্দে সকলে চলিয়াছে। তবে মার, আমার ও জ্যোতিষ-দাদার শরীর বড় ভাল নয়। আজ ভোলানাথ অনেকটা হাঁটিয়াছেন। মা ও অখণ্ডানন্দজীও কিছু কিছু হাঁটিয়াছেন। আমি ও জ্যোতিষদাদা ডাণ্ডীতেই ছিলাম। হিমালয় পর্ব্বতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা নূতন করিয়া আমি কি লিখিব, অনেকেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। শুধু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্যই বোধ হয় সকলে এই দুরূহ পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এই পথ, তার মধ্যে মা সঙ্গে। মা যখন পাহাড়ে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন, ডাণ্ডীতে বসিয়া দেখিলাম, দূরে অপূর্ব্ব দৃশ্য। মায়ের রূপ যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। বাহুল্য কথা লিখিতেছি না, প্রাণ যাহা জানিল তাহাই লিখিলাম। মার সমস্ত শরীরে যে একটা নিঃসঙ্কোচ মহান ভাব, সরল-সুন্দর দৃষ্টি, তাহা যেন এই পথে খুব মানাইয়াছিল; তাই বোধ হয় এতটা মনমুগ্ধকর রূপ দেখিলাম। আর মার রূপও বাড়িতেছে কি না, বুঝি না!

কলিকাতা হইতে রায়তারণবাবু (advocate) লিখিতেছেন, "বিড়লার মন্দিরে আমি দূরে দাঁড়াইয়া মার মূর্ত্তি দেখিতাম—নিরাভরণা, কিন্তু মা আমার কি সৌন্দর্য্যই না ছড়াইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে কত স্ত্রীলোক কত সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়া আছে কিন্তু, মার রূপের কাছে তাহাদের যেন মলিন দেখাইত! আর মার হাসিটুকু, কখনও মৃদু, কখনও উচ্চ, কি মধুর সেই হাসি! আজও তাহা চিন্তা করিতে করিতে সব ভুলিয়া যাই!" সত্যি, মার গমনের ভঙ্গিই বা কত সুন্দর! ইহা ভক্তের কথা নয়, একদিনও যিনি মাকে দেখিয়াছেন তিনিই ইহা স্বীকার করিবেন।

আমি বলিতাম, "মা, তুমি যেন পূর্ব্বের চেয়ে কত লম্বা হইয়া গিয়াছ।" মা হাসিয়া বলিতেন, "কি যে বল, বুড়া বয়সে লোকে লম্বা হয় নাকি?" মার শরীর এখন একটু মোটা হইয়াছে, তার মধ্যে মানানসই লম্বার, চেহারা যেন ঝক্‌ঝক্ করে। আমি বলিয়াছিলাম, "মা, বড়ই শুকাইয়া গিয়াছ, এখন একটু মোটা হও।" মা বলিতেন, "আচ্ছা, দেখিও নিশ্চয়ই মোটা হইব।" মোটা হইয়া বলিলেন, "দেখ মোটা হইলাম।" আমি কয়েকদিন হয় দেখিতেছি একটু মোটা হওয়াতে মার চলাফেরার যেন তেমন শক্তি নাই। তাই আবার বলিলাম, "না মা, আর মোটা হইও না এখন একটু চিকণ হওয়াই ভাল।" মা একদিন একজনের কাছে বলিতেছেন, "এবার একটু শুখাইব, কারণ খুকুনীই—'মোটা হও,' 'মোটা হও' বলিত, মোটা হইলাম, এখন আবার সে'ই বলিতেছে যে, একটু শুক্‌না থাকা ভাল। এখন একটু শুখাইতে হইবে।" আমি জানি নিশ্চয়ই শুখাইবেন। সবই যে মার ইচ্ছাধীন, ইহা তাহারই একটু প্রমাণ মাত্র।

যাক, আজই বৈকালে আরও কিছু খাইয়া, রাত্রির জন্য একস্থানে আশ্রয় নিতে হইবে। মেঘ করিয়াছে। বেলা ৩টায় আমরা ৭ মাইল দূর 'গণই' নামক স্থানে রওনা হইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তথায় পৌছিলাম। এখানেও একটি ডাকবাংলায় আমরা রাত্রি কাটাইলাম। এখানে একটি ডাকখানা আছে। সকলে ডাকবাংলায় থাকিবার অনুমতি পায় না। আমরা চিঠি নিয়া আসিয়াছিলাম। এখানে আসিতে পথে আমাদের সঙ্গিনী, গারবিয়ানের মেয়ে পার্ব্বতী একটি ঘটনা বলিল। ঘটনাটি এই,— প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন নিজের গ্রামে ছিল তখন সে একদিন রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, কতগুলি লোকের সঙ্গে সে কোথায় যেন যাইতেছে! লোকগুলির চেহারা তাহার চোখে ভাল করিয়া ভাসে নাই। মার

চেহারা দেখিয়াছিল, যেন সাদা কাপড় পরা এক মাতাজী। ভোলানাথের চেহারা তাহার চোখে পরিষ্কার ভাসিয়াছিল। এই স্বপ্ন দেখার পরই সে শিক্ষার জন্য আলমোড়া আসে, আবার এই পাঁচ বৎসর পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আমাদের সঙ্গে দেশে চলিল। গতবার যখন এই পার্ব্বতী আমাদের আলমোড়ায় দেখিয়াছিল, তখনই নাকি ভোলানাথকে দেখিয়া তাহার স্বপ্নের কথা মনে হইয়াছিল এবং ইহার সঙ্গে নিশ্চয়ই কৈলাস যাইবে, স্থির করিয়াছিল। আর মা'ও বিশেষ করিয়া ইহাকেই, আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন। একমাস যাবৎ সে, আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কি আশ্চর্য্য সংযোগ! গতবার সে স্বপ্নের কথা বলে নাই। এ'বারই বলিল। মা ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "স্বপ্ন পূরণ করিবার জন্যই আলমোড়া পড়িতে আসিতে হইয়াছিল।" এ স্থানটিও বেশ সুন্দর।

এখানে আসিবার সময় রাস্তায় এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করিল, "মাতাজী কোথায়?" মার ডাণ্ডী দেখাইয়া দেওয়াতে সে মার চরণে ফুল ও কিছু ফল দিয়া প্রণাম করিল। রাত্রিতে আমাদের বাংলায় সেই ব্রাহ্মণটি মার জন্য নিজের গরুর একটু দুধ ও কিছু শাক নিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "আপনি কি করিয়া জানিলেন যে, মাতাজী আসিতেছেন?" তিনি বলিলেন, আমি পত্রিকায় দেখিয়াছি যে 'মা আনন্দময়ী' কৈলাস যাত্রা করিয়াছেন। সেই অবধি মার দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আজ মার চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম।"

আরও যে কত ভক্ত এইদিকে পড়িয়া আছে কে জানে? তাই করুণাময়ী বাংলা ছাড়িয়া এইদিকে ছুটিয়া আসিয়াছেন। এখন দেখিতেছি কত অল্প পরিচয়ে ইহারা মাকে কত আপন বলিয়া, 'দেবী ভগবতী' বলিয়া, সরল প্রাণে বিশ্বাস করিতেছে।

১লা আষাঢ়, মঙ্গলবার—আজ আমরা 'গণই' হইতে বেলা প্রায় ৬টায় 'বেনিনাগ' রওনা হইলাম। ১৩ মাইল দূরে 'বেনিনাগ', সেখানে জলের সুবিধা আছে বলিয়া আমরা তথায় খাওয়া দাওয়া করিয়া দুপুরে বিশ্রাম করিব স্থির করা হইয়াছে। একটি কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে : আমরা আসিবার পূর্ব্বদিন আলমোড়াতে নরেনবাবুর স্ত্রী মাকে একখানা রেশমী বড় লাল পেড়ে সাড়ী পরাইয়া মাথা আঁচড়াইয়া ফুলের মালা দিয়া একখানা ফটো উঠাইলেন। পরে বলিলেন, "মা, তোমার মাথায় কাপড় কখনও দেখি নাই আজ মাথায় কাপড় দিয়া দেখিব।" মা বলিলেন, "না, যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক।" পরে করুণাময়ী শিব মন্দিরে গিয়া মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। রূপ দেখিয়া উপস্থিত ভক্তেরা চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। মা বলিলেন, "কি, বৌ সাজাইয়াছ ?" নরেনবাবু বলিলেন, "একি, মাকে কি আর বৌ সাজান যায় ?" রহস্যময়ী আবার স্ত্রীলোকের মত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইলেন, ভক্তেরা হো হো করিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। আসিবার দিনও নরেনবাবু মার ফটো নিলেন।

গণই হইতে বেনিনাগ যাত্রা।

দুপুরে 'বেনিনাগ' পর্য্যন্ত না আসিয়া ১০ মাইল দূরে "রাণী" নামক স্থানে খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা ৩টায় আমরা 'বেনিয়ানাগ' রওনা হইলাম। পথ খুব চড়াই, সন্ধ্যার সময় বেনিয়ানাগ পৌছিয়া উপরে ডাকবাংলোয় না গিয়া একটা স্কুলের বারান্দায় রহিলাম। সেইখানেই রাত্রি কাটাইলাম। সুন্দর স্থান! আমাদের সঙ্গের একজনের কুটুম্ব এইখানে আছে, তাহার বাড়ী হইতেই সকলের নিমন্ত্রণ আসিল। এই জায়গায় বেশ দোকান পসার আছে। স্কুল, ডাক্তারখানাও বেশ ভাল। অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিলেন।

২রা আষাঢ়, বুধবার—আজ ভোর ৫॥০ টায় আমরা ১০।১১ মাইল দূরে "থালায়" চলিলাম। রাস্তায় ২।১ মাইল চলিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা বিশ্রাম করে, এক স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিতেছে। হাসি ঠাট্টায় জ্যোতিষ দাদা অখণ্ডানন্দ স্বামীজীকে এই দলের "রাজা" ও নিজেকে "যুবরাজ" বলিয়া বলিলেন। তারপর ডাণ্ডি উঠাইয়া আবার যখন কুলিরা অপর স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিবে তখন দেখা গেল স্বামীজীর ডাণ্ডি হঠাৎ পাথরে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর একটা বাক্সের খোঁচা খাইয়া জ্যোতিষ দাদার উরুতে রক্ত বাহির হইয়াছে, কাপড়ও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তখন রাস্তায় বসিয়াই এই কথা নিয়া হাসি হইল, আমি বলিলাম, "নিজেদের কর্ত্তা মনে করিয়াছিলেন, তাই রাজার ও যুবরাজের এইটুকু আসিতেই এই অবস্থা; মা'ও হাসিলেন।" জ্যোতিষদাদা হাসিয়া বলিলেন, "এই কথাটি তোমার নোটবুকে নোট করিয়া রাখিও।" বাস্তবিকই, ভাবিলে এই কথাটির দাম আছে।

যাক্, একটু দূর যাইতেই এক পাহাড়ী বুড়ী মাথায় কি নিয়া চলিয়াছে দেখিয়া মা ডাকিলেন, "মাতাজী কোথায় যাও?" বোঝা মাথায় করিয়াই সে জবাব দিল, "ওদিকেই যাই,"—এই বলিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, আমাদের ডাণ্ডি তখন পথে রাখিয়া কুলিরা বিশ্রাম করিতেছিল। বুড়ী মার দিকে একটু চাহিয়া আর গেল না। ধীরে ধীরে মার কাছে আসিয়া বসিল। সঙ্গে কয়েকটি ছেলেমেয়ে। বুড়ীর পোষাক দেখিয়াই বোঝা যায় তাহার অবস্থা ভাল আর চেহারাও বুদ্ধিমতীর। ধীরে ধীরে বুড়ী মার কাছে অনেক কথা বলিল। যখন কুলিরা ডাণ্ডি উঠাইয়া চলিল তখন বুড়ীও উঠিয়া বলিল, "মা, তোমার কথা কেমন মিষ্টি লাগিতেছিল তাই যাইতে পারিলাম না তোমার কাছে বসিলাম। আমরা গরীব মানুষ তোমার সঙ্গে কি কথা

মায়ের আকর্ষণী শক্তি।

বলিব—তোমার কথা শুনিতেই বসিয়াছিলাম।" যখন ডাণ্ডি অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে তখনও দেখিলাম বুড়ী দাঁড়াইয়া দেখিতেছে।

আজ বেলা ১০টায় 'থালায়' পৌঁছিয়াই একটা স্কুলের বারান্দায় স্থান নিলাম। এখানেও পোষ্ট অফিসাদি আছে। সেরাঘাটে সরযূ নদী দেখিয়াছিলাম, এখানে সশব্দে 'রামগঙ্গা' প্রবাহিতা। এই স্থানটিও অতি মনোরম। পর্ব্বতের মহান্ দৃশ্য স্বতঃই প্রাণে বিশাল ভাব জাগাইয়া দেয়। এই যে যাত্রা, ইহার ফল আর কিছু হউক না হউক, পর্ব্বতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রাণে যে মুক্ত ও মহান্, স্থির-ধীর ভাবটি জাগাইয়া দেয় তাহার তুলনা নাই। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দর! যাঁহারা এই পথে চলিয়াছেন তাঁহারাই আমার এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। ভাষায় আমার প্রাণের ভাষা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যাক্, আজ রাত্রিতেও আমরা এখানেই কাটাইব স্থির হইল।

৩রা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—আজ ভোরে আমরা 'থালা' হইতে আবার রওনা হইলাম। এখনও খুবই গরম পাইতেছি, অবশ্য রাত্রিতে কম্বল গায় দিতে হয়, জল ঠাণ্ডা হইয়া উঠিয়াছে। দুই দিন যাবৎই জল খুব ঠাণ্ডা পাইতেছি। আজ আমরা ১০ মাইল দূরে "ডেড়িঢাট" গিয়া দুপুরে বিশ্রাম করিলাম। পথে 'আস্কোটের' রাজার সহিত দেখা হইল। তাঁহারা ও দিনাজপুরের রাজার সহিত জ্ঞানানন্দ স্বামী, কৈলাস-যাত্রা করিয়াছেন—তাঁহার মুখে মার কৈলাস যাত্রার খবর পাইয়াছেন। পথে তাঁহারা মার খোঁজ করিতে করিতে আসিয়াছেন, বলিলেন। মার চরণ বন্দনা করিয়া আস্কোটে চিঠি দিয়া দিলেন যাহাতে মার কোনও অসুবিধা না হয়।

ডেড়ি ঢাট।

আমরা খাওয়া দাওয়ার পর ৭ মাইল দূর আস্কোটে চলিলাম, শুনিলাম

সেখানে বেশ ভাল ধর্ম্মশালা আছে। আমরা ধর্ম্মশালায়ই থাকিব স্থির হইল। আজ সকালবেলা আমরা বৃষ্টিতে পথে খুব ভিজিয়াছি। আস্কোটের রাজার সহিত টিহরীর রাজার সম্বন্ধ আছে শুনিলাম। পাহাড়ী রাজাদের খুব নিয়ম নিষ্ঠা। যদিও টিহরীর রাজা বিলাতে গিয়াছেন, নিজের রাজধানীতে খাওয়া দাওয়া সব বিষয়েই পুরাপুরি হিন্দুয়ানী বজায় রাখিতে হয়। এই আস্কোটের রাজারও শুনিলাম খুব হিন্দুয়ানী। যখনই যেখানে যান নিজের দেশ হইতে ঠাকুর লইয়া যান। পূজা সন্ধ্যা খুব করেন। সোলনের রাজারও দেখিয়াছি এই রকম। শুদ্ধ বস্ত্র পরিয়া খাওয়া দাওয়া করেন। চেহারায় একটা শুদ্ধ ভাবের আভাষ পাওয়া যায়।

আস্কোটে রাজপরিবারের মাকে সম্বর্দ্ধনা।

যাক্ আমরা সন্ধ্যায় আস্কোটে আসিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। রাজার চিঠি দেখিয়া সকলে আসিয়া আমাদের কি কি দরকার হইবে খবর নিতে লাগিল। সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। একটু রাত্রি হইলে রাজ-ভগ্নী ও রাজভ্রাতারা ভ্রাতৃবধূ ও মেয়েদের সকলকে নিয়া মার দর্শনে আসিলেন। পাহাড়ের হাওয়ায় আমাদের সকলেরই দুর্ব্বলতা কমিয়া আসিতেছে। স্বামীজীর ডাণ্ডি আবার মেরামত করিয়া নেওয়া হইল। পথে ডাণ্ডি পাওয়া যায় না। কুলিরা ভয়ানক পরিশ্রান্ত, 'গারবিয়ান' পর্য্যন্ত যাওয়া মুস্কিল। এই সব কুলিরা ২৫ সের কি ৩০ সেরের বেশী মাল নিতে পারে না। প্রত্যেক কুলির মজুরী প্রত্যহ ১৲ টাকা।

২৩। আষাঢ়, শুক্রবার—আমরা আজ সকালে আস্কোটেই খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব স্থির হইয়াছে। দেখিতেছি রাস্তায় রাস্তায় মার আসিবার খবর অনেকে পাইয়াছেন এবং মার দর্শনের অপেক্ষা করিতেছেন। আমি

বালিয়াকোট রওনা।

হাসিয়া বলিলাম, "মা, তোমার এত ছেলে এদিকে থাকিতে তুমি শুধু বাংলায় বসিয়া থাকিবে কেন? তাই ছুটিয়া এদিকে আসিয়াছ।" রাজার পেস্কারের স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই ফুল ফল নিয়া মার দর্শনে আসিলেন। রাণী বেলা ১০ টায় লোক পাঠাইয়া মাকে রাজবাড়ী নিয়া গেলেন। তথায় নিজে নানারকম খাদ্য সামগ্রী করিয়া মাকে ভোগ দিলেন। শুনিলাম রাজার যে ভ্রাতা আলমোড়া আছেন, তিনি চিঠি দিয়াছেন যে মাকে যেন বিশেষ আদর যত্ন করা হয়।

আজ রাজ-ভ্রাতাদের অনুরোধেই দুপুরে এখানে খাওয়া দাওয়া করা ঠিক হইয়াছে। রাজবাড়ী হইতেই সব খাওয়া দাওয়ার জিনিষ পত্র আসিয়াছে। আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা ১টায় ১০ মাইল দূর "বালিয়াকোট" রওনা হইলাম। পথে মাকে পেস্কারের বাড়ীতে নিয়া গেলেন। তথায় খুব আদর যত্ন করিলেন। পুনরায় ঐ রাস্তা দিয় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া দিলেন। রাণী এবং রাজ্যের সকলেই মার দর্শন পাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাণীসাহেবা বলিলেন, "মা আপনাকে বাড়ীতে আনিয়া বাড়ী পবিত্র করিলাম।" পেস্কারের এক ছেলেও আলমোড়া থাকে, সে'ও বাড়ীতে চিঠি দিয়াছে —মা, যাইতেছেন তাঁহাকে যেন বিশেষ যত্ন করা হয়।" কাজেই সকলেই মার দর্শনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন।

বৃষ্টি চলিতেছে, গরমও ভয়ানক, বিশেষতঃ আজ রৌদ্রে চলিয়াছি কাজেই গরম আরও ভয়ানক। রামগঙ্গার পর 'গৌরীগঙ্গা' দেখা দিয়াছে—স্রোতস্বতী নদী। আজ ৫ মাইল আসিয়াছি পরই 'কালীগঙ্গা' দেখা দিল। গৌরী ও কালীগঙ্গার যে সঙ্গমস্থল তাহাই কৈলাসের 'গেইট' (প্রবেশ পথ) বলা হয়। এখানে সকলে স্নান করে, খানিকটা পথ বরষায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুলিরাও হয়রান। জলের ও দোকানের

সুবিধার জন্য আমরা সব সময় (ডাক বাংলায়) যাইতেছি না। আস্কোটে কাপড়ের দোকান ইত্যাদিও আছে। রাণী নিজেদের ডাণ্ডি মার জন্য দিয়া দিয়াছেন। মা এখান হইতে সেই ডাণ্ডিতেই চলিলেন।

সন্ধ্যার পর আমরা ১০ মাইল দূর "বালিয়াকোট" পৌছিলাম, কিন্তু একটু ভুল রাস্তায় আসিয়া পৌছিয়াছি, উপরে না গিয়া নীচে আসিয়া পড়াতে থাকিবার কোন জায়গা পাইলাম না।

বালিয়াকোট

গাছতলায় ডাণ্ডির মধ্যে রাত্রি কাটান স্থির হইল। পার্ব্বতী মার জন্য একটী ছোট তাঁবু নিয়া আসিয়াছিল, তাহাই টানাইয়া দিল, জিনিষ পত্র তথায়ই রাখা হইল। গ্রামের মোড়লের নিকট রাজার চিঠি ছিল, তাহাকে পাহাড়ের উপর হইতে ডাকাইয়া আনা হইল। সে বলিল, 'ভুল রাস্তায় আসিয়াছেন, উপরে আমাদের গ্রামের স্কুলে থাকিবার জায়গা ছিল।' এত রাত্রিতে আর উপরে যাওয়া সম্ভব নয়। গ্রামের মোড়লই একটু গরুর দুধ আনাইয়া দিল। আমরা ঠিক হইয়া বসিতে না বসিতেই ভয়ানক বৃষ্টি-বাতাস আরম্ভ হইল, ডাণ্ডির মধ্যে যতটুকু সম্ভব শুষ্ক রহিলাম, মা'ও ভিজিলেন। কারণ এত বৃষ্টিতে ডাণ্ডির মধ্যে বেশী শুষ্ক থাকা সম্ভব নয়। সারারাত্রি ভয়ানক বৃষ্টি! একটু ফরসা হইতেই আমরা বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হইলাম। জিনিষ পত্র সব পড়িয়া রহিল, পরে যাইবে। আমাদের ৫ খানা ডাণ্ডি চলিয়া আসিল।

বৃষ্টির জন্য ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল। পথে এক গ্রামের মধ্যে একটু দুধ, (টাকায় ⁄২ সের) পাইয়া সকলে খাইয়া নিল। রাস্তা মধ্যে মধ্যে বড় খারাপ। খরস্রোতা নদী পার হওয়া

ধারচুলা।

সম্ভব হইল না, অতিকষ্টে কুলির পিঠে পার হইলাম। মার ডাণ্ডি ৫।৭ জন ধরিয়া কোন প্রকারে পার করিল। পথে আরও একটা নদী পার হইতে হইল। বৃষ্টিটা কমিয়া আসিয়াছে

একটু রৌদ্র উঠিয়াছে, আমরা বেলা প্রায় ১১॥০টায় "ধারচূলার" ডাক বাংলায় পৌঁছিলাম। কম্বল, কাপড় সব রৌদ্রে দেওয়া হইল। কুলিরা কেহ না আসায় খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করা যাইতেছে না। পার্ব্বতী মেয়েটী খুব সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছে।

ধারচূলার ইতিহাস শুনিলাম: ব্যাসদেব যখন নীচে নামিয়াছিলেন, তখন তিনি তিন পর্ব্বতের মাথায় হাড়ি চড়াইয়া রান্না করিয়াছিলেন। তিন পর্ব্বতকে চুলা বানাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "ধারচুলা" হইয়াছে। তিনটী পর্ব্বত ঐভাবেই সাজান আছে। এই স্থানটী বেশ বড় গ্রাম। কালী-গঙ্গার শব্দ খুব বেশী, সমুদ্র গর্জ্জনের মত। কালীগঙ্গার ধারে ধারে আমরা চলিয়াছি, আমরা ছোট্ট ডাকবাংলাটীতে আসিয়া উঠিলাম। চারিদিকেই পর্ব্বতমালা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অচল অটল ঋষির মত কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বুঝি বা সেই বিশ্ব পিতার ধ্যান-মগ্ন! বাহিরের ঝঞ্ঝাবাতে তাঁহাদের টলাইতে পারিতেছে না। পদতলে নদীটীও আপন মনে তাঁহারই গুণগান করিয়া চলিয়াছে। এখানে আসিলে স্বতঃই প্রাণের এক গভীর ভাব জাগাইয়া দেয়।

ধারচূলার ইতিহাস।

জিনিষ পত্র আসিলে বেলা প্রায় ৩টায় আমাদের খাওয়া দাওয়া হইল। আসিবার রাস্তায় কচু-শাক, কুমড়া-শাক, যাহা পাওয়া যায় নিয়া আসা হয়; সকলে মিলিয়া আনন্দে তাহাই খাওয়া হয়। এদিকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক কিছু জিনিষ সঙ্গে গুছাইয়া আনিতে হইয়াছে। দুর্গম পথ চলিতে চলিতে ভয়ের অনেক কারণ আছে, সেজন্যও অনেক জিনিষ আনা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আলমোড়া পর্য্যন্ত জিনিষ গুছাইতে গুছাইতে আনা হইয়াছে। প্রায় হয়রাণ; বহুদিন

মা যে আমার পূর্ণ!

বাক্সের কারবার নাই, এত জিনিষ পত্রেরও কারবার নাই, তাই আমিও যেন গুছানো শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। ছেলেরা বাজার করিতে করিতে সব অস্থির! যে যাহা আবশ্যক বলিয়া বলিতেছে— তাহাই আনা হইতেছে; বিশেষতঃ মা'ই আমার প্রয়োজনীয় সবই জানেন, মা'ও প্রয়োজনীয় জিনিষের কথা বলিয়া দিয়াছেন, পরে সকলেই বলিয়াছে ঐসব জিনিষের দরকার হইবে। আমি যখন জিনিষ গুছাইতে অক্ষম হইয়া পড়িলাম তখন মা, (আসিবার পূর্ব্বদিন) নিকটে বসিয়া সব বলিয়া দিতে লাগিলেন, আমি গুছাইতে লাগিলাম। কিছু পরেই দেখি সব জিনিষ গুছানো হইয়া গিয়াছে। মা যে আমার পূর্ণ, তাহাই তিনি সবই পারেন, কোনটাই যে তাঁহার ত্যাগের বা ভোগের নাই। তাঁর কাছে সব কাজই যে সমান, কোনই পার্থক্য নাই। তাই যখন যে'টা উপস্থিত হইতেছে করিয়া যাইতে পারিতেছেন।

যাক্, খাওয়া দাওয়ার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা জ্যোতিষদাদাকে নিয়া গঙ্গার ধারে পায়খানায় গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিতেছেন,

গঙ্গায় মার জামা দান।

"খুকুনী তুমি যে নূতন জামাটা বানাইয়া দিয়াছিলে আমার গায় ছিল সেটা গঙ্গায় নিয়া গেল।" আমি বলিলাম, "গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" মার এই ভাব নূতন নয় অনেক পূর্ব্বেও এই কথা লিখা হইয়াছে যে, জলে জামা বা কাপড় ফেলিয়া দিতেন। বলিলে, 'জলে নিয়া গেল'—"বলিয়া মধুর হাসি-হাসিতেন। আজও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বলিলেন, "অনেক পূর্ব্ব হইতেই খেয়াল হইতেছিল এখনও হইল।"

রাত্রিতে আমাদের কুলিদের সব বিদায় করা হইল, কারণ তাহারা দৈনিক প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া নিবে এবং গারবিয়ান গিয়া যখন বসিয়া থাকিবে তখনও প্রতিজনে প্রতিদিন ॥৵০ আনা করিয়া নিবে।

চলিলে ১৲ টাকা বসিলে ৷৶০ আনা এই হিসাব। এখানকার এক রায় সাহেবের কাছে, নৈনিতাল হইতে কৃষ্ণ পান্থ এবং আস্কোট হইতে রাজার চিঠি আসিয়াছে মার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য, তিনিই নূতন কুলি সব জোগাড় করিয়া দিলেন। বলিলেন, পথ বড় দুর্গম ; তাই নূতন কুলি-গুলিও বেশ বলিষ্ঠ। আমাদের সঙ্গীয় কুলিগুলি হয়রাণও হইয়া পড়িয়াছিল। যাক্ আগামী কল্য তাহারা ফিরিয়া যাইবে স্থির হইয়াছে।

আগামী কল্য আমাদের এখানেই থাকিতে হইবে স্থির হইয়াছে কারণ নূতন কুলিদের ৭ মাইল দূর হইতে আনিতে হইবে এবং আবার জিনিষ পত্র সব ওজন করিয়া তাহারা নিবে, প্রত্যেকে ৩৫ সের করিয়া নিবে। শুনিতেছি, এখান হইতে গারবিয়ান যাওয়ার পথই খুব খারাপ, এতদিন ভালয় ভালয় আসিয়াছি। মার সঙ্গে সবটাতেই সকলের আনন্দে দিন কাটিতেছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শয়ন করিলাম, সন্ধ্যাবেলায় ২টী ধূপকাটী মার নিকট জ্বালাইয়া দিয়াছিলাম। দেরাদুনের এক ওস্তাদজী (মার পূর্ব্ব পরিচিত), আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সেও কৈলাস চলিয়াছে। কিছুক্ষণ সে গান করিয়া শুনাইল। বেহালা বাজাইল। সকলেই প্রায় ঘুমাইয়াছেন, আমি সবেমাত্র শুইয়াছি, (মার পাশেই শুইয়াছি)—এর মধ্যেই কাপড়ে মুখ ঢাকা অবস্থাতেই মা ডাকিলেন, "খুকুনী শুইয়াছ ?" আমি অমনি উঠিয়া বলিলাম, 'মা কেন ডাকিতেছ ?' মা বলিলেন, "আর ধূপকাটী নাই ? জ্বালাইয়া দেও ত। আর, আমার নিকটের জানালাটা বন্ধ করিয়া রাখ।" আমি তাহাই করিলাম। মা কিন্তু মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া যেভাবে শুইয়াছিলেন, সেই ভাবেই শুইয়া আছেন। আমি ধূপ জ্বালাইতেছি বলিলাম, "মা, কেহ আসিয়াছেন নাকি ?" মা ঐ অবস্থাতেই জবাব দিলেন, "হুঁ"।

সূক্ষ্ম শরীরী মার নিকট আসিয়াছেন।

আর কোন কথা হইল না। আমি সব ঠিক করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

৭ই আষাঢ়, রবিবার—আজ মা অনেক বেলায় উঠিলেন। পরে একটু গঙ্গার ধারে গেলেন। ফিরিয়া আসিলে আমি মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। এখানে গরুর দুধ একটু পাওয়া যাইতেছে। দুধ খাইয়া মা আবার জ্যোতিষ দাদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে গেলেন। আমি রান্না করিতে গেলাম।—স্বামীজী নিজের কাজে বসিলেন। আজ বেলা প্রায় ১১টায় ভোগ হইল। ভোগের পর সকলে শুইয়া পড়িলেন। আমি বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন একটা গভীর ভাব জাগাইয়া দেয়, কারণ প্রকৃতি দেবীর যে এই সব স্থানে গভীর গম্ভীর মূর্ত্তি। আজ বৃষ্টি নাই, তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন।

যাত্রার প্রাক্কালের ঘটনা।

আজ সময় পাইয়াছি ২৮শে জ্যৈষ্ঠের আলমোড়ার ঘটনাটী আজ লিখিতেছি। ঘটনাটী এই, "সেই দিন রাত্রিতে হঠাৎ সামান্য কথায় কথায় একটী টুপী নিয়া বাবা ভোলানাথ মার উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন। যখন ভোলানাথ ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন, "তখন মা হঠাৎ দুইহাত তালি দিয়া উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোদাবরী সঙ্গে যাওয়ায় কাহাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। মার এই অবস্থা মধ্যে মধ্যে দেখিয়াছি, আমি বাহিরে না গিয়া মার জন্য একটু চিন্তা হওয়ায়, দরজার নিকট হইতে উঁকি দিয়া মা কোনদিকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ মা ঘরে ঢুকিলেন, ভোলানাথ তখনও ভয়ানক চটিয়া আছেন ও রাগে একটা শব্দ করিতেছেন। হঠাৎ মা ভোলানাথের মুখের কাছে হাত নিয়া ভয়ানক অট্টহাসি হাসিতে

মায়ের কালীমূর্ত্তী।

লাগিলেন এবং আঙ্গুলগুলি আপন ভাবে ঘুরাইতে লাগিলেন। পরে একটু সরিয়া আসিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন, "চুপ, চুপ, সব সময়ই পাগলামী।" যে ভাবে, যে মূর্ত্তিতে এই ব্যবহারগুলি করিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। টুন্নু, (প্রাণকুমার বাবুর ছেলে), ভোলানাথের পা টিপিতেছিল, সে পরে বলিয়াছে, সে মার এক ভয়ানক মূর্ত্তি নাকি তখন দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। বেরিলী হইতে দ্বারকা প্রসাদের স্ত্রী ও ভাতৃবধূ, (নাগপুরের ডি, পি, এম্, জির স্ত্রী)—একধারে নিজেদের বিছানায় বসিয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টিও মার চোখের দিকে পড়িয়াছিল, তাহারাও ভয়ে কাঁপিতেছিল। ডি, পি, এন জির স্ত্রী পরে বলিয়াছেন, 'আমি আমার পিতার নিকট শিশু বেলায় কালী-দেবীর মূর্ত্তির বর্ণনা - শুনিয়াছিলাম—(এতদ্দেশীয় লোকেরা কালীদেবীর খবর বড় জানে না), আমি মায়ের সেই মূর্ত্তি তখন দেখিয়াছিলাম। দ্বারকাপ্রসাদের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, মা যে জগতমাতা আজ সেইরূপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম।" কে কি দেখিয়াছেন আর কিছু বলেন নাই, এক একজন এক এক রকম দেখিয়াছেন!

এর পরই মা আবার হঠাৎ বাহির হইয়া গেলেন। কাহাকেও যাইতে নিষেধ করিলেন। রাত্রি প্রায় তখন ১১টা, সকলে চলিয়া গিয়াছে—শুধু হরিরাম বসিয়াছিল। ভোলানাথ কেমন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মা বাহির হইয়া গেলে কিছু পরেই ভোলানাথও হঠাৎ বাহির হইয়া রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। ভোলানাথের একটু রাগ তখনও ছিল। দাস্থবাবু গিয়া ভোলানাথকে ধরিলে, ভোলানাথ তাহার হাত সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চলিলেন। পরে নগেন বাবু প্রভৃতি গিয়া ভোলানাথকে ধরিলেন। এদিকে মা বোধহয় প্রথম মন্দিরের আঙ্গিনায় ঘুরিতেছিলেন, ভোলানাথকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া মা বিদ্যুতের মত পাশ কাটাইয়া অগ্রসর

হইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা পিছে পিছে গিয়া আর মাকে পাইলাম না। সকলের অনুরোধে ভোলানাথ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। আমি হরিরাম ও স্বামীজী মাকে খুঁজিতে খুঁজিতে নিকটে খুব উঁচু একটা মন্দিরের কাছে যাইতে হরিরাম বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। আমি সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হরিরাম সেখানে গিয়া দেখে মা হাঁটিতেছেন। মা হরিরামকে বলিলেন, "তোমরা সকলে এখান হইতে চলিয়া যাও, আর ভোলানাথকে গিয়া বল, ঘরে ফিরিয়া যাইতে নতুবা আমি এখনই কৈলাস রওনা হইয়া যাইব, সে যেন পরে সকলকে নিয়া যায়।" মার মূর্ত্তি দেখিয়া ও দৃঢ় আদেশ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে হরিরাম নামিয়া, মন্দিরে ভোলানাথের কাছে গেল। ভোলানাথের ত' মাকে জানিবার বাকী নাই, তিনি তার পূর্ব্বেই ঘরে গিয়া একেবারে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরাও চুপ করিয়া আছি। এত রাত্রে মা বাহিরে আছেন বলিয়া স্বামীজী রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। যাইতেও পারেন না, থাকিবারও উপায় নাই—মার আজ্ঞায় এই অবস্থা!

ইতিমধ্যে, মা সেই মন্দির হইতে নামিয়া নীচে আমরা যে মন্দিরে আছি, তাহার প্রাঙ্গনে আসিলেন, স্বামীজী কেন রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন আমরাও বাহির-ভিতর করিতেছিলাম, সেজন্য আমাকেও বলিলেন; বলিলেন, 'তোমরা ত জান, তবে কেন বাহির হইয়াছ? শীঘ্র সব ভিতরে গিয়া শুইয়া থাক আমি যখন হয় যাইব।" আমরা ভিতরে চলিয়া আসিলাম। সকলে চুপ চাপ বসিয়া আছি। যাহারা মার এই মূর্ত্তি নূতন দেখিল, দেখিলাম তাহাদের অবস্থা প্রায় আড়ষ্ট। ভোলানাথের কথা ছাড়া যিনি প্রায় কিছুই করেন না, সর্ব্বদাই যতটা সম্ভব ভোলানাথের ইচ্ছামতই চলিয়া আসিতেছেন, এত লোকের, এত অবস্থার মধ্যেও যাঁ'র এই ভাবই সকলে দেখিয়া আসিতেছে, আজ

তাঁহার এই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে, ভয়ে অভিভুত হইয়া পড়িয়াছে।

খানিক পরে মা ঘরে ঢুকিলেন, যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবেই হাসি মুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি তোমরা যে আজ সব বসিয়া আছ? ঘুম নাই তোমাদের?" আবার বলিতেছেন' "ভোলানাথ ঘুমে নাকি?" নরেন বাবুর স্ত্রী বলিলেন, 'হ্যাঁ মা, বাবা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।' মা বলিলেন, "কখনও নয়, আচ্ছা দেখিয়া আস ত? এই সব বলিয়া কতক্ষণ রহস্য করিলেন। নরেনবাবুর স্ত্রী-টী একটী সরলতার মূর্ত্তি, নরেনবাবুও তাহাই। নরেনবাবু ত শিশুর মতই মার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। দ্বারকা প্রসাদের স্ত্রী ও ভাতৃবধুকে হিন্দিতে বলিতেছেন, "কি তোমরাও যে চুপ করিয়া আছ। ঘুমাইবে না?" তাহারা বলিল, 'মা, ঘুমাইব বই কি?' মা বলিলেন "তবে শিগ্‌গির শোও।" তাহারা বলিলেন, 'মা, তুমি জগৎ জননী'—এই বলিয়া হাত যোড় করিলেন পরে উঠিয়া আসিয়া মার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন।

মা জগজ্জননী।

মার একটু চঞ্চল ভাব বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। একটু পরে ঘরের ভিতরই উঠিয়া গেলেন আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। টুনু ও মাণিকের বিছানার ধারে গিয়া বলিতেছেন, "কি, তোমরা কি কর?" তাহারাও উঠিয়া মার কাছে আসিল। মা আস্তে আস্তে কথা বলিতেছেন, 'কিসে কি হইল' ইত্যাদি ইত্যাদি! মা যে একটা ভাব সামলাইতেছেন, তাই বাহিরে এই চঞ্চলভাব—তাহা বেশ বোঝা যাইতেছিল। টুনুর ও দ্বারকা প্রসাদের স্ত্রীর ও ভাতৃবধুর দৃষ্টি মার দৃষ্টির উপর পড়িয়াছিল বলিয়াই হয়ত, মার যে অবস্থা হইয়া উঠিতেছিল, তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, মা নিজেকে সামলাইয়া পুনরায় বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। নতুবা হয়ত

আরও কি হইত কে জানে? ভোলানাথ পরদিন বলিতেছেন, তিনি কিছুতেই কৈলাস যাইবেন না। মা আবার তখনি আমাদের নিকট বলিতেছেন, "রাখ, আমার গোপালকে শান্ত করিয়া আসি," এই বলিয়া ভোলানাথের কাছে গিয়া বসিলেন এবং নানাকথায়, আবার বাবা ভোলানাথকে ভুলাইয়া কৈলাস যাত্রার মত করাইয়া দুধ খাইতে আসিলেন। রহস্যময়ীর লীলার অভাব নাই!

পুনরায় পূর্ব্বকথা অনুসরণ করিতেছে। বৈকালে মা উঠিয়া বসিলেন। এখানে নদী প্রশস্ত নয়—এপার ওপার রশি টানাইয়া বানরের মত ঝুলিতে ঝুলিতে যে পাহাড়ীরা এপার ওপার হয়, দেখিতেও আমাদের ভয় হয়। অভ্যাসে যে সকলই সম্ভব, ইহা তাহারই একটী দৃষ্টান্ত। আমরা আগামীকল্য সকালে এখান হইতে রওনা হইব। নূতন কুলিরা সব এখান হইতে যাইবে, কাজেই জিনিষ এখান হইতে আবার ওজন করা হইবে। এখান হইতে কুলিরা ৩৫ সের করিয়া নিবে; প্রতিদিন প্রতি কুলির মজুরী ১৲ টাকা; এই হিসাবেই প্রথম হইতে চলিতেছে।

একটী ঘটনা।

একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য, ঘটনাটী এই—আমরা সব জিনিষ খুলিয়া আবার গুছাইতেছি। মাকে অনুরোধ করিয়া কাছে বসাইয়া মার কথামত জিনিষ টিনের বাক্সে ভরিয়া লইতেছি। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মার সাহায্য ছাড়া এসব কাজও আমরা ঠিকমত করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। মা বসিয়া বাক্স ভরাইলেন, পরে বাক্স উঠাইয়া দেখিয়া সকলেই বলিলেন, "এটা হইতে জিনিষ খুলিতে হইবে। ইহার ওজন একমণের বেশী হইয়া গিয়াছে। মা বাহিরে যাইতেছিলেন। মৃদুভাবে বলিলেন, "আচ্ছা ৩৫ সের ত' নিবে; ⁄৫ সের বেশী হইয়াছে বলিতেছ।" একটু হাসিয়া বলিলেন, "কমও হইতে পারে।" আমি হঠাৎ ঐ ভাবে মার কথা শুনিয়া

বলিলাম, "তুমি একটু ছুঁইয়া যাও না, মা, ঠিক কমই হইয়া যাইবে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "কথা শোন," এই বলিয়াই আবার মৃদুভাবে হাসিয়া বলিলেন, "ছুঁইয়া দরকার নাই।" সত্য সত্যই যখন সন্ধ্যাবেলা রায় সাহেব কুলিদের নিয়া আসিয়া সব ওজন করাইলেন। তখন দেখা গেল যে বাক্সটী ৩৪৷৷০ সের হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলায় মা গঙ্গার ধারে একটু হাঁটিলেন। রায় সাহেব মাকে পাহাড়ী কলা পাঠাইয়া দিয়াছেন। মার সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। রাত্রিতে প্রায় ১২টার সময় আসিয়া শয়ন করিবার সময় মা বলিতেছেন—

যাত্রার উদ্যোগ।

প্রথমে জ্যোতীষদাদাকে পরে একে একে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরা কাল রাত্রে কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছ?" সকলেই না করিল। মা তখন বলিলেন, "এতদিনের মধ্যে কাহারও সহিত দেখা হয় নাই, কাল আসিয়াছিল একজন।" এ সম্বন্ধে আর কিছু কথা হইল না। এখন প্রতি ডাণ্ডিতে ৬ জন কুলি দেওয়া হইল। কারণ শুনিলাম রাস্তা ভয়ানক খারাপ। বোঝা নিবার জন্য ৭ জন কুলি। টুনুর জন্যও এখান হইতে এক ডাণ্ডি নেওয়া হইল। সকলে বলিতে লাগিল মহীশূরের রাজার পর আর কেহ এত লোক নিয়া কৈলাসে যায় নাই। বিরাট আয়োজন চলিল। সব কুলীদের মধ্যে আবার একজন কর্ত্তা থাকে। তাহাকে "মেট" বলা হয়। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শয়ন করিলাম। পার্ব্বতী মেয়েটী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছে। তাহার সরল, অমায়িক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কখনও ছোট মেয়েটীর মত ভোলানাথের হাত টিপিয়া দিতেছে। কখনও রাস্তায় ভয় পাইলে ভোলানাথের হাতঃ জড়াইয়া ধরিতেছে। বয়স প্রায় ২৫।৩০ হইবে। কিন্তু সঙ্কোচ নাই। যেন কতদিনের আত্মীয়।

৭ই আষাঢ়, সোমবার—আজ বেলা প্রায় ৭টায় আমরা ১০ মাইল দূর "খেলা" নামক স্থানে চলিলাম। পথ ভয়ানক দুর্গম। মা আমাদের নিয়া ডাণ্ডি ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিলেন। কারণ ডাণ্ডিতে প্রতি মূহুর্ত্তেই পড়িয়া যাইবার ভয় হইতেছিল। মা ও আমি হাঁটিয়া অনেকটা আগাইয়া গেলাম। মা একটা পাথরের উপর বসিয়া গান ধরিলেন—

"ফিরে চল, ফিরে চল, আপন ঘরে।"

ঐস্থানে মার মুখের ঐ গান, আমি মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলাম। সকলে আসিয়া পৌছিলে আমরা আবার চলিলাম। পথে রুমা দেবীর সহিত দেখা হইল। ইনি এখানে একজন প্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক। শ্রীশ্রীসারদা মার শিষ্যা। মাকে দর্শন করিয়া তিনি মহা আনন্দিতা হইলেন। আমাদের সঙ্গে তিনি খেলায় আসিলেন। আমরা বেলা ১টায় খেলায় পৌছিলাম। কালীগঙ্গা সঙ্গে সঙ্গেই সশব্দে চলিয়াছেন। সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছেন। উদ্দাম নৃত্য করিতে করিতে যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সাগরের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চলিয়াছেন। মনে হয় যেন মানবকে এইভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া যাইতে শিক্ষা দিয়া চলিয়াছেন।

রুমা দেবী।

রুমা দেবীও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে খেলায় আসিয়াছেন। ইনি সন্ন্যাসিনী। বেশ একটা শান্ত ভাব। এই দিকেই তাঁহার বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীসারদা মার দেহ রক্ষার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। খেলাতেই তাঁহার আশ্রম আছে। যাত্রীদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত। মহীশূরের নারায়ণ স্বামী ও ইনি এক আশ্রমেই থাকেন। নারায়ণ স্বামীর অনেক

ভক্ত আছে। আলমোড়ার মিশনের কয়েকটী মেয়ে নাকি নারায়ণ স্বামীর ভক্ত। পাহাড়ী মেয়েরা আলমোড়া যাইতে ও বাড়ী আসিতে অনেক সময়ই নারায়ণ স্বামী বা রুমা দেবীর সঙ্গে আসা যাওয়া করে।

রুমা দেবীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। ইনি অনেক সময়ই মার কাছে বসিয়া জীবনের সব কথাবার্ত্তা বলিলেন। এবং যাহাতে বাস্তবিক শান্তি পাইতে পারেন, সেজন্য কিছুদিন মার সঙ্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাত্রিতে ও আমাদের ছোট্ট ধর্ম্মশালায় মার নিকট এই পার্ব্বত্য সন্ন্যাসিনী বসিয়া রহিলেন। পুনঃ পুনঃ মার দর্শনজনিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমার মনে হইতেছে, বাস্তবিক মাকে পাইলে যেরূপ আনন্দ হয়, আজ আমার তাহাই হইতেছে। জীবনে এরূপ আনন্দ যেন আমি পাই নাই।" সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পাহাড়ী আরও দুইটী মেয়ে খেলায় আসিয়া পৌছিল। ইহারা আলমোড়াতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য মাকে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই মেয়েরা মাকে পত্র লিখিয়াছিল। মার জন্য ধূপ পাঠাইয়াছিল। মেট্রিক পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছিল, এখন ট্রেনিং পড়িতে যাইতেছে। মাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল, যেন কতদিনের পরিচয়। মাকে 'পাপড়ী' খাওয়াইল। (সুজি বা আটা মিষ্টি, মশলা দিয়া ঘিয়ে ভাজিয়া নেয়। ইহা ইহারা পথে চলিতে সঙ্গে নেয়। আমরাও আনিয়াছি।

সন্ধ্যার সময় মাকে পাহাড়ের গায় আসন পাতিয়া দিলাম। মা সকলকে নিয়া বসিলেন। আজও রাত্রি প্রায় ১২টায়, আমরা শয়ন করিলাম। মার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া রুমা দেবী নিজের বিছানায় চলিয়া গেলেন।

৮ই আষাঢ়, মঙ্গলবার—আজ একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছিল। রুমা দেবী ও মেয়েরা আলমোড়া চলিলেন। বলিয়া গেলেন, "মা, বৃষ্টি

'পঙ্গু'। বেশী হইলে রওনা হইও না। কারণ রাস্তা, খারাপ। উপর হইতে পাথর পড়িবার ভয়।"

আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রায় ৭টায় রওনা হইলাম। আজও পথ বড় চড়াই, তবে রাস্তা ভাল। কুলিদের বিশ্রাম দেওয়ার জন্য মা অনেকটা হাঁটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হাঁটিলাম। রাস্তা খারাপ হওয়ায় পাথরে লাগিয়া ডাণ্ডি সব ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। পথের মধ্যেই যে যে স্থানে মিস্ত্রি পাওয়া যাইতেছে, ডাণ্ডি মেরামত করিয়া নেওয়া হইতেছে।

নদী আর এখন আমাদের সঙ্গে নাই। সেই আনন্দধ্বনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই দিন যাবত ঠাণ্ডাও-নয়-গরমও-নয় চলিতেছে। আজ পার্ব্বতী দেবীর শ্বশুরালয়—"পঙ্গু" নামক স্থানে একটা স্কুলের মধ্যে আমরা উঠিলাম। উঠানের মধ্যে রান্না করিলাম। পার্ব্বতীর ঘর হইতেই চাউল, ডাল সব আসিল। পাঁচ মাইল আসিয়া দুপুরে আমরা খাওয়া দাওয়া করিলাম।

আবার ৩টায় আমরা রওনা হইলাম। রাস্তায়ই বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ঠাণ্ডা পড়িতে লাগিল। বেলা প্রায় ৪টার সময় মা হঠাৎ ডাণ্ডি হইতে নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন সঙ্গে দাসুদাদা ছিলেন। মা নামিলেই আমরাও সকলে নামিয়া পড়ি, কিন্তু এ'বার আমরা দেখি নাই। দাসুদাদার মুখে শুনিলাম, পথে নাকি একটী পাহাড়ী ছেলে দু'টী ফুল নিয়া মা'র কাছে আসিয়া স্তব পড়িয়া ফুল মা'র পায়ে দিয়া চলিয়া গেল। মা নাকি দাসুদাদাকে বলিলেন, 'দেখিতেছ, এ'দেশের মেয়েরা কি এক রকম সুন্দর!'

আমরা ৬ মাইল দূরে "সিরখা" নামক স্থানে একটা স্কুলে রাত্রের জন্য আশ্রয় নিলাম। গ্রামের মধ্যেই এই স্কুল, কাজেই খাওয়ায় জিনিষপত্র

'সিরখা'।

পাওয়া গেল। টুনু ও দাসুদাদার জন্যই রাত্রে রান্না হইত। আজ এখানে বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

মা আসিয়াই শুইয়া পড়িলেন, কিছুই খাইবেন না। আমরাও শয্যার আশ্রয় নিলাম। রাত্রিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রাত্রি প্রায় ২॥০টায় এত বৃষ্টি আরম্ভ হইল, যে আমাদের কম্বল ইত্যাদি সব ভিজিয়া যাইতে লাগিল, আমরা স্কুলঘরের বারান্দায় ছিলাম, ছাতা আড়াল দিয়া বসিয়া রহিলাম। বৃষ্টি একটু কমিলে আবার শুইয়া পড়িলাম।

আজ ২।৩ দিন যাবতই পর্ব্বতের শিখরে বরফ দেখা যাইতেছে, সূর্য্যালোকে বরফ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ভারি সুন্দর দৃশ্য! এতদিন, মধ্যে মধ্যে কাঁচা আম পাওয়া গিয়াছে, তাহা দিয়া ডাল রাঁধিয়াছি। আজ ২।৩ দিন যাবত আর আম দেখিতেছি না। এখন শীতে আমের আর দরকারও নাই।

৯ই আষাঢ়, বুধবার—সকালে আমরা আবার 'দীপ্তি' রওনা হইলাম, এখান হইতে ১০।১১ মাইলের রাস্তা। বেলা ৯টার সময় একস্থানে

দীপ্তির পথের কথা।

সকলে কিছু জল খাইয়া নিলাম। পথে আজ বড় বড় জঙ্গল পাওয়া গেল। স্থানগুলির অপূর্ব্ব দৃশ্য ও খুবই নিস্তব্ধতা!

ধারচুলার পর প্রতিদিন ১০।১২ মাইলের বেশী আর চলা যায় না। কারণ পথ বড় চড়াই। প্রতি ডাণ্ডির জন্য ৬ জন করিয়া কুলি আনা হইয়াছে। ৪ জন ডাণ্ডি বহন করে, বাকী ২ জন কুলিদের খাদ্য-সামগ্রী বহন করিতেছে মধ্যে মধ্যে কুলি বদল করিয়া ঐ বোঝাওয়ালাদের ডাণ্ডি বহন করিতে দেওয়া হয়। বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় পথ বড়ই ভিজা। পথে মধ্যে মধ্যে যে সব শাক পাওয়া যাইতেছে, তুলিয়া নেওয়া হইতেছে,

কারণ আর কোন তরকারী পাওয়া যায় না। চিনি এখন টাকায় ✓১৷৹ সের।

আমরা প্রায় বেলা ১টায় 'দীপ্তি' পৌছিলাম। গরু-ছাগল থাকিবার মত একটী ঘর, পাশে একখানা দোকান। উক্ত ঘরখানাই ধর্ম্মশালা। আমরা অয়েলক্লথ বিছাইয়া তথায়ই রাত্রি কাটাইবার মত জায়গা করিয়া নিলাম। রান্নাবান্না করিয়া খাইতে খাইতে প্রায় ৬টা বাজিল। শুনিলাম, আগামীকল্যের রাস্তা বড়ই খারাপ।

১০ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—আজ বেলা প্রায় ৬টায় আমরা ৭ মাইল দূর "মালপা" নামক স্থানে রওনা হইলাম। রাস্তার কথা অনেকদিন মনে থাকিবে সন্দেহ নাই। আজ আর ডাণ্ডিতে উঠিতে হইল না, কারণ এত খারাপ রাস্তা, লোক চলাই দায়। অতি কষ্টে, কুলির সাহায্য নিয়া আমরা বেলা প্রায় ১৷৹টায় "মালপা" পৌছিলাম।

মালপা, ভয়ঙ্কর পথ।

পথে ঝরণাগুলি খুব সুন্দর হইলেও তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। আমাদের পা কাঁপিতেছে, মাথার উপর ভয়ানক রৌদ্র। প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবার ভয়। পাহাড়ীরা উপর হইতে পাথর পড়িবার ভয়ও দেখাইতেছিল। তার মধ্যে আবার আর এক উৎপাত, বোঝা নিয়া ভেড়ার দল চলিয়াছে; এত সঙ্কীর্ণ রাস্তায় চড়াই-উৎরাইও ভয়ানক। রাস্তাগুলি সব মেরামতের অভাবে ভাঙ্গিয়া আছে। শুনিলাম মহীশূরের রাজা ৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই পথে কৈলাস গিয়াছিলেন, তখন গভর্ণমেণ্ট সব রাস্তা মেরামত করিয়া দিয়াছিলেন, তারপর আর মেরামত হয় নাই।

আজ পথ চলিতে চলিতে মা পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতেছিলেন, "বাবার ডাণ্ডি লক্ষ্য রাখিও। আবার, হাঁটা-পথে বলিতেছিলেন, "খুকুনী

তুমি বাবার সঙ্গে আস, বাবা পিছনে রহিয়া গিয়াছে।" আজ এত বলিবার কারণ বুঝিতে ছিলাম না। সব সময়ই বাবার ডাণ্ডি পিছনে থাকে। যাক্‌, কিছু পরেই হঠাৎ পাথরে লাগিয়া মার ডাণ্ডি পড়িয়া গেল। মা চোট পান নাই কিন্তু ডাণ্ডি ভাঙ্গিয়া গেল। তখনই মা বলিলেন, "আজ একটা ডাণ্ডি পড়িয়া যাইবে জানিতাম। তাই তোমাদের সাবধান করিতেছিলাম, এখন আমার উপর দিয়া গেল, ভালই হইল।" পরে বাবার ডাণ্ডিতেও চোট লাগিল কিন্তু বাবার চোট লাগে নাই। যাক্‌, "মালপা"তে দোকান নাই, কিছুই পাওয়া যায় না, এক্‌, লাকড়ী পাওয়া যায়, আমরা "দীপ্তি" হইতেই আটা, আলু নিয়া আসিয়াছিলাম। পাক করিয়া আজ, খাইতে খাইতে বেলা ৬টা, কারণ বাহিরে রান্না করিতে হয়। বাতাসে আগুন রাখা দায়। আর বিশেষতঃ, আমরা আজ শ্রান্ত-ক্লান্ত।

মায়ের দুর দৃষ্টি।

আজ যে ঘরখানা পাইলাম তাহা "দীপ্তি"র ঘর হইতেও খারাপ। বৃষ্টি হইলে ভিজিতে হইবে তাই কোনরকমে থাকা গেল। ছাগলের ময়লা ও নাড়া দিয়া ঘর ভরা।—পচা মাটির ঘর, এখানেও অয়েলক্লথ বিছাইয়া 'শয়নের বন্দোবস্ত করা গেল। এক রকম পোকা আছে, তার নাম 'পিশু', পাহাড়ে এই পোকারা বড় বিরক্ত করে, ইহা বড় উৎপাত। এই ঘর পিশুতে ভরা। কি করিব উপায় নাই।

পথকষ্টে মাকে পর্য্যন্ত একটু সাহায্য করা যাইতেছে না, এমন পথ। জ্যোতিষ দাদারও অবস্থা শোচনীয়। একমাত্র ভোলানাথ বেশ আসিয়াছেন। তিনি বলেন, "আজ কোন কষ্টই হয় নাই।" রাত্রিতে একটু বৃষ্টি হইল কিন্তু বিশেষ ভিজিতে হইল না। শুইতে শুইতে প্রায় রাত্রি ১২টা হইল। মাছির উৎপাত খুবই বাড়িতেছে। যতই উপরে আসিতেছি

মাছির উৎপাত ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। রাত্রিতে ঠাণ্ডা পড়ে, দিনে বিশেষ ঠাণ্ডা নয়।

১৯ই আষাঢ়, শুক্রবার—আজও বেলা প্রায় ৬টায় আমরা রওনা হইলাম, ৮ মাইল দূর "বোধি" নামক স্থানে গিয়া খাওয়া দাওয়া হইবে। আজিকার রাস্তা কাল অপেক্ষা কিছু ভাল, কিন্তু ভয়ানক, সন্দেহ নাই। পা অবশ হইয়া আসিতেছে, তবুও সকলকেই চলিতে হইবে, আর কোন উপায় নাই!

কোন কোন স্থানে কুলিদের ধরিয়া ধরিয়া চলিতে হইতেছে, ডাণ্ডি চলে না। তবুও এই সব রাস্তায় এই পাহাড়ীরা আমাদের ডাণ্ডিগুলি নিয়া যে ভাবে চলিতেছিল তাহা এক আশ্চর্য্য ব্যপার! কি ভয়ানক রাস্তা, মানুষ হাঁটিয়া যাইতেই ভয় পায়, আর উহারা ডাণ্ডিতে একটা মানুষ নিয়া চলিতেছে।

বোধি-দুর্গম পথ।

বেলা প্রায় ১১টায় "বোধি" পৌঁছিলাম। তথায় একটা স্থলে জায়গা নিয়া পাহাড়ের গায়ে পাথর বসাইয়া রান্না করিয়া নিলাম। কয়দিন যাবতই এইভাবে চলিতেছে, খাওয়া দাওয়ার পর বেলা প্রায় ৩টায় আবার আমরা রওনা হইলাম।

গারবিয়ান মাত্র ৫ মাইল দূরে। আমরা গারবিয়ান রওনা হইলাম। রাস্তা খুব খারাপ না হইলেও সব জায়গায় ডাণ্ডিতে যাওয়া গেল না। আর এত চড়াই, উৎরাই যে কখনও ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে পা দুইটা উপরে উঠিতেছে, মাথাটা একেবারে সোজা নীচের দিকে, কখনও মাথা সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। যাক, মার কৃপায় সকলেই নিরাপদে পথ অতিক্রম করিতেছি, রাস্তায় যে মধ্যে মধ্যে ডাণ্ডি পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতেও কাহারো কিছু হয় নাই।

ভোলানাথ বেশ আছেন, একটুও হয়রান হন নাই। তিনি আজ এই খারাপ রাস্তায় একবার উঠিয়া যাইতেছেন, আবার সকলকে দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিয়া খবর নিতেছেন। পাহাড়ীরা বলিতেছে, 'পিতাজীর মত কেহ হাঁটিতে পারে না।' বাস্তবিক তিনি বেশ আনন্দে অক্লান্তভাবে পথ চলিয়াছেন। এই দুই দিন তিনি ডাণ্ডিতে অতি সামান্যই উঠিয়াছেন, তিনি বলেন, "আমার মনে বেশ একটা জোর হইয়াছে।" বাস্তবিকই তাঁহাকে দেখিলে তাহাই মনে হয়। আমি হাসিয়া বলি, "আমাদের কৈলাসপতি ভোলানাথ ত' বেশ আনন্দেই কৈলাসে চলিয়াছেন।"

বাবা ভোলানাথের উৎসাহ।

গারবিয়ানের কাছে গিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দর, মনে হয় এমন আর কখনও দেখি নাই। ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। গারবিয়ানের নিকটেই "ছাইলেক", সমতল ভূমির মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড পাহাড়, চারিদিকটা যেন অসীম অনন্তের মূর্ত্ত-রূপ। কত রকমের ফুল ফুটিয়া আছে। একজন বলিয়াছিলেন, "কৈলাস-পতির সাজানো বাগান।" পথে বরফ পাইলাম। অনেক স্থানে বরফ পড়িয়া আছে। ঠাণ্ডাও বেশ লাগিতেছিল।

ছাইলেক।

এই পথেই একটা কুলিকে হঠাৎ সাপে কাটিল। মা দুই দিন পূর্ব্বেই বলিতেছিলেন, "একটা কালো সাপ পাহাড়ের গায়ে দেখিতেছি।" সত্যিই নাকি এই সাপটা খুব কালো। যাক্ ভোলানাথ ও সঙ্গীয় সকলে যথাসাধ্য যত্ন করিল। মা তাহাকে কি এক ঘাস দেখাইয়া চিবাইতে বলিলেন। পা ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখে জল আসিতেছে। ভোলানাথ ও মা'র সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উপরে নিয়া আসা হইল। এখন পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। আমরা গারবিয়ান আসিয়া এক স্কুলঘরে উঠিলাম, কারণ

ডাক বাংলা ভরা। এখান হইতে দল বাঁধিয়া সকলে রওনা হয় কারণ পথে দস্যু-ভয় আছে।

আমরা আসামাত্রই স্থানীয় লোকেরা আসিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বেই মা'র আগমন সংবাদ পাইয়াছিল। পার্ব্বতীর বাড়ী মাত্র ১।০ মাইল দূর। সে বাড়ী চলিয়া যাইবে। কয়েক জন সাধুও মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, তার মধ্যে পূর্ব্ব পরিচিতও কেহ কেহ আছেন। এখান হইতে ঘোড়ায় বা চামরী গরুর পিঠে যাইতে হয়। শুনিতেছি রাস্তা বেশী খারাপ নয় কিন্তু বাতাস এত পাত্‌লা যে লোকের দম রাখিতে কষ্ট হয়। তাই ডাণ্ডি বড় যায় না। যাক্ আমরা রাত্রি প্রায় ১১টায় শুইয়া পড়িলাম। আমাদের অনেক চিঠি এখানে আসিয়া জমা হইয়া আছে, তাহা সব পোষ্ট-মাষ্টার পাঠাইয়া দিলেন। আমরা ২।৪ দিন এখানে থাকিব স্থির হইয়াছে।

গারবিয়ান।

১২ই আষাঢ়, শনিবার—আজ আর চলিতে হইবে না তাই উঠিতে সকলেরই একটু বেলা হইল। কৈলাস যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই খবর পাইয়া মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। দাক্ষিণাত্যের একজন ইঞ্জিনিয়ার; রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের সঙ্গে কৈলাস যাইতেছেন, তিনি অনেক ফল নিয়া আসিয়াছেন—মার চরণে দিলেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সাধু, তিনি পূর্ব্বে তিন বার কৈলাস হইয়া আসিয়াছেন। তিনিই এ'বার দীনাজপুরের কুমারের সঙ্গে আসিয়াছেন। কুমারও মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সারা সকাল বেলাটা এই ভাবেই কাটিয়া গেল। এখানকার একজন ধনী লোক নন্দরাম বাবু, তিনিও পূর্ব্ব হইতেই আলমোড়া হইতে মেয়ের (রুদ্রাদেবীর) পত্রে মা'র আসিবার খবর পাইয়াছিলেন। ফল ফুল নিয়া তিনিও মা'র চরণে উপস্থিত হইলেন।

সকলে মিলিয়া আমাদের কৈলাস যাত্রার বন্দোবস্ত করিবার আলোচনা হইতেছে। দীনাজপুরের, দাক্ষিণাত্যের এবং আরও একদল একত্র হইয়া আগামীকল্য রওনা হওয়ার কথা। তবে ৫৫টী ঘোড়া তাহাদের চাই, তাহা জঙ্গলে আছে শুনিলাম, এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। একজন গাইড্ নিয়া যাইতে হয়। খচ্চর ও চামরী গরুর পিঠে মাল যাইবে, আমরা সকলে ঘোড়ায় যাইব স্থির হইতেছে। ঘোড়া ১৯৷৷৹ টাকা করিয়া নিবে। আমাদের যাতায়াতে প্রায় ২০৷২২ দিন লাগিবে। তা' ছাড়া ঘোড়ার সঙ্গের সহিস প্রতিদিন ৸৹ আনা করিয়া নেয়। বোঝার খচ্চরের সঙ্গে যে লোক যাইবে তাহারা প্রতিদিন ৷৷৹ আনা করিয়া নেয়। গাইডও ২৫৲ টাকা ও এক ঘোড়ার খরচ নিবে। খাওয়া দাওয়ার সব জিনিষ পত্র সঙ্গে নিতে হইবে। রাস্তায় কোথাও কিছু পাওয়া যায় না তবে "তাক্‌লাকোট" গিয়া কিছু পাওয়া যাইবে। পথে থাকিবার কিছু বন্দোবস্ত নাই, তাই তাঁবু নিয়া যাইতে হইবে। প্রতি তাঁবুতে নাকি ৪ জন থাকা চলে। তাঁবু ভাড়া করিয়া নিতে হইবে। ঘোড়ার সহিসদের জন্যও তাঁবু নিতে হইবে। সবই খচ্চরের পিঠে যাইবে। এই দুর্গম স্থানে যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজনও সেই রকমই করিতে হয়। চিনি, আলু এ'দিকে কোন কোন স্থানে পাওয়া যায় না, এখানে পাওয়া যায়, দুর্ম্মূল্য। কেরোসিন, প্রতি বোতল ৷৷৵৹ আনা করিয়া, চাউল ৴২ সের করিয়া টাকায়—এই রকম সব জিনিষই ভয়ানক দুর্ম্মূল্য।

"তাক্‌লাকোট' যাত্রার আয়োজন

যাত্রার আয়োজনের চিন্তায় এ'সব কথা আমাদের মনে আসিতেছে না, বেশ এক নূতন রকমের যাত্রা। মা'র একটু সর্দ্দি হইয়াছে আরও ২৷১ দিন পর আমরা যাত্রা করিব, কথা চলিতেছে। কাল ও পরশু এই দুই

দিনের চল্‌তিতেই বিশেষ কষ্ট হইয়াছে। ভোলানাথ বেশ আনন্দে চলিয়াছেন! শুনিয়াছিলাম, এই পথে পিতাও পুত্রের খবর নিতে পারে না, কিন্তু ভোলানাথ একবারও পরিশ্রান্ত হন নাই। বরং তিনি একবার উপরে উঠিয়া আবার নীচে নামিয়া নামিয়া যে ভাবে সকলকে চালাইয়া নিতেছিলেন, ঐ সময় তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল একটা বিশেষ ঐশ্বরিক শক্তি তাঁহার মধ্যে খেলা করিতেছে, নতুবা এ'ভাবে পরিশ্রম করা সম্ভব নয়।

শুনিলাম, ১৮।১৯ দিনেই এখান হইতে কৈলাস যাতায়াত করা যায়, কিন্তু পথে কিছু দেরী হইয়া যাওয়া সম্ভব, তাই প্রায় ২০।২২ দিন ধরিয়া নেওয়া হয়। এখানে আটা /৩ সের করিয়া টাকায়, ঘি /॥৵০ ছটাক টাকায় পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য।

রাস্তার দুর্গমতার নানা কথা

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলে একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। আমি বাহিরে আসিয়া একটু বসিলাম, চারিদিকেই সুন্দর দৃশ্য। প্রকৃতিদেবী যেন সাজিয়া বসিয়া আছেন। সবই সুন্দর। এ' সৌন্দর্য্য শুধু মহান ভাবই জাগাইয়া তুলিতেছে। এ' যায়গায়ও কোন দোকান নাই, তবে গৃহস্থদের ঘরে ঘরে চাল, মুসুরীর ডাল, আটা, ঘি সব পাওয়া যায়। মাছির উৎপাত এখানে একেবারেই নাই। তবে গ্রামটী অপরিষ্কার। এখানে এক রকম উলের জুতা পাওয়া যায়। নীচে দড়ি, উপরটী মুজার মত; একেবারে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই রকম জুতা পায়ে দিয়া বরফের উপরে তিব্বতী ও ভুটিয়ারা চলে। আমরা তাহা কিনিয়া লইলাম।

দেরাদুনের এক পরিচিত ব্রহ্মচারী, (নাম ভারতী), ধারচুলায় আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এখানে আসিয়া

ঠাণ্ডায় তাহার বুক ব্যথা ও জর হইয়া পড়িয়াছে। রাস্তার গল্প, অনেক রকম শুনিতেছি। স্বামী জ্ঞানানন্দ ৩।৪ বার কৈলাস গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, একবার তিনি ঘোড়ার উপর হইতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া যান। আরও অনেক আশঙ্কাজনক কাহিনীই শুনিতেছি। যাক্, মার যাহা ইচ্ছা হয়, হউক। আমরা মায়ের সঙ্গে আছি, আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। মার সর্দ্দির ভাবটা বেশ আছে। রাত্রিতে আজ একটু তাড়াতাড়িই শুইয়া পড়িলাম।

১৩ই আষাঢ়, রবিবার—আজ সকালেই দিনাজপুরের কুমার মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। বলিলেন, "দুর্গম পথে যাইতেছি; তাই আপনাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। আপনি শক্তি দিন, যেন শক্তি পাই। কত রকম ভয়জনক কথা শুনিতেছি, তাই আপনার আশীর্ব্বাদ নিতে আসিয়াছি। আজই আমরা রওনা হইতেছি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "একমাত্র তিনিই সব কিছু করিতেছেন। যাহা হইবার হইবে। তুমি শুধু ইষ্ট-মন্ত্র জপ ও স্মরণ করিয়া পথ চলিবে।" কুমার বলিলেন, "বেশ আপনার কথামত আমি তাহাই করিব। একবার, ঢাকা গিয়াও আপনার দর্শন পাই নাই। এখন দর্শন পাইলাম। আমার পরম সৌভাগ্য, দেখি, আবার কখন আপনার চরণ দর্শন করিতে পারি।" মাকে প্রণাম করিয়া তিনি বিদায় হইলেন। পরে তাঁহাদের সঙ্গীয় অপরাপর স্বামীজীরা এবং জ্ঞানানন্দ স্বামী প্রভৃতি সকলেই মার নিকট বিদায় নিয়া গেলেন।

'ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া পথ চলিও'

আজই সকলে যাইতেছেন। ৩।৪ দল একত্র চলিয়াছেন। আমাদের আগামী পরশু, মঙ্গলবার রওনা হওয়া স্থির হইয়াছে। মা'র সর্দ্দির ভাবটা দুপুরে আরও বাড়িয়া গেল। মা

বলিতেছেন, "তোমরা সব ভাল থাক তবেই হয়।" মার অসুস্থতায় আমাদের মন ভাল লাগিতেছে না।

এখানকার সকলে আসিয়া আমাদের যাইবার পরামর্শ ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। গঙ্গার সেই এক অনাদি অনন্ত সুরের ধ্বনি এখানেও শুনিতেছি। এখানে কালীগঙ্গা। আমাদের সঙ্গে একটা ডাণ্ডি নেওয়ার কথা হইতেছে। কারণ মা যাইবেন; অথবা কেহ যদি অসুস্থ বোধ করেন তবে তিনি যাইতে পারেন। এখান হইতে ডাণ্ডি যাতায়াতে ১৮০৲ টাকা লাগিবে। তা' ছাড়া তাহাদের থাকিবার জন্য একটা তাঁবু নিতে ও তাহাদের খাবার জিনিষ নিবার জন্য ঘোড়া আরও নিতে হইবে। এই রকমই এখানকার নিয়ম। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সকলে আজ একটু শুইয়াছেন। আমি বাইরে একটা খোলা জায়গায় ডাণ্ডির মধ্যে বসিয়া দুপুরটা কাটাইয়া দিলাম। আলমোড়া হইতে ১৩৬ মাইল আসিয়াছি। ধারচুলা হইতে যে কুলীদের আনা হইয়াছিল তাহারা পৌছিয়াই বিদায় হইয়াছে। আবার ফিরিবার সময় ধারচুলায় রায়সাহেবকে চিঠি দিলেই তিনি যথাসময়ে কুলি পাঠাইয়া দিবেন। এখানে বসাইয়া আর কুলিদের পয়সা দিতে হইল না। আর এখানে খাওয়ার জিনিষ যেমন দুর্ম্মূল্য গরীবের এখানে বসিয়া থাকা পোষায় না। যাহারা এখানকার বাসিন্দা তাহাদের কথা ভিন্ন, কারণ তাহাদের ক্ষেত-খামার আছে। গরু, ভেড়া, ছাগল সবই আছে। বাইরের লোক আসিয়া এখানে বসিয়া থাকা কষ্টকর তাই সকলে বিদায় নিয়া নিয়াছে।

আজ রাত্রিতে পার্ব্বতীর মাতা মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। চা'ল, ডাল, আটা ইত্যাদি নিয়া আসিয়াছেন। এবং মার জন্য এক জোড়া তিব্বতি জুতা নিয়া আসিয়াছেন বরফে হাঁটিবার জন্য। তিনি যে তপোবন আশ্রমের জন্য আস্কোটের রাজার নিকট হইতে বন্দোবস্ত

নিয়াছিলেন তাহা মাকে দিতে চাহিলেন। এখানেই রূমা দেবী থাকিতেন। এবং সেই মর্ম্মে এখানে বসিয়াই রাজার নিকট পত্র লিখিলেন। বৃন্দার ও পার্ব্বতীর বিশেষ আগ্রহে স্থির হইল যে আমরা মঙ্গলবার এখান হইতে রওনা হইয়া ১॥ মাইল দূর পার্ব্বতীদের গ্রামে গিয়া (নেপাল রাজার রাজধানী), একরাত্রি থাকিয়া বুধবার কৈলাস রওনা হইব। আজও শুইতে প্রায় রাত্রি বারটা বাজিল।

১৪ই আষাঢ়, সোমবার—আজ সকালে বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। মা হাত মুখ ধুইয়া একটু হাঁটিতে বাহির হইয়াছেন। রৌদ্র বড় দেখা যায় না। একটা কুয়াসায় সর্ব্বদাই যেন অন্ধকার করিয়া আছে। আজ রৌদ্র উঠায় ভালই লাগিল। এখানে আসিয়া আমার বেশ শীত লাগিতেছে। যাক্—একটু পরেই অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি আসিল। সারাদিন বৃষ্টি চলিল। আজ অনেক পাহাড়ী স্ত্রীলোক, পুরুষ ডাল, ঘি, চাল ও যে সব জিনিষ কৈলাসের পথে চলিতে দরকার হইবে সেই সব নিয়া মার দর্শনে আসিলেন। কাঠের বাটী রূপা দিয়া বাঁধান এই সব জিনিষ পত্র নিয়া আসিয়াছেন। হিন্দি কথা ভাল বোঝে না। কিছু সময় থাকিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। এখানকার একজন, সেণ্ডেল সিং বলিয়া স্থানীয় লোক, সেই আমাদের গাইড্ হইয়া যাইতেছে। সব বন্দোবস্ত তাহারাই করিতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে খচ্চরের পিঠে যে মাল যাইবে তাহা ওজন করা হইল। ১॥ মণ করিয়া প্রতি খচ্চরের পিঠে যাইবে এই রকমই নিয়ম। তবে দিন দিন নাকি ইহারা ভাড়া বাড়াইয়া ফেলিতেছে। ইহা জ্ঞানানন্দের মুখে শুনিলাম। যাক্, সব বন্দোবস্ত ঠিক। আমরা আগামী কল্য সকালে সব ঠিক করিয়া পার্ব্বতীর বাড়ী যাইব, তথায় তাহাদের বিশেষ অনুরোধে এক রাত্রি থাকিয়া, বুধবার প্রাতে রওনা হইব। নূতন করিয়া আবার জিনিষ-

পত্র গুছাইতে গুছাইতে আজও অনেক রাত্রি হইয়া গেল। এখান হইতে ২৫ দিনের খোরাক নিয়া যাওয়া হইতেছে, কারণ পথে আর কিছু পাওয়া যাইবে না। এত জিনিষ পত্র গুছাইতে গুছাইতে মন-মাথা, অস্থির লাগিতেছিল, কি ভয়ঙ্কর যাত্রা!

১৫ই আষাঢ়, মঙ্গলবার—আজ সকালে একটু জল খাইয়া জিনিষ পত্র গুছাইয়া আমরা বেলা ১০টায় পার্ব্বতীদের বাড়ী চলিলাম। নদী পার হইয়া যাইতে হয়, চারিদিকে ক্ষেত, উপরে, চারিদিকে, পাহাড়ের মাথায় বরফ। পথ বেশ চড়াই-উৎরাই আছে। মা ডাণ্ডিতে এবং আমরা সব হাঁটিয়া চলিলাম। পার্ব্বতীদের বাড়ী যখন পৌছিলাম, তখন আমাদের অবস্থা খুবই শ্রান্ত-ক্লান্ত। তাঁবু টানাইয়া রাখিয়াছে। আমরা কোন রকমে তাঁবুতে পৌছিয়া কম্বল বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পার্ব্বতীর মা আসিয়া মাকে ঘরের গরুর দুধ ও তাহাদের কি সব খাওয়াইয়া গেল। আমাদের রান্নার সব জিনিষ পত্র দিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। রাত্রিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁবুর চারিদিক হইতে জল আসে, কোন রকমে রাত্রি কাটান গেল।

১৬ই আষাঢ়, বুধবার—আজ আমরা এখান হইতে রওনা হইব। খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব স্থির হইয়াছে। তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া করিয়া আমরা যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। ২১টী ঘোড়া যাইবে। মার জন্য ডাণ্ডি যাইবে। সেণ্ডেল্ সিং গাইড্ যাইতেছে। তাহার মজুরী সর্ব্ব সমেত ৪৫৲ টাকা স্থির হইয়াছে। যাক্ আমরা বেলা প্রায় ১॥টায় জিনিষ পত্র সব আবার ওজন করিয়া রওনা হইলাম। আজ রাস্তা আরও চমৎকার। প্রথমটা খুবই খারাপ রাস্তা, তার মধ্যে আমরা সকলেই ঘোড়ায়। প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া

যাইবার ভয় হইতেছিল। পাথরে ঘোড়া ঠোক্কর খাইয়া খাইয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। কিছু পরেই রাস্তা আর তত খারাপ নয়, অনেকটা ময়দানের মত, সামান্ত উঁচুও আছে। পাথরে ভরা পথ, কোন রকম রাস্তা নাই; চারিদিকে পর্ব্বতের আরও বাহার খুলিয়াছে। পথ জন-শূন্য। গ্রাম চারিদিকে কোথায়ও দেখা যায় না। পথের ভাবটা বড়ই উদাস ও গম্ভীর। আমরা ধীরে ধীরে একজনের পর একজন ঘোড়ায় চলিয়াছি। মার ডাণ্ডি একটু পিছে পড়িয়া যাইতেছে। খুব খারাপ রাস্তা; সে'জন্য মাঝে মাঝে ঘোড়া হইতে নামিতে হইতেছে। কালীগঙ্গা পার হইলাম। চারিদিকের উচ্চ পর্ব্বত হইতে বহু জলস্রোত বাহির হইয়া প্রবলবেগে নীচে চলিয়াছে। রাস্তায়ও মধ্যে মধ্যে জল-স্রোত পার হইতে হইতেছে। বরফ পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া রাস্তার ধারে ধারে জমিয়া আছে। শীতে আমাদের সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। আমরা কালীগঙ্গা পার হইয়া নেপাল রাজার রাজধানী ছাড়াইয়া গেলাম।

কালাপাণি আগমন।

আজ ৭৷৮ মাইল দূরে সন্ধ্যার সময় পৌছিলাম। এই স্থানের নাম 'কালাপাণি'। সেইখানেই আমাদের ৪টী তাঁবু পড়িল। আমরা তাঁবুর মধ্যে আশ্রয় লইলাম, পথে বৃষ্টিতেও কিছু কিছু ভিজিয়াছি। রাত্রিতেও বৃষ্টি চলিল। আমরা কিছু খাইলাম না। দাস্থ ও টুন্থ খিচুড়ী খাইল, কেশব সিং চাকরও ভাগ পাইল। কোন প্রকারে খাওয়া দাওয়া সারিয়া সকলে শুইয়া পড়িল। গাইড্ বলিল, "আগামী কল্য যদিও ৫ মাইল গিয়াই তাঁবু ফেলিতে হইবে, রাস্তা বড় খারাপ, তাই খাওয়া দাওয়া করিয়া যাইতে হইবে। চারিদিকে কোথায়ও কিছু নাই, খরস্রোতা নদী আর বিশাল পর্ব্বত মাত্র আমাদের প্রতিবেশী। এইভাবে রাত্রি কাটান

বোধ হয় এই প্রথম। মাটি সব ভিজা। সেই জন্যই ভুটিয়াদের মোটা মোটা কম্বল (ছোট্কা) নিয়া আসা হইয়াছে। আমরা তাহাই নীচে বিছাইয়া লইলাম। যখন ওয়াটার প্রুফের কোট ও টুপী মাথায় দিয়া পাঞ্জাবীদের ন্যায় পাঞ্জাবী ও পাজামা পরিয়া আমরা সকলে ঘোড়ায় আসিতেছিলাম, সকলেই নিস্তব্ধ, সেও এক বিশেষ নূতন রকমের যাত্রা। পোষাকও নূতন ; দৃশ্যও নূতন ; ভাবও তাই নূতন !

১৭ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—আজ প্রাতে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে সকলে ব্যস্ত হইলাম। মাত্র ৫ মাইল যাইতে হইবে, কিন্তু রাস্তা খারাপ। তাই শীঘ্র শীঘ্র রওনা হইতে হইবে। বেলা প্রায় ১১টায় আমরা সব বন্দোবস্ত করিয়া রওনা হইলাম। আজ রওনা হইবার সময়েই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু উপায় কি ? আমরা বৃষ্টির মধ্যেই সময়োপযোগী সাজ সজ্জা করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ঘোড়ায় রওনা হইলাম। মা ডাণ্ডিতে। রাস্তা খুবই খারাপ। তার মধ্যে বৃষ্টিতে আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। কখনও সহিসদের সাহায্য লইয়া অতিকষ্টে পথ চলিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে বলিতে গেলে এখন আর কোন পথ নাই। শুনিয়াছি, এ' সব রাস্তায় ছাগল ছাড়িয়া দেয়, তাহারাই পথ দেখাইয়া নেয়, অবস্থা সেইরূপই দেখিলাম। পাহাড়ীরা পথ দেখাইয়া নিয়া চলিল। মধ্যে মধ্যে ভয়ানক জলস্রোত পার হইতে হইতেছে। জন-মানবহীন স্থান। মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়ীরা ছাগল ভেড়ার দল নিয়া তাঁবু ফেলিয়া আছে। ভয়ানক বৃষ্টি। পাহাড়ীরা বলিতেছে, 'এমন বৃষ্টি এখানে তাহারা আর দেখে নাই।' আমরা জানি মার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি-বাতাস লাগিয়াই আছে। মার কোন কার্য্য আরম্ভ হইলেই ঝড় বৃষ্টি অনিবার্য্য। যাক্ আমরা এই শীতের মধ্যে বৃষ্টিতে ঘোড়ার উপর একেবারে ভিজিয়া গিয়াছি। শরীর যেন অবশ, পায়ের

অবস্থা একেবারেই অসাড়। কোন প্রকারে লাগাম ধরিয়া কাঠের মত বসিয়া চলিলাম। এই অবস্থা লিখিয়া বুঝাইবার নয়, ভুক্তভোগীই বুঝিবেন।

এইভাবে বেলা ১॥টায় আমরা পাহাড়ের নীচে একটা স্থানে পৌঁছিলাম। শুনিলাম, এইখানেই আজ আমাদের তাঁবু ফেলিবে। জলে জিনিষপত্রও সব ভিজিয়া গিয়াছে। কোন প্রকারে গাইড্ লোকজন নিয়া আমাদের ৩।৪টী তাঁবু ফেলিল। পার্ব্বতী দেবী আমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি সহিসদের দিয়া ভিজা সামান্য লাক্ড়ী যাহা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহা দিয়া একটা ঘরে (পাথরের টুক্‌রা দিয়া সাজাইয়া ছাগল ভেড়ার থাকিবার জন্য ছোট ছোট কয়েককটা ঘর আছে) একটু আগুন করিল, আমরা অনেকেই গিয়া সেই আগুনটুকু ঘেরিয়া বসিলাম, মনে হইল বাঁচিয়া গেলাম। কোন স্থানে বসিয়াছি তাহা আর দেখিবার অবসর নাই। একটু পরে চাহিয়া দেখি বলিতে গেলে ছাগল ও ভেড়ার ময়লা দিয়াই সেই ঘরের ভিটি প্রস্তুত হইয়াছে, দরজা নাই পাথরের মধ্যেই একটু ফাঁক রাখা হইয়াছে, কোন প্রকারে মাথা গুঁজিয়া বাঁকা হইয়া সেই ঘরে ঢোকা যায়। অন্যস্থানে হইলে এ ঘরের মধ্যে যাওয়াই অসম্ভব ছিল, এখন এই অবস্থা দেখিয়া ও ঐ সামান্য আগুনের লোভে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি সেইখানেই কাটাইলাম। বৃষ্টি বন্ধ হইল না। তাঁবুর মধ্যে একটু আগুন নিয়া মার কাপড় ও ভোলানাথ—জ্যোতিষদাদা স্বামীজী তাঁদের সব ভিজা জামা কাপড় শুকাইতেছেন। কিন্তু এখানে কাঠ পাওয়া যায় না, আর এই বরফ ও বৃষ্টির মধ্যে আগুনই জ্বলে না। তাহার মধ্যেও একটু একটু জল পড়িতে লাগিল। একটু খাবার করিয়া খাইয়া সকলে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইল কিন্তু তাহাতেও কেহ গরম হইতেছেন না। অপূর্ব্ব যাত্রা! জ্যোতিষ দাদার ও বাবার আবার পেট খারাপ

হওয়ায় চিড়া সিদ্ধ খাওয়ান হইল। এইভাবে এই পার্ব্বত্য পথে আরও এক রাত্রি কাটিল। এই স্থানের নাম "ডোব্‌রা"।

১৮ই আষাঢ়, শুক্রবার—আজ "লিপুহিল" (অর্থাৎ লিপুপাস), পার হইতে হইবে। প্রথম হইতেই শুনিতেছি এ'টা পার হওয়াই সব-চেয়ে মুস্কিল। অনেক উচ্চে উঠিতে হইবে। এখন আমরা ১৬ হাজার ফিট উঠিয়াছি।

লিপু পার হইবার আয়োজন।

লিপুতে ১৮।১৯ হাজার ফিট উঠিতে হইবে। পরে আবার উৎরাই, তাহাও নাকি ভয়ানক, বরফে পা ফস্‌কাইয়া যাইবার ভয়, আবার বরফ বেশী না থাকিলে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়া যাইবার ভয়। বৃষ্টির মধ্যে সেখানে যাওয়াই যাইবে না। সকাল বেলা একটু পরিষ্কার ছিল, তখন রওনা হইবার জন্য সহিসরা পাহাড় হইতে ঘোড়াগুলি নামাইয়া নিয়া আসিল কিন্তু আবার বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় আজ যাওয়া বন্ধ হইল। এখানেই "মোকাম" করা অর্থাৎ অপেক্ষা করা স্থির হইল। গাইড্‌ যাইতে সাহস পাইল না; কথা ছিল, আজ সকালে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় 'তাকলাকোট' পৌঁছাইব; তাই কালই রাত্রিতে একটু খাবার তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছিল; আজ রাস্তায় তাহাই খাইয়া পথ চলিতে হইবে। যাওয়া বন্ধ হওয়ায় আমরা দুপুরে তাহাই খাইলাম। জ্যোতিষ দাদার পেট খারাপই আছে তাই তিনি বালি খাইলেন। হাত পা ঠাণ্ডায় অসাড়, লেখা যাইতেছে না। হাত বাঁকিয়া যাইতেছে। বৃষ্টি-বন্ধ হইতেছে না। দেরাদুনের পরিচিত লোকটী (ভারতী) সেও আমাদের সঙ্গ নিয়াছে। তাহার সঙ্গে কিছুই নাই; এই অবস্থায় একা একা চলা অসম্ভব। আগামী কল্য দিন ভাল হইলে সকালে রওনা হইয়া যাওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

"তাক্‌লাকোট" একটু বিশেষ স্থান, অনেক জিনিষ পাওয়া যাইবে

শুনিলাম। ধারচুলার কুলিদের যেমন নেংটী পরা দেখিয়াছি এখানে তাহা নয়। সকলেরই জামা, প্যাণ্ট ও জুতা আছে কারণ এ'সব না হইলে এখানে চলা অসম্ভব। বৈকালে একটু রৌদ্র দেখা দিতেই ভিজা জামা কাপড় সব রৌদ্রে দেওয়া হইল। অল্প সময় রৌদ্র ছিল আবার অন্ধকার করিয়া আসিল কিন্তু ঐটুকু সময় রৌদ্র পাইয়াই যেন সকলের হাত পা শরীর একটু গরম হইল। আমরা একটু বাহিরে খুঁজিয়া আবার তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম, খুবই শীত।

আগামী কল্য লিপু পার হইতে হইবে অনেকে নাকি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। তাই অনেক কিছু বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে হয়। ঠাণ্ডাও খুব বেশী হইবে। তাই আমাদের গরম জামা প্যেণ্ট সব পরিয়া তৈয়ার হইয়া রহিলাম। আগামী কল্য ভোরেই রওনা হইতে হইবে। নতুবা কাল "তাকলাকোট" পৌছান যাইবে না। রাস্তায় মাথা ঘুরাইলে বা শ্বাস কষ্ট হইলে কি কি নিতে হইবে মা সকলকে ঠিক করিয়া দিলেন। এখানেও একটু একটু শ্বাস কষ্ট অনেকেই বোধ করিতেছিলাম। সমান জায়গা, ময়দানের মত কিন্তু একটু হাঁটিলেই হাঁপাইতে হয়। আমরা শীতে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছি। আগুন করিবারও উপায় নাই লাকড়ী নাই, কুলিরা বহুদূর হইতে একটু ভিজা লাকড়ী নিয়া আসিয়াছে তাহা দিয়াই তাহারা রান্না-বান্না করিতেছে। মা আরও বলিয়াছিলেন, "এই সব বয়স্ক লোকেরা যেতে হ'লে hot bag ও খাট নিয়ে যেতে হয়, যদি পয়সার অভাব না থাকে। শুকনা ফল ত রাখতেই হয় যাহারা বিস্কুট খায় তা'ত বোধ হয় রাখেই।"

১৯শে আষাঢ়, শনিবার—আজ ভোরে সকলেই উঠিয়া দেখি বৃষ্টি অল্প অল্প পড়িতেছে। কাল রাত্রিতে বৃষ্টি চলিয়াছে। কিন্তু আজ গাইড্ সেণ্ডেল সিং পাহাড় হইতে ঘোড়া নামাইয়া আনিয়া যাইবার জন্য

প্রস্তুত। কারণ বসিয়া থাকিলেই তাহার ক্ষতি। যত শীঘ্র চুক্তি শেষ করিলেই তাহার ভাল। আমরাও মার নাম নিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া প্রায় ৭টায় রওনা হইলাম। বৃষ্টি পড়িতেছে, সকলেই বলিতেছে, আর আজ যতটুকু পথ আছে, শেষ হইলেই বিশেষ ভয় নাই।

এখান হইতে "তাক্‌লাকোট" প্রায় ১০ মাইল। আমরা আজ লিপুতে পৌঁছিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম ভুলিবার নয়। প্রথমে চড়াই চলিতে লাগিল, কি রাস্তা দিয়া যে ঘোড়া যাইতেছিল ভাবিলেও এখন ভয় হয়। তারপর ধীরে ধীরে আশে পাশে বরফ দেখা গেল। তারপর যেন দুইদিকে বরফের সমুদ্র মাঝখানে কালো পাহাড় তারও মধ্যে মধ্যে বরফ; মনে হইতেছিল সমুদ্রের মধ্যে সেতুর উপর দিয়া আমরা চলিয়াছি। তারপর উৎরাই আরম্ভ হইল। তখন সকলেরই হাঁটিয়া যাইতে হইল। তখন বরফের ভিতর দিয়াই রাস্তা। কুলিদের সাহায্যে আমরা চলিতে লাগিলাম কারণ পা ফস্‌কিয়া যাইতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল আমরা বরফের সমুদ্রের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছি। এক একজন পা ফস্‌কিয়া একেবারে অনেকটা নীচে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু চোট পাইল না। কারণ বরফের উপরই পড়িতেছে। জামা কাপড়গুলি যে ঠিক করিব তার উপায় নাই, হাত অবশ, আঙ্গুল বাঁকিয়া যাইতেছিল, এর মধ্যেই একটু লেবুর আচার কি গোলমরিচের গুড়া সকলে মুখে দিয়া নিতেছে মার মুখেও দিয়া দিতেছি, কোন হাত দিয়া দিব তাহার বিচার করিতেও পারা যাইতেছে না এই রকম অবস্থা। কিন্তু এই রকম ভয়ঙ্কর রাস্তায় ও সত্যিকথা বলিতে গেলে, আমাদের কিছুই কষ্ট হয় নাই। চারিদিকের দৃশ্যে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যেন অনেকটা গভীর আনন্দই অনুভব করিতেছিলাম।

লিপুর দৃশ্য!

দাসুবাবু ত আনন্দে 'মা, মা,' বলিয়া কাঁদিয়াই আকুল। ভোলানাথ কিছুই মুখে দিলেন না, তিনি বলিলেন, 'আমি তাকৃলাকোট না গিয়া কিছু খাইব না।' তিনি মহানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। স্বামীজী পিছে ছিলেন মা বলিলেন, "তুমি জ্যোতিষ ও স্বামীজীকে দেখ।" তিনি আবার ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বলিলেন, 'আমার কিন্তু মনে হয়, কাহারও জন্য কোন চিন্তা নাই। 'জয় মা তারণ'—বলিয়া আমি নিশ্চিন্তে আছি। আমার কিন্তু মনে খুব বল আছে।' বাস্তবিকই আমরা যখন নির্ব্বিঘ্নে সব নীচে নামিলাম তিনি আনন্দে আমাদের পীঠ চাপড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহার চোখে জল আসিল, বলিলেন, 'আমার মনে হয় তারা মা'ই সব রক্ষা করিতেছেন'—এই আনন্দেই তাঁর চোখে জল!

আমরা মার ও ভোলানাথের কৃপায় এই দুর্গম রাস্তায় বেশ আনন্দেই চলিলাম। প্রায় মাইল খানেক এই ভাবে চলিলে পরে আমরা ঘোড়ায় চড়িলাম মা'ও ডাণ্ডিতে উঠিলেন। আমরা একটু জল খাইয়া নিলাম পরে আবার চলিলাম। পার্ব্বত্য পথে নানাভাবে চলিলাম। শেষে ময়দানের মধ্য দিয়া চলিলাম। গাছ পালা শূণ্য পাহাড়ের যে কত রং, কত শোভা, তাহা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অপূর্ব্ব দৃশ্য, প্রায় সন্ধ্যায় আমরা 'তাকৃলাকোট' পৌছিলাম। পূর্ব্বেই গাইড গিয়া তাঁবু টানাইয়া রাখিয়াছিল। পৌছিবামাত্রই তথাকার বাসিন্দারা আসিয়া যে ভাবে দাঁড়াইল তাহাদের চেহারা দেখিয়া আমাদের ভয় হইতে লাগিল। পরে জানিলাম ইহারাই দস্যুতা করে। এখন হইতে খুব সাবধানে থাকিতে হইবে শুনিলাম।

পথে আসিতে আসিতে পাহাড়ের গায় অনেক গুফা দেখিলাম। শুনিলাম এক সময়তে এই সব গুফায় অনেক সাধু থাকিতেন। বহুদূর

হইতেই পাহাড়ের মাথায় রাজার প্রতিনিধির দালান তৎসংলগ্ন লামাদের মন্দির দেখা যাইতেছিল। এখানে কয়েক ঘর গৃহস্থ আছে দোকানও আছে। সব গৃহস্থদের বাড়ীর মাথায়ই কাপড়ের অনেক টুক্‌রা দড়ি দিয়া বাঁধা দেখিলাম। রাজ প্রতিনিধির দালানের উপরও সেইরূপ। ইহাদের মন্দিরে মন্দিরেও ঐরূপ কাপড় বাঁধা আছে দেখিলাম। এ'দিকে বেশ ক্ষেত দেখিলাম। বৃষ্টি বড় হয় না, তাই নহর কাটিয়া ক্ষেতে জল দেওয়ার বন্দোবস্ত দেখিলাম।

দস্যুর ভয় নাকি এখান হইতেই আরম্ভ। গাইডেরা সঙ্গে বন্দুক নিয়া আসিয়াছে। এখানে দুইটী পেশোয়ারের সন্ন্যাসিনী আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিল। ইহারা এখানকার লামাদের শিষ্যা। গাব্বিয়ান পৌঁছাইবার পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যেরও ৩টী সাধুর সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। তাহাদের নাম মনে পড়িতেছে না। আমরা একটু সাবধান হইয়াই শয়ন করিলাম। গাইড বলিল, 'আগামী কল্য প্রাতে খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইতে হইবে।' আগামী কল্যের "পড়াও" ও ১০ মাইল। ('পড়াও' অর্থাৎ যেখানে গিয়া তাঁবু টানাইবে।) এখানে মাইলের ঠিক কোন হিসাব নাই ইহারা আন্দাজে এইরূপ 'পড়াও' ঠিক করিয়া নিয়াছে। এক এক "পড়াও" গিয়া ইহারা তাঁবু টানায়।

রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া আজ দিনের রাস্তার কথা ভাবিতে যেন স্বপ্নের মত মনে হইতেছে। পথের যেমন কষ্ট, তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে প্রাণ ভুলাইয়া কষ্ট দূর করিয়া দেয়। কি যে দৃশ্য তাহা ভাষায় বুঝান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মা পাহাড়ের রং দেখিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ, দেখ পাহাড়গুলি যেন "বাঘাম্বর" পরিয়া আছে। পথে ছাগল-ভেড়াগুলিও কি সুন্দর। লোমগুলি পিঠ হইতে পা পর্য্যন্ত পড়িয়াছে বড় বড় সিংগুলিও বাঁকানো, অতি সুন্দর! ইহাদের লোমে কত কাপড়, হাত মোজা তৈয়ার

করিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা আমাদের নিকট বিক্রয় করিতে নিয়া আসিল। "পড়াও"তে পৌছিয়াই ঘোড়াগুলিকে পাহাড়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২০শে আষাঢ়, রবিবার—আজ খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় আমরা "রংগুং" রওনা হইলাম। প্রায় ১০ মাইল যাইতে হইবে। আমরা পৌছিয়াছি পর হইতেই রওনা হওয়া পর্য্যন্ত এক তামাসা দেখিতেছি, গ্রামের লোকেরা মার চারিদিকে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, লোকগুলি মার চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছে। কথা এক অক্ষরও বোঝে না, আরও এত লোক আছে, কিন্তু মার চারিদিকেই তাহারা ঘেরিয়া থাকে, ডাণ্ডিতে যখন মা রওনা হইবেন, তখন ডাণ্ডির চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ গিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ মার পায় হাত দিয়া কি দেখিতে লাগিল। মা'ও তাহার আঙ্গুলগুলি ধরিলেন। তিব্বতে ভেড়ার ও ছাগলের লোমেরই কারবার, কত জিনিষ নিয়া আসিল।

আমরা প্রায় ৬টায় 'রংগুং' পৌছিলাম। পথে অনেক মন্দির দেখিলাম। মন্দিরের পাথরগুলির মধ্যে অনেক কিছু লেখা আছে। সহিসরা বলিল "ওঁ" লেখা আছে।

রংগুং।

ছাগল ও ভেড়ার সিংগুলিও মন্দিরের মাথায় জমা করা আছে দেখিলাম। তাহার মধ্যেও অক্ষর খোদা আছে। আজ রাস্তা খুব খারাপ নয়। তবে দস্যুর ভয় বেশী বলিয়া সকলেই এক সঙ্গে চলিলাম, কি নীরব নির্জ্জন রাস্তা। মধ্যে মধ্যে চামরী গরু ও ছাগল-ভেড়ার দল দেখা যায় মাত্র। কত পাহাড়ই অতিক্রম করিতেছি, রাস্তার শেষ নাই। কোথা দিয়া যে নিয়া যাইবে কিছুই বোঝা যায় না এদিকে আর অন্য গাছ পালা নাই। ক্ষেতি আছে। পাহাড়ীরাই রাস্তা চিনিতে পারে। আমরা শুধু দেখিতেছি কখনও চড়াই

উৎরাই, কখনও বিশাল উপত্যকা তুমির মধ্য দিয়া চলিয়াছি পথের কোন চিহ্নই নাই! পর্ব্বতগুলির মধ্যে গাছ পালা নাই, কিন্তু মনে হয় যেন কে নানা রং দিয়া পর্ব্বতগুলি সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের চূড়ার বরফগুলিও শোভা বাড়াইতেছে। রাস্তায় চলিবার সময় মনে হয়, কোথায় যেন অসীম অনন্তের পথে চলিয়াছি—ইহার বুঝি শেষ নাই! গাইডই নিজের আন্দাজ মত মাইল ঠিক করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐরকমই একস্থানে তাঁবু টানাইয়া দেয়। আমরা আবার জিনিষ পত্র নিয়া কিছু সময়ের জন্য থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লই। আবার ঘর দরজা (তাঁবু) ভাঙ্গিয়া রওনা হই। বেশ এক জীবন চলিয়াছে। আজ বাবার একটু শ্বাস কষ্ট হওয়ায় মা আগামী কল্য বাবাকে ডাণ্ডিতে দিয়া নিজে ঘোড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলেন।

২১শে আষাঢ়, সোমবার—আজ বেলা ১০॥০টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইলাম। আজ মা ঘোড়ায় গেলেন, বাবা ডাণ্ডিতে।

দিনের বেলা নক্ষত্র দেখা।

পথে একবার মার ঘোড়াটী বসিয়া পড়িয়াছিল মাও সরিয়া পড়িলেন মার চোট লাগে নাই। যাক্ আমরা বেলা ২টায় একটা স্থানে পৌছিলাম নাম, "গৌরী পাহাড়।" জল, ঘাস আছে দেখিয়া তাঁবু ফেলা হয় আজ অনেকের শ্বাস কষ্ট আরম্ভ হইল ঠাণ্ডা বড় বেশী। কোন রকমে রাত্রি কাটিল। ঐরাস্তায় দিনের বেলা একটা নক্ষত্র দেখায় আমরা সকলেই সেটা দেখিলাম কিন্তু জ্যোতিষ দাদা দেখিতে পারিলেন কিনা বোঝা গেল না। শুনিয়াছি যিনি এই নক্ষত্র না দেখতে পান তিনি বেশী সময় জগতে থাকেন না।

২২শে আষাঢ়, মঙ্গলবার—আজ কিছু চা সঙ্গে নিয়া আমরা সকালেই রওনা হইলাম সঙ্গেও কয়েকজন আছে। আজ ১০ মাইল গিয়া

মানস সরোবর পথে দস্যু-কবলে।

আমরা মানস সরোবর পাইব। পথে খুব দস্যু ভয়, গাইড বলিতেছে। আজও মা ঘোড়ায় চলিলেন, স্বামীজী ডাণ্ডিতে কারণ তাঁহার শ্বাসকষ্ট খুব চলিতেছে। কাল রাত্রিতে আমারও খুব শ্বাসকষ্ট হইয়াছিল। বৈকাল হইতে শ্বাস ফেলিতে খুবই কষ্ট হইতেছিল। রাত্রিতে খুব বাড়িয়া গেল। ঠাণ্ডাও ভয়ানক। সকলে কত গরম কাপড় পরিয়া শুইলাম কিন্তু শরীর যেন ঠাণ্ডা-শীতল। আমরা প্রাতে ৮৷৹টায় রওনা হইলাম। পথে ইতিপূর্ব্বেও ডাকাতদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে মার কৃপায় কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই। অনেক বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র আমাদের লোকেরা সঙ্গে আনিয়াছে। আজ পথ চলিতে চলিতে প্রথম দুই জনের সঙ্গে দেখা, তাহাদের সঙ্গেও অস্ত্র শস্ত্র আছে তাহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ডান হাতের জামা গুটাইয়া চলিল। শুনিলাম অস্ত্র শীঘ্র ব্যবহার করিবার জন্যই তাহারা এইভাবে চলে। কিছুদূর গিয়া পাহাড়ের মাথায় আরও দুইজন দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম প্রথমোক্ত দুইজন তাহাদের হাত দিয়া কি ইসারা ও সঙ্কেত করিল তাহারা নামিয়া আসিয়া আমাদের যাওয়ার রাস্তার ধারে বসিল। আমাদের গাইডও অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সেও ঘোড়া দৌড়াইয়া তাহাদের মধ্যে গিয়া বসিয়া আলাপ আরম্ভ করিল, আমাদের সব ঘোড়া ও ডাণ্ডি সেই স্থান দিয়া চলিয়া গেলে গাইড ঘোড়া ছুটাইয়া হাসিয়া আমাদের সঙ্গ লইল। নিশ্চয়ই আলাপের মূলই দস্যুর হাত হইতে রক্ষার কারণ। ইহাই বোঝা গেল।

ডাণ্ডি ধীরে ধীরে চলে, ডাণ্ডির জন্য আমরা পথে পথে অপেক্ষা করিয়া চলিলাম। গাইড্ও খুব সতর্কভাবে চলিল। আরও একটু গিয়া দেখি আরও দুইজন দাঁড়াইয়া আছে এই নির্জ্জন স্থান, গাছপালা পর্য্যন্ত নাই। যতদূর দৃষ্টি চলে ধূ ধূ করে—পাহাড়, পাহাড়ের গায় পাহাড়

সাজান, আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখি তুইখানা তাঁবু ফেলিয়া কতগুলি লোক বসিয়া আছে। গাইড্ দৌড়াইয়া সেই তাঁবুর কাছে গেল; আমরা সেইস্থান দিয়া চলিয়া গেলে গাইড আবার দৌড়াইয়া আমাদের সঙ্গ লইল। শুনিলাম ইহাও ডাকাতদের তাঁবু। ইহারা ছাগল ভেড়া কিছু কিছু নিয়া এখানে থাকে। এইভাবে ভয়ে ভয়ে সকলে পথ চলিতে লাগিল; ক্রমে মানস সরোবর দেখা দিতেই প্রাকৃতিক শোভায় সকলে ভয়ের কথা ভুলিয়া গেল। অপূর্ব্ব দৃশ্য! প্রকাণ্ড জলাশয়! আকাশের রংয়ে রঞ্জিত। যেন একখানা আকাশ নীচে বিছান রহিয়াছে।

আমরা মানস সরোবর দেখিতে দেখিতে বহুদূর চলিলাম। চড়াই উৎরাই এক এক জায়গায় ভয়ানক। মার এই প্রথম ঘোড়ায় চড়া দেখিয়া আমাদের বড়ই কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু মা স্বামীজীর অবস্থা দেখিয়া কিছুতেই ডাণ্ডিতে যাইতে স্বীকার হইলেন না। ভয়ানক রাস্তা। নানাভাবেই বিপদসঙ্কুল। মা হাসিমুখেই চলিতে লাগিলেন। যাক্, আমরা অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছি; স্বামীজির ডাণ্ডি অনেক পিছে পড়িয়া গিয়াছে। মা হঠাৎ ঐরূপ নির্জ্জন স্থানে নামিয়া পড়িলেন। আমি ভোলানাথ ও জ্যোতিষ দাদা মা'র সঙ্গে আসিয়াছিলাম, মা বলিলেন, 'তোমরা তিন জনে চলিয়া যাও, যেখানে তাঁবু হইবে সেইখানে গিয়া দাঁড়াও আমি এখানে ডাণ্ডির জন্য অপেক্ষা করিব।' টুনু ও দাসু দাদাও আসিয়া পেঁাছান নাই।

আমরা মাকে ঐ নির্জ্জন স্থানে একা ফেলিয়া আসিতে রাজি না হওয়ায় মা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "যা বলিতেছি শোন তোমরা চলিয়া যাও।" ভোলানাথও ২।১ বার আপত্তি করিয়া ভাইজীকে সঙ্গে করিয়া আগে আগে মানস সরোবরের দিকে চলিয়া আসিলেন। এইভাবে

আমিও অনেক দূর হইতে আসিয়া একেবারে মানস সরোবরের তীরে, পরে পৌছাইয়া দেখিলাম গাইড ও পার্ব্বতী দেবী তথায় তাঁবু ফেলিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। প্রায় ২টায় পেঁাছিলাম। তথায় নামিয়া পড়িলাম। এইভাবে আমাদের দল ৩ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। আমরা মার ও অন্যান্য সকলের অপেক্ষায় মানস সরোবরের তীরে বসিয়া রহিলাম।

মানস সরোবরের মধ্যে নানা রংয়ের হংস বিচরণ করিতেছে দেখিতেছি। আমি একটু সময় পাইয়া মানস সরোবরের তীর হইতে একটু দূরে যেখানে তাঁবু, সেখানে বসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কি স্থান! যেমন বিপদসঙ্কুল, তেমনই মনোরম। চারিদিকে নানা রংয়ের পর্ব্বতমালায় সজ্জিত, আর পাদদেশে সরোবর প্রবাহিতা। খুব বাতাস। রৌদ্র উঠিয়াছে কিন্তু ঠাণ্ডায় তাহা অনুভব করা যাইতেছে না। তবুও গাইড বলিতেছে—'মার কৃপায় আমরা ভাল মতই আসিয়াছি, নতুবা এখানে এত বাতাস হয় যে মানুষ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।' এখান হইতে কৈলাস ৩ দিনের পথ। কৈলাসের চূড়া বরফের মন্দিরের মত দেখাইতেছে। রূপার মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সঙ্গীয় সকলে তাহা দেখিয়া কৈলাস পতির জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি কি সব দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে দেখিতে দেখিতে মন যেন স্তব্ধ হইয়া যায়।

মানস সরোবর।

সব বন্দোবস্ত হইলে রান্নার যোগাড় হইবে। কয়দিন যাবতই লাকড়ী নাই এই পর্ব্বতেই এক রকম ছোট ছোট কাঁটার গাছ আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে ঝোপের মত হইয়া আছে, আর চামরী গরুর গোবর, সহিসেরা এই সব যোগাড় করিতেছে, কোন প্রকারে তাহা দিয়া রান্না হইতেছে। আর

কোন রকম কিছুই নাই। এইগুলি কতকটা কাঁচাই জলে। বাতাসে ষ্টোভও জ্বলিতেছে না। শ্বাসের কষ্ট, সকলেই কম বেশী অনুভব করিতেছেন। কর্পূর শুঁকিতে হয়, তাই চলিতেছে।

মা গারবিয়ান হইতেই আমাদের সকলের জন্য গরম প্যেণ্ট করিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন তাহা করা হইয়াছে। তুলার জামা ইত্যাদি মা'ই বেরিলী হইতে করিতে বলিয়াছিলেন। এখন দেখিতেছি কলিকাতা হইতে ও সব গরম কাপড় ইত্যাদি যা' আনা হইয়াছিল, মার কথামত পরে আরও সব গরম কাপড় না করিলে, শীত নিবারণ অসম্ভব হইত। আরও অনেক জিনিষই মা আনিতে বলিয়াছেন তাহা এখন অত্যন্ত আবশ্যকীয় দেখিতেছি, কর্পূর ইত্যাদি সবই মা'ই আনাইয়াছেন। এখানে আসিয়া শুনি শ্বাসের কষ্ট হইলে কর্পূর শুঁকিলে আরাম পাওয়া যায়। যাক্ মা আমাদের পূর্ণ তাঁহার কথা এসব ক্ষুদ্র বিষয় দিয়া আর কি প্রমাণ করিব। তবুও লিখিতে আনন্দ হয় তাই লিখিতেছি।

মা পূর্ব্ব হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পথে চামরী গরুর লেজগুলি অতি সুন্দর দেখিতেছি। শুনিলাম জঙ্গলী চামরী গরুগুলিতে আসিলে অনেক সময় বিপদ হয়, তাই আমরা ঘোড়াতেই আসিয়াছি। সবই জঙ্গলে ছাড়া থাকে, দরকারের সময় মালিকরা পাহাড় হইতে নামাইয়া নিয়া আসে। জনমানব শূন্য এইস্থানে বসিয়া বসিয়া অবাক হইয়া প্রকৃতির লীলাভূমি, দেখিতেছি; অনেক পরে মা ও অন্যান্য সকলে আসিয়া পৌছিলেন। আমরা সরোবরে স্নান করিলাম। মা সরোবর স্পর্শ করিয়া ছিটা দিলেন সেই ছিটা একটু পাইলাম। ভোলানাথ স্নান করিবার আগেই মাকে একটু ডাকিলেন ও মার সঙ্গে কি কথা বলিলেন। পার্ব্বতী ভোলানাথের হইতে দীক্ষা নিল। তাঁবুতে ফিরিতেছি. ইহার ভিতরে মা আপনভাবে সরোবরের

তীরে কিছু সময় হাঁটিতেছিলেন। পরে ভাইজীও মায়ের সঙ্গে গেলেন। মা যখনই তাঁবুতে আসিয়া পৌছাইলেন, আমি একটু জলযোগের পর রান্না করিতে গিয়াছিলাম। ভয়ানক বাতাস, তারপর কাঁচা কাঁটা গাছ দিয়া রান্না কি কষ্ট, তাহা বোঝান দায়। অত কষ্টে রাত্রিতে সকলে আহার করিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টায় সকলে শুইয়া পড়িলেন। মা সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার সরোবর তীরে গিয়া বসিয়াছিলেন শুনিলাম, তখন নাকি সরোবর একেবারে ঠাণ্ডা, কোনরকম ঢেউ ছিল না।

এই সরোবরের নিকটই কৈলাস পর্ব্বতের নীচে আরও একটী জলাশয় দেখিলাম। গাইড বলিল, উহা "রাক্ষস তালাও" নামে বিখ্যাত, রাক্ষস-পতি রাবণ রাজা এইস্থানে নাকি তপস্যা করিয়াছিলেন। দস্যুদের সম্বন্ধে গল্প শুনিলাম, রাজা নাকি ইহাদের কোনরূপ শাস্তি দেন না—ইহাদের এই পেশা।

রাক্ষস-তালাও।

রাজাই নাকি বলিয়াছেন, 'তোমরা যে ভাবেই পার জোর জবরদস্তি করিয়াই হউক বা যে কোন প্রকারেই হউক নিজেরা জীবিকা নির্ব্বাহ কর।' কাজেই পথিকদের উপর এই অত্যাচারের জন্য ইহাদের কোনরূপ শাস্তি হয় না। আর সহিসরা বলিল, "আমরা সকলে চশমা চোখে পরিয়া লই, তাহার কারণ চোখ দেখিয়া উহারা টের পায়, আমরা ভয় পাইয়াছি, তবে আরও অত্যাচার করে; তাই চোখ ঢাকিয়া আমরা এমনভাবে চলি যেন উহাদের আমরা ভ্রুক্ষেপও করি নাই। আরও বলিল উহারা প্রথমে খাবার চায়, না দিলেই অস্ত্র ব্যবহার করে।

সরোবরে অনেক চক্রবাক দেখিলাম। আরও কয়েক রকম পাখী এখানে দেখিলাম। এ কয়দিন কোন রকম পাখীও দেখা যায় নাই। আজ প্রায় ১০ মাইল আসিয়াছি।

২৩শে আষাঢ়, বুধবার—আজ খাওয়াদাওয়া করিয়া রওনা হইবার কথা। অবশ্য সকালে বাতাস একটু কম থাকে তাই চলা একটু সুবিধা, কিন্তু এত ঠাণ্ডায় রওনা হওয়াই দায়। যাক আমরা সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া করিয়া প্রায় বেলা ১২টায় রওনা হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাইলের এখানে কোন ঠিক নাই, ইহারা আন্দাজে যাহা বলে, সুবিধামত একটা স্থান দেখিয়া ইহারা তাঁবু ফেলে। আজও প্রায় ৩াা০টায় একটা স্থানে পৌছিয়া তাঁবু ফেলা হইল। শুনিলাম এ'স্থানের নাম "জু গোম্‌ফা"।

আজ আমরা প্রায় ৮ মাইল আসিলাম এইরূপ অনুমান হয়। আমরা মানস সরোবরের তীরে তীরেই অনেক দূর আসিয়াছি। পরে একটা পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া পাহাড় পার হইয়া একটু নিচু স্থানে আসিয়াছি। পথে লামাদের একটা গুহা ও মন্দির দেখতে গেলাম। গুহাটী বেশ বড় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বুদ্ধ মূর্ত্তি এবং আরও অনেক মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত। অনেক গ্রন্থ সজ্জিত আছে খুব যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। ঘিয়ের বাতি জ্বলিতেছে। মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে অনেকগুলি ছোট ছোট বাটিতে ভরা, জল সাজাইয়া রাখিয়াছে। পুজারীরা তিন বৎসর অন্তর অন্তর পরিবর্ত্তন হয়। তখন সব জিনিষপত্র নূতন পূজারীকে বুঝাইয়া দিয়া যাইতে হয়। অনেক বাদ্যযন্ত্রও দেখিলাম।

লামাদের মন্দির দর্শন।

অনেকে নাকি এই মানস সরোবর পরিক্রমা করেন। অর্থাৎ চারিদিক প্রদক্ষিণ করেন, তাহা ৬০ মাইল ব্যাপী। ৫।৬ দিনের কমে হয় না বলিয়া আমরা আর তাহা করিলাম না। এখানে একটীস্থানে পাহাড়ের ছিদ্র দিয়া ফুটন্ত গরম জল বাহির হইতেছে। এ স্থানটীও সরোবরের বেশী দূরে নয়। কৈলাস আর মাত্র ২ দিনের পথ। পর্ব্বতের গায় পর্ব্বত

সর্ব্বোপরি কৈলাস শিখর। যাক তাঁবু ও জিনিষপত্র গুছাইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

ভয়ানক ঠাণ্ডা, লাক্‌ড়ীও পাওয়া গেল না, বাতাসে ষ্টোভও জ্বলে না। লণ্ঠনও সব খারাপ হইয়া যাইতেছে, কাজেই সকলে একটু একটু ছাতু খাইয়া শুইয়া পড়িল। সকলের এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ছাতুর বদলে আটাই মাকে, ভোলানাথকে খাওয়ান হইল। এমনই সকলের অবস্থা যে ছাতু কি আটা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবারও ক্ষমতা নাই। সকলেই শ্রান্ত-ক্লান্ত। বিশেষতঃ শ্বাসের কষ্ট স্বামীজীর খুব বেশী। মা ঘোড়ায় আসাতে আমাদের মনে হয় মায়ের কষ্ট হইতেছে, কিন্তু কিছু করিবার উপায় নাই। সব সহ্য করিয়া পথ চলিতেই হইবে এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান হইয়াছে।

পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া দেখি কে যেন বাগান সাজাইয়া রাখিয়াছে। উপরোক্ত কাঁটার ছোট ছোট ঝোপ ছাড়া আর কিছু গাছ পালা নাই। ঝোপগুলিতে সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ফুল হয়, সেই ঝোপগুলও এমন সুন্দর ভাবে সাজানো যেন মালি কাটিয়া—ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কত রূপই দেখিতেছি, লিখিয়া শেষ করিবার উপায় নাই। পথ দুর্গম—দুরূহও সন্দেহ নাই।

২৪শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—আজ সকাল বেলা একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এদিকে বৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। বৃষ্টি পড়াতে আরও অসুবিধা হইতে লাগিল ঠাণ্ডাও বেশী পড়িল। সকলে জড়বৎ। কুলিগুলি মদ খাইয়া খাইয়া চলে, তাহারাও ঠাণ্ডায় জড়সড়, ডাকিলেও কাজের জন্য শীঘ্র পাওয়া যায় না। কাজেই খাওয়া দাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কথা ছিল, আজ সকালে রওনা হওয়া হইবে কিন্তু ঠাণ্ডায় কেহ

পরিল না। কোন প্রকারে খাওয়া দাওয়া করিয়াই যাওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা বেলা প্রায় ১১॥০টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইলাম। আজ ভয়ানক বাতাস ও ঠাণ্ডা, অতি কষ্টে পথ চলিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড মাঠের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। মাঠের অপর প্রান্ত দেখা যায় না। বেলা প্রায় ৬টায় আমরা কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশে মাঠের মধ্যেই তাঁবু ফেলিলাম। কৈলাস পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিলাম। বরফে ঢাকা, ঠিক যেন একটী প্রকাণ্ড রৌপ্যের মন্দির। চারিদিকের পাহাড়গুলি যেন মন্দিরের প্রাচীর। মা বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেখ, কালো গৌরীপীঠের মত ও পাহাড় ঘুরিয়া গিয়াছে।" অতি অপূর্ব্ব শোভা। এই স্থানটীর নাম 'বুন্দ'। আমরা আজ এখানেই রাত্রি কাটাইব।

বুন্দ।

২৫শে আষাঢ়, শুক্রবার—আজ মাত্র ৫ মাইল যাইব। 'ধানকেনা' পার হইয়া যাইব। ধানকেনা একটু নামকরা স্থান। দোকান ইত্যাদি আছে। শুনিলাম, আজও আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব। এখানে মাঠের মধ্যে কিছু দূরেই চামরী গরু ও ভেড়ার দল নিয়া তাঁবু ফেলিয়া অনেক লোক আছে। আজ হইতেই আমাদের পরিক্রমা আরম্ভ। আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ১২টায় রওনা হইয়া পথে ধানকেনা দেখিতে গেলাম। তথায় ভোটান রাজার বাড়ী আছে। বোধ হয় এ স্থানটা ভোটান রাজার এলাকায়।

ধানকেনা হইতে পরিক্রমা আরম্ভ।

বেলা প্রায় ৪টায় পাহাড়ের মধ্যে একস্থানে তাঁবু ফেলিলাম। অনুমান ৬।৭ মাইল আসিয়াছি, আজ শরীরের অবসন্নতায়, বিশেষতঃ শ্বাস ফেলিতে সকলেরই খুব কষ্ট হইতেছে। ঠাণ্ডায়ও দম বন্ধ হইবার উপক্রম; কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না, এই অবস্থা। একটু

নড়িলেই সকলের শ্বাস এমন পড়িতে আরম্ভ করে যেন বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল! লাকড়ী পাওয়া গেল না; আগুন করিবারও উপায় নাই, কাপড়ে আর শীত মানিতে চাহে না। শীতে হাত এত অবশ লেখা দুষ্কর। কৈলাস পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করা হইতেছে সেই ভাবটা রাখা যাইতেছে না। শরীরের এমন অবস্থা, ঠাণ্ডায় সকলে জড়সড়।

একটা ঘটনা লিখা হয় নাই। তাক্‌লাকোট হইতেই একটী কালো কুকুর আমাদের সঙ্গ নিয়াছে; মার ঘোড়া রওনা হইলেই সে রওনা হইল। পথে যদি কোথায়ও আমরা বসি, কুকুরটিও গিয়া মার গা ঘেসিয়া বসে। মা একদিন তার মাথায় হাত দিয়া একটু আদর করিলেন। সে ঘোড়ার পিছে পিছে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহার কুকুর কিছুই জানি না। কুকুরটি কিন্তু এদেশী কুকুর নয়।

কালো কুকুরের ঘটনা।

আজ পথে ৩।৪ বার বরফ বৃষ্টি পাইয়াছি। এখানেও মধ্যে মধ্যে বেশ বরফ বৃষ্টি হইতেছে। মাঠের মধ্যে মধ্যে তাঁবু টানাইয়া পাহাড়ীরা সপরিবারে চামরী গরু ও ছাগল-ভেড়া নিয়া বাস করে। আর বড় বড় কুকুর আছে। সেগুলি বড় ভয়ানক, আমাদের দল যখন মাঠ দিয়া যায়, তখন তাঁবুতে যাহারা আছে, তাহারা ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, কত রকমের পোষাক দেখিতেছি নেপালী, তিব্বতী, ভোটানী প্রভৃতি।

কত পাহাড়, কত নদী পার হইতেছি আর কত রূপই দেখিতেছি। আমাদের সঙ্গীয় লোকেরা ঐ দেশীয় লোকের সহিত দেখা হইলে কি সব কথা বলে, আমরা এক অক্ষরও বুঝিতে পারি না! প্রার্থনা করিবার নমুনাও অদ্ভুত। ভিক্ষুকেরা পয়সা চাহিতেছে, বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া। যতই আসিতেছি পথের দুর্গমতা ততই অনুভব করিতেছি। স্বামিজীরই

শ্বাসকষ্ট বেশী; মার কৃপায় সকলেই চলিতেছি। জ্যোতিষ দাদারও ঘোড়ায় চড়িতে চড়িতে শরীর বড়ই ক্লান্ত, শ্রান্ত; কিন্তু উপায় নাই। পথ চলিয়াই যাইতেছি। আগামীকল্যও কিছুদূর যাইয়া থাকিব। আগামী পরশ্ব গৌরীকুণ্ড পৌছিবার কথা। শুনিতেছি, গৌরীকুণ্ডের উচ্চতা ২২ হাজার ফিট। আর ২।৩ মাইল ভয়ানক চড়াই, কি ভাবে যে সকলে যাইবে; জানি না, মাই জানেন।

২৬শে আষাঢ়, শনিবার—এই স্থানটীর নাম 'সরবো'। বেলা প্রায় ১২টায় রওনা হইলাম। আজ কয়দিন যাবতই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, মধ্যে মধ্যে চড়াই-উতরাই আছে। বেলা প্রায় ৪টায় এক স্থানে আসিয়া 'পড়াও' করিলাম। কৈলাশের চূড়া, তিন দিক দেখিলাম। একস্থানে ভোলানাথ দেখাইতেছেন, পাথরের যেন জোড়া মূর্ত্তি। আমাদের দেখাইবার জন্য তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ভাবে তিনি যাহা দেখিলেন আমাদেরও তাহা দেখাইলেন। রাস্তার একস্থানে শিবের চরণ চিহ্ন দেখাইলেন। অবশ্য এইসব বিশ্বাসের কথা,—ভাবের কথা। পথের মধ্যে মধ্যে অনেক স্থানে কি সব লেখা পাথর জড় করা দেখা যাইতেছে। শুনিলাম ওসব 'ওঁ' ও আরও সব 'মহাবাণী'।

আজ আমরা যেখানে আসিয়া তাঁবু টানাইলাম, সেখান হইতে অনতিদূরে একটী জলস্রোতের খুব শব্দ শোনা যাইতেছে। এখানেও লাকড়ী পাওয়া যায় না, গোবর দিয়া রান্না হয়। ষ্টোভও জলিল। বরফ-বৃষ্টি মধ্যে মধ্যে বেশ হইতেছে। একটু দূরেই একটী গুফা, পার্ব্বতী দেবী গিয়া তথা হইতে আমাদের জন্য কৈলাসের ধূপ ও যজ্ঞের ভস্ম নিয়া আসিলেন। 'গারবিয়ান' ত্যাগের পর আর দুধ পাওয়া যায় নাই, গত পরশ্ব চামরী গরুর দুধ ও মাখন পাওয়া গিয়াছে। আগামী কল্যই গৌরীকুণ্ড যাইতে হইবে।

শুনিতেছি এই রাস্তাটাও ভয়ানক খারাপ। কাল প্রায় সমস্ত দিনই ঘোড়ার পিঠে কাটাইতে হইবে; ডাণ্ডি আর যাইবে না, কাজেই স্বামীজীকেও ঘোড়ায় যাইতে হইবে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ও আমাকে নীচে রাখিয়া যাইবার কথা হইতেছিল। কিন্তু ভোলানাথের উদ্যোগে যাওয়াই স্থির হইয়াছে। যাহা হয় হইবে। শ্বাস কষ্টের জন্য কর্পূর ও কিছু মেওয়া এবং পথ কষ্টের জন্যে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র মা সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়াইলেন। কাল আর দুপুরে খাওয়ার স্থান মিলিবে না, তাই কাল খাওয়ার জন্য আজ রাত্রিতেই কিছু তৈয়ার করিয়া নেওয়া হইল। যেন একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বাতাস খুব আছে। কোন প্রকারে সকলে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অখণ্ডানন্দ স্বামিজী আজ রাত্রিতে সুন্দর একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন,—কয়েকটি কালো রংয়ের উলঙ্গ স্ত্রী-মূর্ত্তি। স্বামিজী তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, 'আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, আমার বুঝি কৈলাস পরিক্রমা আর হইল না।' ঐ কৃষ্ণ-বর্ণা স্ত্রী-মূর্ত্তি সম্মুখের একজনকে ইসারায় দেখাইয়া বলিতেছেন,—"ইহাকে বল।" স্বামিজী চাহিয়া দেখেন সম্মুখে উজ্জ্বল হরিদ্রা গৌর বর্ণা এক স্ত্রী-মূর্ত্তি। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমার কি হইবে না?" গৌর বর্ণা স্ত্রীলোকটি আর কিছু বলিলেন না।

২৭শে আষাঢ়, রবিবার—আজ খুব সকালেই রওনা হইতে হইবে। স্বামিজীর যাওয়াও স্থির হইয়াছে। তখন তাঁহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। গৌরীকুণ্ড যাওয়া হইবে তাই কেহ কিছু খাইল না। সঙ্গে চা'ও করিয়া নেওয়া হইল। একটু একটু রৌদ্র দেখা দিল;

গৌরীকুণ্ডে আগমন ও সেখানে ক্রিয়া-কর্ম্ম করা।

বরফ বৃষ্টিও অল্প অল্প চলিতেছে। আমরা প্রায় ৭॥টায় রওনা হইলাম।

মার কথামত ঘোড়াগুলি সব একটার পর একটা সাজাইয়া নেওয়া হইল। কাল রাত্রিতে শীতে প্রায় কাহারও ঘুম হয় নাই। যত গরম পোষাক সবই প্রায় পরিয়া সকলে শুইয়াছিলাম কিন্তু শরীর যেন জলে ভিজা। এইখানেই এই অবস্থা, আজ ত আরও অনেক উচ্চে উঠিতে হইবে। ২২ হাজার ফিট উচ্চে গৌরীকুণ্ড রওনা হইতেই মা দেখাইলেন, "দেখ, চারিদিকে গোল একটা রেখার মত। ইহাকে ধর্ম্মসভা বলে, এ' শরীরের মা ছোটবেলায় আমাকে বলত ইহা শুভ লক্ষণ।" কয়েকদিন পূর্ব্বে গাইড দুপুরে এক স্থানে রাস্তায় ঘোড়া থামাইয়া দেখাইয়াছিল, আকাশে একটী তারা ও চন্দ্র দেখা যাইতেছে। তাহারা বলে একসঙ্গে সূর্য্য চন্দ্র ও তারা দেখা শুভ লক্ষণ।

আমরা চলিলাম। বাতাস খুবই কম ছিল তাই রক্ষা নতুবা ঠাণ্ডায় কি হইত বলা যায় না। বাতাস যে ছিল না তাহাতেই আমরা যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতেছিলাম, অথচ গরম প্যেণ্ট ২।৩টা করিয়া পরা, গরম জামা, সোয়েটার, ওভারকোটও আজ সকলে পরিয়া নিয়াছি। জুতা, মোজা, গরম টুপী, হাত মোজা কিছুরই কাহারও ত্রুটী নাই, তবুও শীতে কাঁপিতেছি। বাস্তবিকই রাস্তা বড় ভয়ানক, প্রস্তরময় চড়াই-পথে পদে পদে ঘোড়া ঠোক্কর খাইতেছিল।

প্রায় ৩ মাইল এইরূপ উঠিতে উঠিতে আমরা গৌরীকুণ্ড দেখিলাম। যাহা কিছু করা এই গৌরীকুণ্ডেই করিতে হয়, আর কোন মন্দির বা মূর্ত্তি নাই। কৈলাস পর্ব্বত প্রদক্ষিণই কাজ। আজই আমাদের প্রদক্ষিণ শেষ। গৌরীকুণ্ড একটী বরফের পুকুর; পর্ব্বতের গায়ও বরফ, কাজেই দেখা যায় কুণ্ডটীর তিন দিকে বরফের প্রাচীর। আমরা বরফের ভিতর

শুনিতেছি এই রাস্তাটাও ভয়ানক খারাপ। কাল প্রায় সমস্ত দিনই ঘোড়ার পিঠে কাটাইতে হইবে; ডাণ্ডি আর যাইবে না, কাজেই স্বামীজীকেও ঘোড়ায় যাইতে হইবে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ও আমাকে নীচে রাখিয়া যাইবার কথা হইতেছিল। কিন্তু ভোলানাথের উদ্যোগে যাওয়াই স্থির হইয়াছে। যাহা হয় হইবে। শ্বাস কষ্টের জন্য কর্পূর ও কিছু মেওয়া এবং পথ কষ্টের জন্যে আবশ্যকীয় জিনিষপত্র মা সকলকে ভাগ করিয়া দেওয়াইলেন। কাল আর দুপুরে খাওয়ার স্থান মিলিবে না, তাই কাল খাওয়ার জন্য আজ রাত্রিতেই কিছু তৈয়ার করিয়া নেওয়া হইল। যেন একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। বাতাস খুব আছে। কোন প্রকারে সকলে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

অখণ্ডানন্দ স্বামিজী আজ রাত্রিতে সুন্দর একটী স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন,—কয়েকটি কালো রংয়ের উলঙ্গ স্ত্রী-মূর্ত্তি। স্বামিজী তাঁহাদের একজনকে বলিলেন, 'আমার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, আমার বুঝি কৈলাস পরিক্রমা আর হইল না।' ঐ কৃষ্ণ-বর্ণা স্ত্রী-মূর্ত্তি সম্মুখের একজনকে ইসারায় দেখাইয়া বলিতেছেন,—"ইহাকে বল।" স্বামিজী চাহিয়া দেখেন সম্মুখে উজ্জ্বল হরিদ্রা গৌর বর্ণা এক স্ত্রী-মূর্ত্তি। স্বামিজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমার কি হইবে না?" গৌর বর্ণা স্ত্রীলোকটি আর কিছু বলিলেন না।

২৭শে আষাঢ়, রবিবার—আজ খুব সকালেই রওনা হইতে হইবে। স্বামিজীর যাওয়াও স্থির হইয়াছে। তখন তাঁহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। গৌরীকুণ্ড যাওয়া হইবে তাই কেহ কিছু খাইল না। সঙ্গে চা'ও করিয়া নেওয়া হইল। একটু একটু রৌদ্র দেখা দিল;

গৌরীকুণ্ডে আগমন ও সেখানে ক্রিয়া-কর্ম্ম করা।

বরফ বৃষ্টিও অল্প অল্প চলিতেছে। আমরা প্রায় ৭॥টায় রওনা হইলাম।

মার কথামত ঘোড়াগুলি সব একটার পর একটা সাজাইয়া নেওয়া হইল। কাল রাত্রিতে শীতে প্রায় কাহারও ঘুম হয় নাই। যত গরম পোষাক সবই প্রায় পরিয়া সকলে শুইয়াছিলাম কিন্তু শরীর যেন জলে ভিজা। এইখানেই এই অবস্থা, আজ ত আরও অনেক উচ্চে উঠিতে হইবে। ২২ হাজার ফিট উচ্চে গৌরীকুণ্ড রওনা হইতেই মা দেখাইলেন, "দেখ, চারিদিকে গোল একটা রেখার মত। ইহাকে ধর্ম্মসভা বলে, এ' শরীরের মা ছোটবেলায় আমাকে বলত ইহা শুভ লক্ষণ।" কয়েকদিন পূর্ব্বে গাইড দুপুরে এক স্থানে রাস্তায় ঘোড়া থামাইয়া দেখাইয়াছিল, আকাশে একটী তারা ও চন্দ্র দেখা যাইতেছে। তাহারা বলে একসঙ্গে সূর্য্য চন্দ্র ও তারা দেখা শুভ লক্ষণ।

আমরা চলিলাম। বাতাস খুবই কম ছিল তাই রক্ষা নতুবা ঠাণ্ডায় কি হইত বলা যায় না। বাতাস যে ছিল না তাহাতেই আমরা যেন ঠাণ্ডায় জমিয়া যাইতেছিলাম, অথচ গরম প্যেণ্ট ২।৩টা করিয়া পরা, গরম জামা, সোয়েটার, ওভারকোটও আজ সকলে পরিয়া নিয়াছি। জুতা, মোজা, গরম টুপী, হাত মোজা কিছুরই কাহারও ত্রুটী নাই, তবুও শীতে কাঁপিতেছি। বাস্তবিকই রাস্তা বড় ভয়ানক, প্রস্তর-ময় চড়াই-পথে পদে পদে ঘোড়া ঠোক্কর খাইতেছিল।

প্রায় ৩ মাইল এইরূপ উঠিতে উঠিতে আমরা গৌরীকুণ্ড দেখিলাম। যাহা কিছু করা এই গৌরীকুণ্ডেই করিতে হয়, আর কোন মন্দির বা মূর্ত্তি নাই। কৈলাস পর্ব্বত প্রদক্ষিণই কাজ। আজই আমাদের প্রদক্ষিণ শেষ। গৌরীকুণ্ড একটী বরফের পুকুর; পর্ব্বতের গায়ও বরফ, কাজেই দেখা যায় কুণ্ডটীর তিন দিকে বরফের প্রাচীর। আমরা বরফের ভিতর

দিয়াই আসিতেছি; যদিও পথে বরফ বেশী নাই কিন্তু দুই ধারেই পর্ব্বতের গায় বরফ। কুণ্ডের একটু উপরে রঙ্গিন কাপড়ের নিশান দিতে হয়। সবই নিয়া যাওয়া হইয়াছিল। অনেক কষ্টে আমরা গৌরীকুণ্ডের কাছে নামিলাম। বরফ জমিয়া কঠিন হইয়া আছে। পাড়ের নিকট কিছু কিছু জল আছে, তাহার মধ্যেও হাল্‌কা বরফ-খণ্ড ভাসিতেছে, সেগুলি সরাইয়াই স্নান করিতে হয়। ভোলানাথ, দাসুদাদা ও আমাদের সঙ্গের ব্রহ্মচারী (ভারতী) স্নান করিলেন। আমরা মাথায় জল দিলাম। তথায় আমরা অনেকক্ষণ ছিলাম। মা'ও মাথা ধুইলেন, জল পান করিলেন। মেওয়া দিয়া ভোগ দেওয়াইলেন। ধূপকাঠী জ্বালাইয়া সকলকে দিয়া আরতি করাইলেন। ভোলানাথের একটা বড় জটা কাটিয়া গৌরীকুণ্ডের বরফে অর্পণ করা হইল।

যদিও অল্প অল্প বরফ বৃষ্টি চলিতেছিল তবুও একটু সূর্য্য উঠিল এবং বাতাস না থাকায় আমাদের বিশেষ কষ্ট হইল না। তবে স্বামিজীর বিশেষ শ্বাসকষ্ট; প্রায় কুম্ভকের মত অবস্থায় মার পিছনে গিয়া বসিয়াছেন। জ্যোতীষদাদারও প্রায় সেই অবস্থা; সকাল বেলা হইতেই তাঁহার বুকের অবস্থা ভাল নয় কিন্তু তিনি কিছু প্রকাশ করেন নাই পাছে সকলের যাওয়া বন্ধ হয়। ফিরিবার পর এই সব কথা বলিয়াছেন। মার কৃপায় ও ভোলানাথের উদ্যোগে সকলেই গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করিলেন। আজ সঙ্গীয় সকলকে কিছু খাওয়াইতে হয়, এই নিয়ম। তাঁহাদের কিছু ফল ও হালুয়া সঙ্গে যাহা আছে, বিলি করা হইল। কিছু পাওয়ার ত উপায় নাই।

প্রায় ১২॥ টায় আমরা গৌরীকুণ্ড হইতে রওনা হইলাম। এবার উৎরাই, এ'যেন আরও সাঙ্ঘাতিক। সব সময় ঘোড়ার পিঠেও থাকা চলে না। আমরা ঘোড়ায় যে রাস্তা দিয়া নামিলাম, দেখিলেও ভয় হয়।

প্রায় দুই মাইল উৎরাই। মার সঙ্গে দুইটি লোক রহিল। এইভাবে বেলা প্রায় ২॥ টায় আমরা সমভূমিতে পৌছিলাম। সম্মুখে জলস্রোত, আমরা তথায় বসিয়া কিছু জলখাবার খাইয়া আবার রওনা হইলাম।

সমতল ভূমিতে প্রায় ৪।৫ মাইল চলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী জলস্রোতের ধারে আমাদের তাঁবু পড়িল। রাস্তায় ভয় আছে, ডাণ্ডিতে চলিলে অনেক পিছে থাকিতে হয় বলিয়া স্বামিজী ঘোড়াতেই আসিলেন।

পথে প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেখিলাম ২টী লোক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করায় পয়সা দেওয়া হইল। এইভাবে নাকি ১৫ দিনে প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়। আমরা দেখিয়া অবাক হইতেছি, এই দুর্গম রাস্তা, এইভাবে একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে আবার উঠিয়া যেখানে মাথা ছিল সেখান হইতে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে; হাঁটুতে ও বুকে মোটা কাপড় জড়াইয়া নিয়াছে। তাহাদের ভক্তি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইতেছি।

এর মধ্যে আমাদের গাইড্ গিয়া খবর নিয়া আসিল, তাহারা নিজের মুখেই স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা দস্যু দলপতি। এইভাবে লোককে ফাঁকি দিতেছে। আমরা ইহাতেও অবাক্ হইলাম। তাঁবুতে আসিয়া স্থির হইল কাল হইতে জ্যোতীষদাদা একটু বিশ্রামের জন্য ডাণ্ডিতে যাইবেন, মা ত ভক্তদের জন্য কত কষ্টই স্বীকার করিতেছেন! রাত্রিতেই রান্না হইল, সকলে খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মা কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "দেখিতেছি পাঁচটী গেরুয়াধারী সাধু (সূক্ষ্ম শরীরে) কাছে আসিয়া বলিতেছে, "আমরা তোমার সহিত পরিক্রমায় ছিলাম।" এমন ত কত থাকে। আমি কিছু না বলিতেই আর একজন সূক্ষ্মশরীরী তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' ঐ

সাধুরা জবাব দিল, "আমরা ঐ যে কানাই, (মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্র) তাঁহারই শিষ্য। এই ভাবেই এখনও কাজ করিয়া যাইতেছি।" মা বলিতেছেন, "এই কথায় বুঝা যায়, কানাই এই জন্ম হইতে পূর্ব্ব জন্মে উচ্চ অবস্থায় ছিল।"

এই কথা বলিয়া সূক্ষ্ম শরীরীদের প্রসঙ্গে বলিলেন, "তোমাদের যেমন দেখি, পরিষ্কার সেইভাবে তাঁহাদেরও দেখিতে পাই। তোমরা যেমন পায় হাত বুলাও, প্রণাম কর, তোমাদের পাশে বসিয়া তাহারাও তাহাই করে।"

এখানেও লাক্‌ড়ী পাওয়া যায় না কিন্তু পার্ব্বতী দেবী একটা গুফা হইতে কিছু লাক্‌ড়ী কিনিয়া আনিলেন। লাক্‌ড়ী অর্থাৎ কাঁটার কয়েকটী ছোট ছোট ডালা। আমরা পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত পোষাকেই দিন রাত্রি কাটাইতেছি। কালই আমরা 'বুন্দ' পৌছিব। তথায় আমাদের জিনিষপত্র রাখিয়া আসা হইয়াছে। এখানে ভিখারীর সংখ্যা মন্দ নয়। তাহাদের এক মুঠি করিয়া ছাতু দিতে হয়, তাহাতেই তাহারা খুসী, এমনই গরীব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২৮-শে আষাঢ়, সোমবার—আজও খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব। এখন আমরা ফিরিবার পথে। কালই প্রদক্ষিণ শেষ হইয়া গিয়াছে। গতকল্য রাত্রিতে আমরা 'ডিডিপোতে' ছিলাম, আজ আমরা 'জিজি-পোতে' আছি।

প্রত্যাবর্ত্তন।

মানস সরোবরে পার্ব্বতী দেবী ও গৌরীকুণ্ডে টুনু ভোলানাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। খাওয়া দাওয়ার পর রওনা হইলাম। জ্যোতীষ দাদা ডাণ্ডিতে চলিলেন। বুন্দ পৌছিয়া তথায় যে জিনিষপত্র রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা লইয়া 'বরখা' নামক স্থানে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া 'পড়াও' করিলাম।

বাতাস খুব বেশী থাকায় খুব ঠাণ্ডা। এখানে দেখিতেছি, যেই একটু রৌদ্র ওঠে অমনি বেশ একটু গরম হয়, আবার রৌদ্র একটু কমিলেই, অথবা বাতাস বহিলেই ভয়ানক ঠাণ্ডা। আজও খুব ঠাণ্ডা। সঙ্গের তুই একজন সহিসই বাসনপত্র মাজে। কেশবসিংও সঙ্গে আছে। রাত্রি প্রায় ৯টায় সকলেই, শুইয়া পড়িলেন। এখান হইতে কৈলাস পর্ব্বতের চূড়া অতি সুন্দর দেখাইতেছিল, বরফে আবৃত। আমাকে দিয়া ঘৃতের প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করাইলেন। মানস সরোবর ও 'গৌরীকুণ্ড' হইতে মা জল আনাইয়াছেন।

২৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার—আজ প্রাতে বেশ রৌদ্র উঠিল। সকলে জামা কাপড় খুলিয়া রৌদ্রে দিল। টুনুর জামার ভিতর অনেক

পিশু পোকা ঢুকিয়া তাহার সর্ব্বশরীর ব্রণময় করিয়া তুলিয়াছে। আজ জামা খুলিয়া দিল। বেলা ১২টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইলাম। এখানেও চামরী গরুর দুধ ও মাখন পাওয়া গেল, ছাগ দুগ্ধের মাখন পাওয়া গেল। আমরা কিছু নিয়া নিলাম। ইহারা মেষচর্ম্মের কৌটার ভিতর মাখন রাখে। ৫ মাইল আসিয়া একটা মাঠের মধ্যে "রাক্ষস তালাওর" তীরে ৪॥ টায় আসিয়া তাঁবু টানাইলাম। আজ মা ডাণ্ডিতে আসিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনা নাই।

৩০শে আষাঢ়, বুধবার—সকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় রওনা হইলাম। রাস্তা ময়দান, মধ্যে মধ্যে চড়াই-উৎরাইও আছে। কাল রাত্রেও কিছু কিছু বরফ বৃষ্টি হইয়াছে। ঠাণ্ডাও খুব গিয়াছে। কৈলাস এখান হইতেও বেশ দর্শন হইতেছে। আমরা একটা পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া মানস সরোবর বেশ দেখিতে পাইলাম। আসিবার সময় আমরা মানস সরোবরের রাস্তায় আসি নাই, অপর রাস্তায় আসিতেছি। ঘোড়াগুলি প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। ৬ ঘণ্টা চলিবার পর প্রায় ৯।১০ মাইল আসিয়া "রাক্ষসতালাওর" আর এক পাড়ে "পড়াও" করিলাম। তাক্লাকোট পৌছিতে আরও ২।৩ দিন লাগিবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা ও গরম অনুভব করিতেছি।

আমাদের ৫টা তাঁবু আসিয়াছে; একটাতে মা, ভোলানাথ, স্বামিজী, জ্যোতীষ দাদা, পার্ব্বতী দেবী ও আমি থাকি। আর একটীতে দাশু দাদা, টুনু ও ব্রহ্মচারীজী থাকেন। আর একটীতে রান্না হয়। সেটাতে কেশব সিং থাকে। আর দুটিতে গাইড্ ও সঙ্গীয় লোকজন থাকে। কতদিন যাবৎই আমাদের গৃহস্থালী সকালে উঠাই আবার সন্ধ্যাবেলা বিছাই। এই ভাবে চলিয়াছে, আরও কয়েকদিন চলিবে। বৃষ্টি অর্থাৎ

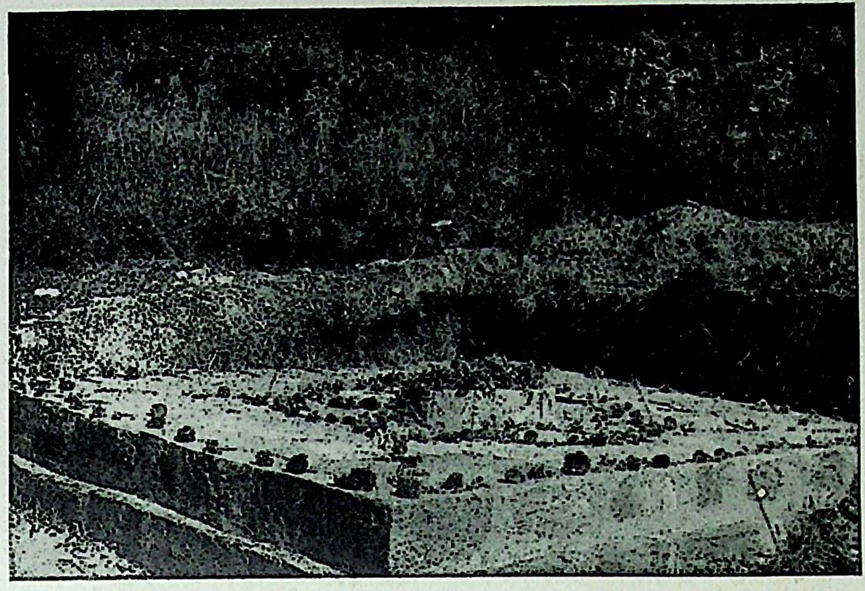

ভাইজীর সমাধি স্থানের নিথর গাম্ভীর্য্য

বরফই বেশী, আর বিশেষ কিছু অসুবিধা হইতেছে না। এই খোলা যায়গায় বর্ষা মধ্যে মধ্যে ভয়ানক অসুবিধা করিয়া তুলিতেছে। আবার তাক্‌লাকোটের নীচে নামিলেই বৃষ্টিতে খুবই কষ্ট পাইতে হইবে।

৩১শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার—খাওয়া দাওয়া করিয়া বেলা প্রায় ১১টায় রওনা হইলাম। কিছু দূর যাইবার পর আমার বাম দিকটা ভয়ানক বেদনা হইয়া অবশের মত হইয়া পড়ায়, আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া শুইয়া পড়িলাম কিছুক্ষন পর আমাকে ডাণ্ডিতে দিয়া মা ঘোড়ায় আসিলেন। আজও প্রায় ১০ মাইল আসিলাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া এক স্থানে পড়াও করা হইল, এখানেও ভয়ানক ঠাণ্ডা। বাতাস খুব জোরে চলিতে লাগিল।

পথে অনেকক্ষণ কৈলাস-দর্শন হইয়াছে। রাক্ষসতালাও দেখিতে দেখিতে আসা হইয়াছে। ইহাও প্রকাণ্ড, মা বলেন, "এদিক হইতে দেখায় কেহ যেন মানস সরোবর তৈয়ার করিয়া মাটি তুলিয়া রাখিয়াছে, তাহাই পাহাড় হইয়া আছে। দেখনা কোনদিকে ঝর্ণার চিহ্ন নাই।" সকলে বলাবলি করিতেছেন,—যদি দেবতারা মানস সরোবর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, পাশেই রাবণ, তালাও সৃষ্টি করিয়াছে। রাবণ ত কম ছিলেন না! মা বলেন, "অসম্ভব কি? সম্ভবও অসম্ভব; অসম্ভবও সম্ভব।" আমরা আজ মান্ধাতা পর্ব্বতের পাশে আছি। রাজা মান্ধাতা নাকি এই পর্ব্বতে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এখন কৈলাস বা রাবণহ্রদ (রাক্ষসতালাও), কিছুই দেখা যায় না।

৩২শে আষাঢ়, শুক্রবার—খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইলাম। ৬ মাইল যাইয়া থাকিতে হইবে কারণ এখন বেশী চলিবার ক্ষমতা অনেকেরই নাই। আজ ৬ মাইল গিয়া ঐ রকমই একটা পাহাড়ের মধ্যস্থলে সমতল ভূমিতে তাঁবু ফেলা হইল। আজও আমি মায়ের

আদেশে ডাণ্ডিতে আসিয়াছি। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়াই আমার বাম দিকটা ধরিয়াছিল।

আমাদের খাওয়া দাওয়া খিচুড়ী, (মুসুরি ডাল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া আমাদের খিচুড়ী খাওয়া ঘটে না) রুটী, ভাত,—যখন যা' করা যায়। তরকারির মধ্যে আলু, আর কিছুই নাই; যখন তাহা ফুরাইয়া গেল, তখন ছোলা ভাজিয়া (সঙ্গে ছিল), অথবা শুধু চিনি দিয়াই আমাদের, খাওয়া চলিল। কৈলাস পতির কৃপায় কাঁচা কাঁচা গাছগুলি বাতাস দিতে দিতে জ্বলে। তাই রান্না চলিতে-ছিল, নতুবা অসম্ভব হইত। এই ভাবেই দিন কাটিতেছে, কখনও কখনও জলস্রোতের নিকট তাঁবু পড়ে, তখন সমুদ্র-গর্জ্জনের মত অবিরাম কল্লোলধ্বনি কানে আসে, বেশ লাগে।

স্বামিজ্জী পরিক্রমার পর ফিরিবার পথে আবার স্বপ্ন দেখিতেছেন—একজন যেন তাঁহাকে দুর্গা পূজার নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া পকেটের ভিতর কি গুঁজিয়া দিতেছেন। স্বামিজ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি দিতে-ছেন?' তিনি বলিলেন, "দুর্গা পূজার আশীর্ব্বাদ দিয়া গেলাম।" স্বামিজ্জী তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আমার বাড়ীতেও দুর্গা পূজা হয়।'

১লা শ্রাবণ, শনিবার—আজ আমরা প্রাতে প্রায় ৭টায় রওনা হইলাম; ৫।৬ ঘণ্টা চলিলেই তাক্‌লাকোট পৌছিব: প্রাতে না খাইয়াই রওনা হইয়া প্রায় ৫ ঘণ্টা কি ৫॥ ঘণ্টা চলিয়া তাক্‌লাকোট পৌছিলাম। এখানে কয়েকখানা দোকান আছে, কয়েক ঘর গৃহস্থ আছে। এটা একটা বড় কারবারের জায়গা।

প্রত্যাবর্ত্তন পথে তাক্‌লাকোট।

আমরা পৌছিতেই আলমোড়ার রম্ভা দেবীর কাকা মাকে নিজের

দোকানে নিয়া গেলেন। তথায় কিছু কিছু জিনিষ খরিদ করা হইল, সঙ্গের জিনিষ অনেক ফুরাইয়া গিয়াছিল। আলু বা অন্য তরি-তরকারী পাওয়া যায় না, চিনি ইত্যাদি কিছু কিছু জিনিষ পাওয়া গেল। এখানে খুব মটর ক্ষেত ; সঙ্গের লোকেরা, আমাদের শাক আনিয়া দিল। কোন প্রকারে তাহাই সিদ্ধ করিয়া তরকারি রাঁধিলাম।

শুনিলাম, রাজার হুকুম, ক্ষেত হইতে কেহ শাক নিতে পারিবে না। এখানে রাজাকে খুব বেশী কর দিতে হয় বলিয়া কেহ রাজার উপর সন্তুষ্ট নয়।

লামা অনেক দেখিলাম, গুহাও অনেক আছে, কিন্তু উপযুক্ত লামার খবর কেহই দিতে পারিল না। শুনিলাম লামাদের চিরকুমার থাকিবার প্রথা, বিবাহ করিলে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

আমাদের তাঁবু পাহাড়ের নীচে জলের ধারে ফেলা হইয়াছে। জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়াই পাহাড়ের নীচে আসিলাম। খাওয়া দাওয়া করিতে বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। রুদ্রা দেবীর ভাই বিকালে মার জন্য কিছু ফল ও সুন্দর একটী কাঠের বাটী নিয়া আসিল। আমরা এখানে কয়েকটী চামর কিনিলাম। এদিকে চামরী গরু ছাড়া আমাদের দেশীয় গরু দেখা যায় না।

এদেশে একটী বড় সুন্দর, প্রবাদ শুনিলাম। আমাদের সঙ্গের সহিসরা অনেকেই মানস সরোবর হইতে ২।১টী ছোট মাছ পিঠে বাঁধিয়া লইয়া আসিয়াছে। এই মাছ তাহারা খাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "আমরা এই মাছ খাইবার জন্য আনি নাই। এ মানস সরোবরের মাছ, অমূল্য জিনিষ। ছাগল-ভেড়ার পালে যখন বাঘ পড়ে তখন এই মাছপোড়া গন্ধে বাঘ শুধু মানস-সরোবরই দেখে ; তখন তাহাকে এই দেহভার হইতে মুক্তি দিয়া পরলোকের পথে যাত্রা করানো, আমাদের পক্ষে অতি সহজ

হয়!" এ গল্প কতদূর সত্য বলিতে পারি না কিন্তু ইহাদের ত অগাধ বিশ্বাস।

আজ শীত অনেক কম। শ্বাসের অবস্থা সকলেরই অনেকটা স্বাভাবিক। সকলে প্যেণ্ট্ ও গরম জামা ছাড়িয়া, কাপড় পরিলেন। অনেক আরাম পাইলাম। অবশ্য বৈকালে আবার গরম জামা ও প্যেণ্ট পরিলাম তবুও শীত অনেক কম। কতগুলি তিব্বতী স্ত্রীলোক ছেলে-মেয়ে নিয়া তাঁবুর কাছে দাঁড়াইয়া আছে, তামাসা দেখে। সারাদিন দলে দলে লোক তাঁবুর কাছে দাঁড়াইয়াই আছে। বৈকালে মা করতাল বাজাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে গান গাহিতে বলা হইল। তাহাদের ভাষা একেবারেই বোঝা যায় না, সহিসরা বুঝাইয়া দিলে, ৪।৫টী স্ত্রীলোক হাত ধরাধরি করিয়া খুব আনন্দে নাচিতে নাচিতে গান করিতে লাগিল। ইহাদের সরল স্বভাব, সঙ্কোচের লেশ মাত্র নাই। মার আদেশে ইহাদিগকে আমাদের সঙ্গের কিস্‌মিস্, পেস্তা ইত্যাদি সব বিলি করিয়া দিলাম। ফল পাইয়া তাহারা মহা খুসী। সন্ধ্যার পরেই আমরা শুইয়া পড়িলাম।

গাবরিয়ান আরও ৩।৪ দিনের পথ। রুদ্রা দেবীর ভাই (নন্দরাম বাবুর ছেলে) আজ সন্ধ্যায় কতগুলি চিঠি দিলেন, গাবরিয়ানে তাঁহাদের ঠিকানায় আসিয়াছিল। অনেক দিন পর ঢাকার হিরণ দিদির, গণেশ দাদার ও কলিকাতা হইতে স্নেহলতা বসু ও ননীর পত্র পাইলাম। নগেন দাদা প্রভৃতিরও কয়েকখানা পত্র আসিয়াছে। এতদিন চিঠি পত্রের কোন সম্বন্ধই ছিল না, যেন এক ভিন্ন জগতে ছিলাম। যাক্, আগামী কল্য খাওয়া দাওয়া করিয়াই রওনা হইব, স্থির হইয়াছে।

২রা শ্রাবণ, রবিবার—আজ প্রাতে পার্ব্বতী দেবী আসিয়া পাহাড়ের উপরে লামাদের গুহায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন।

লামাদের গুহায় গমন।

কথা হইল, ফিরিয়া আসিয়া আমি রুটী করিয়া লইব আর দাসু দাদা তাঁহাদের রান্না করিয়া রাখিবে।

আমি, মা, ভোলানাথ, টুনু, জ্যোতিষ দাদা ও পার্ব্বতী দেবী ঘোড়া নিয়া উপরে চলিলাম। একেবারে পাহাড়ের মাথায় লামাদের গুহা, তা'র সঙ্গেই রাজ প্রতিনিধির বাড়ী। আমরা গুহা দর্শনে চলিলাম। ভয়ঙ্কর চড়াই, আবার আসিবার সময় উৎরাইও তেমনি। ঘোড়ার পিঠে চড়াই-উৎরাই এখন আর ভয় করে না, অনেকটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে, পাহাড়ের গায় যেভাবে রাস্তা গিয়াছে, ঘোড়ার পা একটু ফস্কাইয়া গেলেই কোথায় পড়িব ঠিক নাই। রাস্তা নামে মাত্র, পাহাড়ের গায়ে গায়ে এইভাবে উঠিতে উঠিতে আমরা একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠিলাম।

লামাদের গুহা হরিদ্রা বর্ণের, রাজার বাড়ী লাল রংএর। আমরা গুহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড গুহা, অনেক লোক তথায় বাস করে। শুনিলাম শিশু-ছেলেদেরও সন্ন্যাসী করিয়া দিয়া গিয়াছে। রাজাই সকলের ভরণপোষণ করেন অর্থাৎ প্রজাদের উপর হুকুম, সব সাধুদের আহার্য্য যোগাইতে হইবে। দেখিলাম অনেক বালক বসিয়া শাস্ত্র পড়িতেছে।

প্রধান লামাকে দেখিতে আমরা অনেকগুলি আশঙ্কাজনক কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম প্রৌঢ় বয়স্ক একজন লামা গদির উপর একটী কুকুর নিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে বুদ্ধদেবের ছবি ও মূর্ত্তি, অন্যান্য মূর্ত্তিও আছে। পূর্ব্বের গুহার মত এখানেও প্রতি মূর্ত্তির সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র সাজান। বহু পুস্তকও সাজান আছে। আরও আসবাব পত্র আছে। আমাদের মধ্যে জ্যোতীষ দাদা

বলিলেন, "কিছু শক্তি দেন।" কথা কিছুই বোঝেন না। পরে আমাদের সঙ্গীয় সহিসরা ও পর্ব্বতী দেবী বুঝাইয়া দেওয়ায় নানারকম প্রসাদ দিতে লাগিলেন। "তীর্থপুরী"র প্রসাদ, "খচ্চর নাথের" প্রসাদ ইত্যাদি।

আমরা এই সব স্থানে গেলাম না কারণ সময় আরও বেশী লাগিবে, রাস্তাও ভাল নয়; রঙ্গিন কাপড়ের টুকরাও দিল। দেখিতেছি, এই বস্ত্রের টুকরা ইহারা খুবই শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করেন, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট ছোট বস্ত্রের টুকরা, দড়ি দিয়া জড়াইয়া প্রত্যেক দেবস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গৃহস্থদের বাড়ীর উপরেও সেইরূপ; রাস্তার মধ্যে মধ্যে পাথর জড় করিয়া ঐরূপ বস্ত্র টানাইয়া রাখিয়াছে। অবশ্য পাথরগুলির মধ্যে অনেক লেখা আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, "ওঁ" লেখাটা অনেকটা আমাদের মতই, আর এই শব্দটা ইহারা খুব ব্যবহার করে।

আমরা গুহার সব স্থান দেখিতে লাগিলাম। এক ঘরে গিয়া দেখি তারামূর্ত্তিও আছেন; অন্য এক ঘরে আর এক দেবীমূর্ত্তি আছেন; একটী ঘরে বুদ্ধের প্রকাণ্ড পিতলের মূর্ত্তি সাজাইয়া রাখিয়াছে। উপযুক্ত লামাদের মূর্ত্তিও স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়াছে। একটী বৃদ্ধ লামা, আমরা তাঁহার ঘরে গেলে চা খাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলাম ইহারা সকলে মিলিয়া চা ভোগ দিয়া প্রসাদ পান। চা না খাইয়া এদেশে উপায় নাই। আমরাও টাকা, চা, কিছু শুষ্ক ফল ('মেওয়া') ও মিশ্রি নিয়া গিয়াছিলাম, এসব গুহাতে দিতে হয়।

ছেলেদের থাকিবার ঘরও দেখিলাম। প্রায় অন্ধকার; চারিদিক খুব পরিষ্কার নয়, তবে যে সব ঘরে মূর্ত্তি আছে তাহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রথম ঢুকিতে একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ পাইয়াছিলাম। ভেড়ার, চামরীর শিং ও হাড়ের কোথাও অভাব নাই। গুহাতে ঢুকিতেই একটা প্রকাণ্ড বন্য চামরীর মস্তক দেখিলাম।

শুনিলাম লামারা ডাল, ভাত সবই খান, কেহ কেহ মাংসও খান। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর মত গুহা। বৃদ্ধ লামার ঘরে পাতলা গোলাকৃতি কাগজের মধ্যে কি সব লেখা আছে। জ্যোতীষ দাদা তাহা আনিতে চাহিলেন, কিছুতেই দিবে না। শুনিলাম কৃষির কোনরকম বিঘ্ন হইলে এই কাগজে বিঘ্ন দূর হয়। অনেক বলার পর আট আনা দিয়া দুই খানা কাগজ নিয়া আসা হইল।

আমরা ফিরিতে ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আসিয়া রুটী করিয়া ভোগ দেওয়া হইল। কয়েকজন লোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আর পাহাড়ী স্ত্রীলোকগুলিও ভোর বেলা হইতেই তাঁবু উঠাইয়া দেখিতেছে। যতক্ষণ আমরা ছিলাম তাহারা তাঁবুর চারিদিকে ভীড় করিয়াই ছিল।

খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইতে প্রায় ১টা বাজিল। কাল জ্যোতীষ দাদা ডাণ্ডিতে গিয়াছিলেন, আজ মা' চলিলেন। আমরা সকলে ঘোড়ায় চলিলাম। পথে অনেক ব্যবসায়ীদের দেখা গেল। কোন কোন দল তাঁবু করিয়া আছে, কোন কোন দল পাহাড়ের নীচে জলাশয়ের কাছে রান্না চড়াইয়াছে। ঘোড়া, খচ্চর, চামরী গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাদের পিঠের বোঝাগুলি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলেই আবার তাহাদের পিঠে সব চড়াইয়া দিয়া রওনা হইবে।

তাকলাকোট একটা কারবারের যায়গা। সকলেই তাক্‌লাকোট যাইতেছে। নীচের জিনিষ উপরে এবং উপরের জিনিষ নীচে চালান দিবার এই স্থান। এখানেই সকলে একত্র হইয়া জিনিষ পত্রের আদান প্রদান করে।

আমরা আজ ৬ মাইল আসিয়া "পড়াও" করিলাম। আরও দুই আড়াই মাইল গেলেই লিপুর চড়াই আরম্ভ হইবে। একটু দূরেই থাকা

হইল কারণ লিপুর বেশী নিকটে ঠাণ্ডায়, থাকা কষ্টকর হইবে। এখানেও জলস্রোতের ধারেই তাঁবু ফেলা হইল। এই এক জীবন চলিয়াছে। ঘাসের ফুল নানা স্থানে নানারকম দেখিতেছি। কোন স্থানে হরিদ্রা বর্ণের ফুলের বিছানার উপরই তাঁবু পড়িতেছে, কোথাও লাল; আজ বেগুনি রংএর ফুলের বিছানা দেখিলাম।

বেলা থাকিতেই আমরা পৌছিয়াছি। তাকলাকোট হইতে আস্ত মটর নিয়া আসিয়াছি। সঙ্গে ত কোন তরকারিই নাই, ডালও ফুরাইয়া গিয়াছে। মটরগুলিও কালো কালো; আজ ষ্টোভে তাহাই ভাজিয়া সকলের খাওয়া হইল। কাল 'লিপু' পার হইতে হইবে। এ রাস্তাকে সকলেই ভয় করে, যাই-বার সময়ই লিখিয়াছি। ইহার উচ্চতা নাকি ১৮ বা ১৯০০০ ফিট। অনেকের এখানে মাথা ঘুরিয়া যায়। গতবার কেশব সিং মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ মা আবার সকলকে কর্পূর, আচার এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ দেওয়াইয়া রাখিলেন। কাল ভোরে বাহির হইতে হইবে। কখন খাওয়া দাওয়া হয় ঠিক নাই। তাই কিছু কিছু খাবারও তৈয়ার করা হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমি গুহাতে আসিলাম।

৩রা শ্রাবণ, সোমবার—আমরা আজ সকালেই রওনা হইলাম। সঙ্গে চা করিয়া নেওয়া হইল। ঠাণ্ডায় শরীর খারাপ হইলে চা বড়ই দরকারী। আশা করি কাল 'গারবিয়ান' পৌছিব। বেলা প্রায় ৭॥ টায় রওনা হইলাম। আজ লিপুতে বরফ অনেক কম। বরফের উপর অল্পই চড়াই করিতে হইল। তারপর উৎরাইও খুব, কিন্তু বরফের উপর নয়। তাকলাকোটের উপরের রাস্তা যেমন ময়দানই বেশী, এদিকে আবার চড়াই-উৎরাই তেমনই বেশী। রাস্তাও প্রস্তরময়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলিতে হয়। নীচু হইতে রাস্তা

লিপু অতিক্রম করিয়া কালাপাণি আগমন।

দেখিলে ভয় হয়। মার কৃপায় ঘোড়াগুলি অনায়াসে সেই সব রাস্তা পার হইয়া আসিল। আমরা বেলা প্রায় সোয়া তিনটায় 'কালাপানি' আসিয়া তাঁবু ফেলিলাম।

এতটা পথ আসিতে খুবই কষ্ট হইল। রাস্তার এক স্থানে বসিয়া কিছু জল খাওয়া হইয়াছিল। 'কালাপানি' আসিয়া রান্নাবান্না হইল। পথে এক স্থানে কিছু আলু পাওয়া গেল, তাহাই যেন কত আনন্দের বিষয়—পচা শুক্‌না আলু। এমনি আমাদের অবস্থা! সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে খাওয়া দাওয়া করিয়া অবসর হইলাম।

এখানেও জলস্রোতের গুরু-গম্ভীর শব্দ চলিয়াছে। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, নির্ম্মল নীলাকাশ। পাহাড়ের গায়ে একটু সমতল স্থান দেখিয়া তাঁবু ফেলা হইয়াছে। চারিদিক বরফে ঢাকা পাহাড়। কাল সকালে রওনা হইবার কথা হইল। গারবিয়ান্ গিয়াই খাওয়া দাওয়া হইবে স্থির হইল। এখান হইতে গারবিয়ান আট, দশ মাইলের রাস্তা। এ রাস্তাও বড় খারাপ।

৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবার—আজ সকালে আমরা রওনা হইলাম। কাল রাস্তায় নন্দরাম বাবুর সঙ্গে দেখা; তিনি তাকলাকোট যাইতেছেন। ইনি আলমোড়ার রুদ্রা দেবীর পিতা। এখন সকলেই তাকলাকোট যাওয়া আসা করিতেছেন। কারণ বাৎসরিক কেনাবেচার, ইহাই সময়। এদিকে পশম কারবারীই, সব বলিলে হয়। পশমই ইহাদের টাকা। ব্যবহারের জিনিষ ত সবই পশমের। কাপড়, জামা, টুপি, এমন কি দড়ি গাছটিও পশমের। খাবার রাখিবার থলিয়া, কাপড় রাখিবার থলিয়া, সবই চামড়ার। গায়ের জামাও চামড়ার দেখিতেছি।

আমরা বেলা প্রায় ৭॥ টায় রওনা হইলাম। রাস্তা বড় খারাপ, যেমন চড়াই উৎরাই তেমনই অতি-সঙ্কীর্ণ ও প্রস্তরময়। প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাই-

বার সম্ভাবনা। ঘোড়াগুলি এ'সব রাস্তা পার হইবার সময় যদি এক আঙ্গুলও এদিক, ওদিক হয়, তবে বহু নীচে একেবারে নদীর মধ্যে পড়িতে হইবে। মাত্র একটা ঘোড়াই চলিতে পারে। কি ভাবে যে ঘোড়াগুলি এসব রাস্তা দিয়া খাড়া চড়াই করিয়া, পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া যায়, আবার সেইরূপ উৎরাই করিয়া নদীর ধারে নামিয়া আসে, না দেখিলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন। আর সহিসগুলিও অনায়াসে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। আমাদের ধরিয়া ধরিয়া কোন কোন স্থান পার করিয়া দিতেছে, অথচ সে সব জায়গায়, বলিতে গেলে দাঁড়ানই অসম্ভব। একেবারে খাড়া পাহাড়, কোনরকম রাস্তা নাই। অভ্যাসে যে সব সম্ভব হয়, ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ। ভুক্ত-ভোগী ছাড়া ইহা সম্যকরূপে কেহ বুঝিবে না। তবে সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা মায়ের কৃপায় আর বাবা 'ভোলানাথের' উৎসাহে ভালই আসিয়াছি। আজ রাস্তায় বাহির হইতেই গাছ-পালা, (চিরগাছই বেশী), বনভূমি দেখিয়া খুব আনন্দ হইল, চলিবার সময় গাছের ছায়া পাইতেছি। বহুদিন এ দৃশ্য দেখি নাই, তাই আজ শ্যামশোভায় বড় শান্তি পাইতেছি। ছোট ছোট ফুল গাছ কাল হইতেই খুব বেশী দেখিতেছি। কত রকমের ফুলই যে ফুটিয়া আছে! যেন সাজান বাগান!

পথে আসিতে আসিতে দেখিতেছি দলে দলে ব্যবসায়ীরা গারবিয়ান হইতে তাকলাকোট যাইতেছে। ঘোড়া, চামরী গরু, খচ্চর, ছাগল ও ভেড়ার পাল জিনিষ পত্র নিয়া চলিয়াছে। এই ছাগল ও ভেড়াগুলির পিঠে থলি ভরিয়া দুইদিকে সমান ওজনের জিনিষ-পত্র দেওয়া হয়। ইহারা ১০।১২ সের হইতে ৩০ সের পর্য্যন্ত জিনিষ নিতে পারে। উপরে লাকড়ির অভাব, তাই প্রত্যেক ভেড়ার পিঠেই একখানি করিয়া লাকড়ি বাঁধিয়া দিয়াছে মেষপালের জন্য পথে চলা

দুষ্কর। একে ত ঐ রাস্তা, তার উপর আবার ভেড়া ও ছাগলের উৎপাত।

এতকষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দের ফল্গু-স্রোত সদাই বহিতেছিল তাহার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। আমাদের সঙ্গীয় লোকেরা সকলেই প্রায় গারবিয়ানের; বাড়ী পৌঁছাইতেছে এই আনন্দে ডাণ্ডিওয়ালারা আজ পথে পথে গান করিতে করিতে চলিয়াছে। আমাদেরও মনে হইত যেন আসিয়া পড়িয়াছি!

বেলা প্রায় ২॥ টায় গারবিয়ান্ পৌঁছাইয়া পূর্ব্বোক্ত স্কুলেই উঠিলাম। ধারচূলা হইতে কবে কুলিরা আসিবে ঠিক নাই; সে সব বন্দোবস্ত করিতে আমাদের ৪।৫ দিন এখানে থাকা হইবে, এইরূপ কথা হইতেছে। রান্না করিলাম, মা ও ভোলানাথ ভোগে বসিলেন। খিচুড়ী, ভাত, রুটী ও আলুর তরকারি হইয়াছে। এর মধ্যে কয়েকজন ভদ্রলোক, (মোরাদাবাদ বাড়ী), মার দর্শনে আসিলেন। পরে শুনিলাম একজন ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট, একজন ডাক্তার এবং একজন ধারচূলার জজ্ সাহেব প্রাণবল্লভ বাবু, যিনি আমাদের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং একজন পুলিশ ইন্স্পেক্টার।

ইহারা গারবিয়ান আসিতেছেন, আমরা পথেই খবর পাইয়াছিলাম। ইহাদের সঙ্গে আরও অনেক লোকজন আসিয়াছে, কুলিও বহু আসিয়াছে। ইঁহারাই এদিকে মালিক, কাজেই এদিকে একটা হৈ চৈ পাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের গাইড্ সেগুেল সিংয়ের সহিত তাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন; অনেকক্ষণ মায়ের কাছে বসিলেন। স্কুলঘরের উঠানের ভিতরেই ইহারা দুটী তাঁবু ফেলিলেন। সকলে ডাক বাংলায় রহিলেন। ইঁহারাই আমাদের কুলির এবং খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন,

কাজেই আমাদের খুবই সুবিধা হইয়া গেল। কুলি ইত্যাদি নিয়া আর কোন গণ্ডগোল করিতে হইল না।

আমরা আগামী কল্য কিম্বা পরশুই এখান হইতে রওনা হইতে পারিব স্থির হইল। বিশ্রামের জন্য আমরা একদিন থাকিয়া যাইতে চাহিলাম। মার কৃপায় কোনদিকেই কিছু অসুবিধা হয় নাই। এখানে আসিয়াই দেখি নানাস্থান হইতে সকলের চিঠি জমা হইয়া আছে; জ্যোতীষ দাদা পোষ্টঅফিস হইতে এক গাদা চিঠি নিয়া আসিলেন। সকলের খবর পাইলাম। আজ সন্ধ্যার কিছু পরেই সকলে শুইয়া পড়িলাম। পরে সময় হইবে না বলিয়া রাত্রিতেই সকলকে, মা গারবিয়ান আসিয়াছেন, এই খবর দিতে বসিব স্থির করিলাম।

৫ই শ্রাবণ, বুধবার—আজ আমরা এখানেই আছি, আগামী কল্য রওনা হইব। ডেপুটী বাবুরাই সব ঠিক করিয়া দিলেন; তাঁহারাও সদলবলে কৈলাস দর্শনে চলিয়াছেন। কৈলাসগিরি নামে একজন সাধু আসিয়াছেন; ইনিও কৈলাস চলিয়াছেন। শুনিলাম ইনি ১৫ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসরই কৈলাস যাইতেছেন। এতদিন পরে এখানে আসিয়া প্যেণ্ট, কোট, টুপী ছাড়িয়া কাপড় পরিয়া আমরা সকলেই আরাম বোধ করিলাম। আজ খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই একটু বিশ্রাম করিলেন। এখানে অনেকেই চাল, ডাল ও ঘি নিয়া মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, ইহাই এখানকার নিয়ম।

৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার—আজ খাওয়া দাওয়ার পর রওনা হইবার কথা, তাই আয়োজন হইতে লাগিল। আমরা বেলা প্রায় দশটায় রওনা হইলাম। ডেপুটী সাহেবের দলও কৈলাস রওনা হইলেন। তাঁহারা মাকে কিছু ফল ও আচার দিয়া গেলেন, আমরাও রাস্তার কিছু কিছু আবশ্যকীয় জিনিষ তাহাদিগকে দিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমাদের রওনা হইবার সময় সকলেই মার দর্শনে আসিল। মাকে প্রণাম করিয়া এবং আমাদের নিকট পুনঃ পুনঃ বিদায় চাহিয়া তাহারা বিদায় নিল। যাহারা আমাদের সঙ্গে গিয়াছিল তাহারাও সজল নয়নে বিদায় নিল। আমরা ডাণ্ডিতে, পর্ব্বত পথে চলিলাম।

আবার কালীগঙ্গা সশব্দে চলিয়াছেন তাহার গর্জ্জন ও চলিবার ভঙ্গী যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। স্রোতস্বিনী আনন্দে উন্মাদ নৃত্য করিতে করিতে সশব্দে চলিয়াছেন; প্রকাণ্ড এক একটা প্রস্তর তাহাতে বাধা পাইয়া যখন আরও বিপুল উচ্ছাসে সেই প্রস্তর, খণ্ডের উপর দিয়া অপূর্ব্ব তরঙ্গ ভঙ্গে বহিয়া চলিয়াছেন তখনকার সেই অবস্থা দেখিয়া আমার কেবলই মনে হইতেছিল যেন ভাগীরথী মহানন্দে তরঙ্গ তুলিয়া বিশ্বনাথকে স্নান করাইতেছেন।

উভয় দিকেই আকাশস্পর্শী পর্ব্বতমালা, পাদদেশে গঙ্গা প্রবাহিতা। আর আমরা সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথে অগ্রসর হইতেছি। পথের বর্ণনা করা দুষ্কর; এত সঙ্কীর্ণ পথ যে দুইজন পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারে না। তার মধ্যে একদিকে আকাশস্পর্শী গিরিমালা ও অপরদিকে যেন পাতালগামী সুবিশাল গহ্বর, সেই সুগভীর গহ্বরের তলদেশ দৃষ্টি সীমার বাহিরে, নীচে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া যায়। আর তাহারই তলদেশে খরস্রোতা নদী, বিপুল বেগে প্রবাহিতা। এক আঙ্গুল এদিক ওদিক হইলে কি অবস্থা হয় তাহা লেখাই বাহুল্য।

এ হেন রাস্তায় আমরা ডাণ্ডিতে, কখনও রাস্তা বেশী খারাপ হইলে, ডাণ্ডিওয়ালাদের সাহায্যে হাঁটিয়া চলিয়াছি। প্রত্যেক ডাণ্ডিতে ৬ জন লোক, ৪ জন ডাণ্ডী বহন করে, ২ জন সাহায্যের জন্য থাকে। যখনই আমাদের ডাণ্ডি হইতে নামিতে হয়, ডাণ্ডিওয়ালারা ছুটিয়া আসিয়া

সাহায্য করে, বড়ই যত্নে ইহারা ভয়ঙ্কর রাস্তাগুলি হাত ধরিয়া পার করিয়া দেয়। নিজেরা দাঁড়াইতে পারে না জায়গা এত সঙ্কীর্ণ তথাপি আমাদের অনায়াসে সাহায্য করিয়া পার করিয়া দিতেছে। অভ্যাসের এমনই প্রভাব, তখন মনে হয় ইহাদের মত আত্মীয় আর কেহ নাই।

ডাণ্ডিতে প্রায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতাম সকলেরই রাস্তায় একই অবস্থা, মুখ চোখের সশঙ্কিত ভাব, প্রতিক্ষণেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা। কখনও এই সঙ্কীর্ণ পথের উপর পাহাড়ের অংশ আসিয়া পড়িয়া পথ আরও বিপদ-সঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। বলিতে কি, অনেক স্থান এমন ভয়ঙ্কর যে পার হইবার সময় সভয়ে দুই চক্ষু বুজিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিয়াছি, প্রতিক্ষণেই পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা করিয়াছি কিন্তু অদ্ভুত পাহাড়ীদের অভ্যাস, যে পথে লোক পায় হাঁটিতেও ভয় পায় সে পথে তাহারা ডাণ্ডি নিয়া সচ্ছন্দে পার হইয়া আসিতেছে। আজ টুনু, দাসুদাদা, ব্রহ্মচারী ও কেশব সিং হাঁটিয়াই চলিয়াছে। কারণ ডাণ্ডি আর নাই ঘোড়া এই রাস্তায় চলিতে পারে না।

আমরা বৈকালে মালপা পৌছিলাম, সেখানে আজ অনেক লোক; একটা ঘর আছে, সেখানে ঢুকিতেও ঘৃণা হয়, (ইহাই ধর্ম্মশালা)। তাহাও একটী লোক আগলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার নাকি ১৯।২০ জন লোক আসিতেছে। তাহারা আসিয়া পৌছায় নাই। আমরা অনন্যোপায় হইয়া তাহার কথা না শুনিয়া ঐ ঘরই দখল করিয়া বসিলাম, অবশ্য বৃষ্টি হইলে সেই ঘরে ভিজিতে হইবে জানিতাম কিন্তু অন্য উপায় নাই। বাহিরে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত হইল।

জ্যোতীষ দাদার একটু একটু জ্বর হইতেছে; দুর্ব্বলতা খুব বাড়িয়াছে; নিরুপায়। ইহা নিয়াই চলিতে হইতেছে। আগামীকল্য ভোরে রওনা হইব স্থির হইল কারণ এখানে কুলিদের খাবার কিছুই

পাওয়া যাইবে না। আর বিশেষতঃ আগামীকল্যের রাস্তা খুব খারাপ, তাই রৌদ্র না উঠিতেই বাহির হওয়া স্থির হইল।

রাত্রিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, তখন ঘরে অনেক স্থানেই বেশ জল পড়িতে আরম্ভ হইল। আমরা কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইলাম। একে ত ঘর অপরিষ্কার, তাতে আবার ভিজা, কোনপ্রকারে একটু পরিষ্কার করিয়া লতাপাতা বিছাইয়া আমরা বিছানা করিয়াছিলাম, তার মধ্যে বৃষ্টি; অবস্থা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না তবে আমাদেরও এমন স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে এর মধ্যেই ওয়াটারপ্রুফ্‌এর কোট মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার—খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। বৃষ্টি নাই। আমরা সব গুছাইয়া রওনা হইতে হইতে একটু বেলা হইল, তবে রৌদ্র উঠিবার পূর্ব্বেই রওনা হইলাম। আজিকার পথই বোধহয় কৈলাসের পথের সবচেয়ে খারাপ রাস্তা। অনেক সময়ই হাঁটিতে হইল। রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, পথ ফুরায় না।

জ্যোতাষদাদা হাঁটিতে অক্ষম হইলেন, কাজেই একটা লোক তাঁহাকে পিঠে করিয়া লইল। আমরা মধ্যে মধ্যে একটু ভাল স্থান দেখিয়া (তাহাও বিপজ্জনক) ডাণ্ডিতে উঠিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া নেই। আবার ডাণ্ডিওয়ালারা রাস্তা খারাপ বলিয়া নামাইয়া দেয়। মার সঙ্গে আমরা সকলেই শ্রান্ত, অথচ উপায় নাই, হাঁটিতেই হইবে। কুলিরা পিঠে নিতে চাহিয়াছিল কিন্তু মা ও আমি রাজি হই নাই।

কৈলাসের পথে রওনা হইবার সময় আলমোড়ায় নরেন বাবুর স্ত্রী যূথিকা দেবী, জটা হইবার ভয়ে মার চুলে তেল দিয়া দুইটি বেণী বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আমিও সেইরূপ বেণী করিয়া রাখিয়াছিলাম। কৈলাস যাইবার পথে গাররিবান আসিয়া মা

বেণী খুলিয়া ফেলিলেন, অভ্যাস নাই রাখিতে পারেন না। এখন মা আবার "আলুলায়িত-কুন্তলা"। আলুলায়িত কেশ, হস্তে যষ্টি, বদন-কমল পরিশ্রমে রক্তাভ, শ্রীচরণে পাদুকা,—মা যখন পাহাড়ের পথে চলিতে-ছিলেন তখন এই যেন তাঁর আরেক নবীন মূর্ত্তি!

আমরা পাহাড় ভাঙ্গিয়া চলিয়াছি। পর্ব্বতের গায়ে বহু ঝরণা ভয়ঙ্কর শব্দে নীচে নামিতেছে। পথের মধ্যে মধ্যে আমাদের সেইসব ঝরণা পার হইতে হইতেছে। তখন ছাতি মাথায় দিয়া চলিলেও একেবারে ভিজাইয়া দিতেছে। উঁচু হইতে জলরাশি এত প্রবল বেগে পড়িতেছে যে সেই স্থানটার চারিদিক জলবিন্দুতে সাদা ধোঁয়ার মত হইয়া গিয়াছে।

কত অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি আনন্দ উপভোগ করিবার মত অবস্থা সব সময় থাকে না। বিশেষতঃ আজিকার রাস্তা। কৈলাসের নিকটবর্ত্তী স্থানের পর্ব্বতগুলি গাছপালা শূণ্য কোন কোনটি এমন সুন্দর, যেন কোন রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ। আর এদিকে পর্ব্বত, সব জঙ্গলে আবৃত সবুজ-শ্যামল! এই আর এক রূপ! এখন বর্ষাকাল, কাজেই জঙ্গলও খুব বেশী হইয়াছে।

যাক্, আমরা অতি কষ্টে বেলা প্রায় দুইটায় দিপ্তীতে পৌছিলাম। এখানে, উপরে একটা ঘর পাওয়া গেল; ঘরখানা মন্দ নয়। খাওয়া দাওয়া করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল; খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই অবসন্ন ভাবে শুইয়া পড়িলেন। আগামী কল্যের পথেও ভয়ানক "চড়াই" তবে রাস্তা এত খারাপ নয়।

মা আজ এখানে আসিতেই একজন লোক, (যাইবার সময় দেখিয়াছি) কিছু সরিষা শাক, দুটী কাঁচা মূলা, একটী কাঁচা কুমড়া ও একটু দুধ দিয়া গেল। এই সব তরকারি আমাদের কাছে আজ কতই নূতন

লাগিল। আজ ভোলানাথ নিজেই সখ করিয়া ভাল পাক করিলেন, আমি তরকারি পাক করিলাম, শাক করিলাম। এতদিন পর সকলেই পরম পরিতোষের সহিত আহার করিলেন। এখানে একখানা দোকান আছে।

৮-ই শ্রাবণ, শনিবার—খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হওয়া স্থির হইল। আলু, কুমড়া, ভাঁটা পাওয়া গেল। খিচুড়ী, রুটী, শাক, তরকারী সবই করা হইল। তৈলও পাওয়া যাইতেছে, কাজেই এখন আর কোন অসুবিধা নাই। দুধও অল্প পাওয়া গেল।

আহারের পর আমরা রওনা হইলাম। পথ প্রায় ৩ মাইল চড়াই, তবে আজ আর আমাদের হাঁটিতে হইল না। পথ খারাপ নয়। ডাণ্ডিতেই চলিলাম। ভাঁটার ক্ষেত বিস্তর আছে। এখানে ঐ ক্ষেতকে 'চুয়া' বলে। খুব বড় ভাঁটা হইয়াছে।

একটা কথা যথাস্থানে লিখিতে ভুল হইয়াছিল, এখানে উল্লেখ করিতেছি—মা অনেকটা শুকাইয়াছেন। গারবিয়ান্ যখন পৌঁছিলাম তখন সকলেরই রং ময়লা হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ সকলেরই নাকটি বেশী কালো। আর পাথরের রাস্তায় চলিয়া সব ঘোড়াগুলিই কিছু কিছু খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। একটা ছোকরা সহিস তাই রাস্তায় রাস্তায় হাসিয়া হাসিয়া বলিত, কৈলাস পতির প্রসাদ হইল —

"আদমি কালো,
ঘোড়া ল্যাংড়া"

গারবিয়ানের পর হইতে ধীরে ধীরে সকলেরই রং ফিরিতেছে।

এখন আবার গরম বোধ হইতেছে, যদিও রাত্রিতে এখনও কম্বলই গায় দিতেছি। রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছে। আজ ২।৩ দিন, চলিবার পথে বৃষ্টি পাইতেছি না, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। যে রাস্তা, বৃষ্টি হইলে, সোনায় সোহাগা হইত।

ভোলানাথ টুন্নুর ডাণ্ডিতেই আসিতেছিলেন, আজ অনেকটা হাঁটিলেন। টুন্নু আজ অনেকটা ডাণ্ডিতে আসিল। ডাণ্ডি পথে পথে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সংখ্যায় কমিয়া গিয়াছে।

এখন আর কালীগঙ্গার শব্দ পাইতেছি না, তিনি দূরে সরিয়া গিয়াছেন। শুনিলাম এই কালীগঙ্গাই অযোধ্যায় সরযূ এবং অন্যান্য স্থানে নানা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। বরফের পাহাড়, কাল হইতে আর দেখা যায় নাই, আজ ত একেবারেই নাই। আজও ১০ মাইল চলিয়া "শশায়" বিশ্রাম করিতে হইবে।

৩।৪ মাইল বাকী থাকিতেই রুমাদেবী রাস্তায় মার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, আজ ৩।৪ দিন যাবৎ তোমার দর্শনের আশায় এখানে বসিয়া আছি, আশ্রমে যাই নাই।" সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম, রুমাদেবীও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। আমরা "শশাতে" পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রুমা দেবী থাকিবার ঘর ঠিক করিয়া চাটাই বিছাইয়া রাখিয়াছেন। আমরা আসামাত্র গৃহস্থদের ঘর হইতে দুধ, আটা, ঘি, আলু সব আনিয়া দিলেন।

সেবাই ইহার জীবনের ব্রত। এই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীর সেবার আগ্রহ দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। মাকে বলিতে লাগিলেন, 'মা, আমি দিন গুণিয়া গুণিয়া আজ ৩ দিন যাবৎ তোমার জন্য এই রাস্তায় ঘুরিতেছি। আজ পথে একটা পাথরের উপর পড়িয়া ছিলাম; ভয় হইত তুমি পাছে চলিয়া যাও, আমি না দেখিতে পাই। আশ্রমে অনেক লোক আসিয়াছে, অনেক কাজ, কিন্তু আমি যাই নাই, তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমি ৭ দিন মাত্র আলমোড়া হইতে আসিয়াছি।" পাহাড় হইতে ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া মার পায়ে দিলেন। মার প্রতি বৃদ্ধার এতটা প্রেম দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়! রাত্রে রুমা

দেবীর সেবায় সকলেই খাওয়া দাওয়া করিয়া বিশ্রাম করিলেন।

গৃহস্থেরা সন্ধ্যা বেলা আসিয়া ঘর খানি ভরিয়া ফেলিল। মার পেটে একটা মৃদু বেদনা চলিতেছে, তাই দুপুরে বিশেষ কিছুই খান নাই, এখনও কিছুই খাইলেন না। জ্যোতিষ দাদারও জ্বর, তাই আমরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম, নতুবা বিশেষ কোন অসুবিধা ছিল না। কল্য আহারের পর "খেলায়" রওনা হইবার কথা, আজ ১০টায় রওনা হইয়াছি। প্রায় ১১।১২ মাইল আসিয়াছি। পথে 'শিরখা' গ্রাম ফেলিয়া আসিলাম। অনেক রাত্রিতে আমি শুইতে চলিলাম।

৯ই শ্রাবণ, রবিবার—জ্যোতিষ দাদা অসুস্থ। আহারের পর রওনা হইলাম, ৭ মাইল দুর "খেলায়" যাইব। কুলিদের চুক্তি "খেলা" পর্য্যন্ত, তাহারা খেলায় বিদায় হইবে।

রমাদেবী আমাদের সঙ্গেই চলিলেন। তিনি মার শরণে থাকিবেন জানাইলেন, এখন আর নিজের আশ্রমে ফিরিয়া যাইবেন না। বলিলেন, "আমি সেবা-ব্রতই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ স্থির-করিয়াছিলাম, এখন বৃদ্ধ হইয়া দেখিতেছি এ কাজের শেষ নাই। এখন আর ভাল লাগে না। এখন একটু নীরবে মার কাছে থাকিয়া নিজের কাজ করিতে চাই।" তাই তিনি আমাদের সঙ্গে চলিলেন।

এখানে আসিয়া দেশী গোলাপ ও চামেলী ফুল দেখিলাম; দাসু দাদা তুলিয়া মার চরণে দিলেন। এই এতদিন পর দেশী ফুল দেখা গেল। আজ প্রাতঃকাল হইতেই দর্শণার্থী গ্রাম্য স্ত্রী, পুরুষেরা সব মার নিকট আসিতেছেন। কেহ ঘরের গরুর দুধটুকুই মার জন্য আনিয়াছে। ফুলে ফুলে মার বিছানা ভরিয়া গেল। আসিবার সময় অনেক স্ত্রীলোক

ফুল ও মিশ্রী আনিয়া মাকে দিল, আমি আবার তাহাদের বিলাইয়া দিলাম।

একটী স্ত্রীলোক বিশেষ ভাবে মাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কি ভাবে কাজ করিতে হইবে, মার উপদেশ চাহিল। ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিল। রুমাদেবীর প্রতিষ্ঠিত "সারদা আশ্রম" এখন হইতে মাত্র ১॥ মাইল দূর। এ'গ্রামে কেহ কেহ রুমাদেবীকে শ্রদ্ধা করে। গারবিয়ানের পোষ্টমাষ্টার, 'খেলায়' পোষ্ট মাষ্টারকে মার সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য, চিঠি দিয়াছেন।

আমরা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে 'খেলায়' পৌছিলাম। রাস্তায় আজ কিছু কিছু বৃষ্টি পাইলাম। পোষ্ট মাষ্টারের লোক মার সংবাদের জন্য রাস্তায় বসিয়া আছে। আমরা 'খেলায়' এক দোকানে আশ্রয় নিলাম। পাটোয়ারী, পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতি সকলেই আসিয়া আমাদের খবরা-খবর নিয়া গেলেন। জ্যোতিষ দাদার জ্বর বিশেষ নাই, তবে খুব দুর্ব্বলতা, তাই আগামী কল্য আমাদের এখানেই মোকাম করা, অর্থাৎ থাকা স্থির হইয়াছে। কুলিদের বাড়ী এদিকেই, তাহারা সব আজই বিদায় হইল। কাল আলমোড়া-গামী কুলীর দল ঠিক করা হইবে। বৃষ্টি চলিতেছে; পার্ব্বতী দেবী আমাদের সঙ্গেই আছেন। তিনি চাকুরী উপলক্ষ্যে নৈনীতাল যাইতেছেন।

১০ই শ্রাবণ, সোমবার—আজ 'খেলাতেই' আছি। পোষ্ট মাষ্টার বাবু আজ আমাদের আলমোড়া নিয়া যাইবার জন্য সকল কুলী ঠিক করিয়া দিলেন। তিনি মাকে কয়েকটী পাকা আম, কলা ও ঘরের দুধ দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। জ্যোতিষ দাদার জ্বর এখনও ঈষৎ চলিতেছে, তিনি খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এই একটু অসুবিধা ছাড়া আর কোনই অসুবিধা নাই। তরকারি প্রায় সবই পাওয়া যাইতেছে। ছোট

ছোট পাহাড়ী ছেলেরা বেগুন, কুমড়া, কাঁচাকলা, শাক ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসিতেছে। আজ মটরের ডালও পাওয়া গিয়াছে। কচুর শাক্ ইত্যাদি প্রায় দেশের মতই পাক হইল। আলমোড়া প্রায় ৮।৯ দিনের পথ। মার শরীর বিশেষ ভাল নয়। কাল ধারচুলা রওনা হইব স্থির হইল।

১৯ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার—সকলেই রওনা হইলাম। 'ধারচুলার' দুই মাইল পূর্ব্বে 'তপোবনে' ডিষ্ট্রিকবোর্ডের ডাক্তারখানায় পৌছিলাম।

জ্যোতিষ রায় মহাশয়ের অসুস্থতায় সকলের উদ্বেগ।

জ্যোতিষদাদার জ্বর খুব বাড়িয়াছে, একবার ডাক্তার দেখাইয়া নিয়া যাওয়া হইবে। অল্প বয়স্ক এক ডাক্তার পরিবার নিয়া আছেন। জ্যোতিষদাদাকে দেখান হইল। জ্বর খুব বেশী, ১০৪ ডিগ্রি। আমরা কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া ঔষধ লইয়া ধারচুলা রওনা হইলাম, কারণ ধারচুলার ডাকবাংলা খানা খোলা জায়গায়। তথায় জ্যোতিষ দাদা একটু আরামে থাকিবেন।

বেলা প্রায় ২ টায় আমরা ডাকবাংলায় পৌছিলাম। ডাক-বাংলার চৌকীদার আসিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিল। ডাক্তার রোজ আসিয়া দেখিবেন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আজও ঔষধ পত্রাদি আনা হইল। এখানে অনেক গৃহস্থের বাস, জিনিষ পত্রও অনেক পাওয়া যায়। কোনই অসুবিধা নাই, ভাল দুধও পাওয়া যায়। আমাদের এখানে কয়েকদিন অপেক্ষা করার কথা হইতেছে, কারণ রাস্তার কষ্টেই জ্বরটা ছাড়িতেছে না।

মা পৌছিলেই স্থানীয় গৃহস্থেরা, আম, ও ফুল নিয়া দর্শনে আসিল, ঘরের দুধও মাকে পাঠাইয়া দিল। এই ভাবেই আজ এখানে রাত্রি কাটান হইল।

কালীগঙ্গার আবার সেই গম্ভীর একতালের গান, চারিদিকে পর্ব্বতমালা। নীরব নির্জ্জন স্থানে এই বাংলাখানি বড়ই মনোরম। দূরে পাহাড়ের গায়ে বৃক্ষলতা বাড়ী ঘর দেখা যায়। সবই যেন সুপ্ত হইয়া কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভাগিরথীর এই একতানের গান শুনিতেছে! এই একঘেয়ে গান শুনিতে শুনিতে ইহাদের কিন্তু বিরক্তির লেশ নাই, বরং মুগ্ধ, আনন্দে ভরপুর। তাইত যে ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই আনন্দ পাইতেছে! বর্ষাকাল, তাই চারিদিকে একটু জঙ্গল বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

কাল সারারাত বৃষ্টি গিয়াছে, কাজেই বাতাসটা ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়। রাত্রিতে জ্যোতিষ দাদার জ্বরটা একটু কমিল। আমার শুইতে শুইতে অনেক রাত হইয়া গেল।

১২ই শ্রাবণ, বুধবার—আজ প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। জ্বর আজ ৯৯॥ ডিগ্রীতে নামিয়াছে। অনেকটা ভাল। আমাদের আজ এখানে থাকা স্থির হইল। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া সকলেই বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। আমি আজও খোলা বারাণ্ডায় একা একা বসিয়া লিখিতেছি। আমার সময় খুবই কম, কাজেই সব বিষয়েই সংক্ষেপে লিখিতে হইয়াছে। শুধু ঘটনাটা মাত্র লিখিয়া রাখা হইয়াছে।

রুমা দেবী ও পার্ব্বতী দেবী সকলেই সঙ্গে আছেন। আজ বিকালে খবর পাওয়া গেল, কাল রাত্রির বৃষ্টিতে পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাজেই কাল আমাদের যাওয়া হইবে না। কাল পুল মেরামত হইবে—আগামী পরশু রওনা হওয়া স্থির হইল। আজ আর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা নাই। এখানে একটা মিশন (মিশনারীদের) আছে। সেখান হইতে ৩।৪ জন স্ত্রীলোক ফল ও ফুল নিয়া মার দর্শনে আসিয়াছেন।

১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—আজও আমরা এখানেই আছি। আগামী কল্য বাহির হইবার কথা। রাত্রি হইলেই খুব বৃষ্টি হইতেছে। শুনিলাম শীঘ্র পুল মেরামত হইবার উপায় নাই। কাল কি ভাবে সেই রাস্তা পার হওয়া যাইবে এখনও ঠিক জানা যায় নাই।

ধারচুলায় অবস্থান।

১৪ই শ্রাবণ, শুক্রবার—আজও আমাদের যাওয়া হইল না। পাহাড়ীরা রশি বাঁধিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নদী পার হয়। অপর পার হইতে তাহাদিগকে টানিয়া লওয়া হয়। পারের বন্দোবস্ত সেইভাবেই করা হইয়াছে। জ্যোতিষ দাদাকে এইভাবে পার করা অসম্ভব বলিয়া আমরা যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। বৃষ্টিও চলিতেছে। মধ্য পথে আমরা বড়ই ঠেকিয়া পড়িলাম। অন্য কোন উপায় নাই। আজিকার দিনও এইভাবে কাটিয়া গেল।

১৫ই শ্রাবণ, শনিবার—আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করা হইল, রওনা হইতে হইবে, কিন্তু তারপর আবার পরামর্শ করিয়া যাওয়া বন্ধ করা হইল। কল্য ভোরে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় 'বালুরকোট' পৌছাইয়া দিবে স্থির হইল। এত দেরী হওয়ার কারণ রশি দিয়া টানাটানি করিয়া নদী পার হইতে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা সময় লাগিবে। জ্যোতিষ দাদার অবস্থা একরূপই চলিতেছে স্বামীজীরও ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরটা খারাপ হইয়াছে। বেশী দিন দেরী হইলে সঙ্গের রোগীর পথ্যও ফুরাইয়া যাইবে; তারপর আর কিছু পাওয়ারও উপায় নাই। সকলেরই এইবার চিন্তা হইতেছে, নানা পরামর্শে আজও এখানেই থাকা স্থির হইয়া গেল। কুলিরা থাকিতে চায় না, ভয়ানক ব্যস্ত। তাহাদের শান্ত করিয়া রাখা এক কঠিন ব্যাপার। কতগুলি কুলি রাগ করিয়া চলিয়া

গেল। এক ভরসা, এখানে কুলি পাওয়া যায়। ডাকবাংলার চৌকিদারটা কুলি ঠিক করিয়া দিবে বলিয়া ভরসা দিতেছে।

১৬ই শ্রাবণ, রবিবার—আজ প্রাতে আমরা যথাসম্ভব, পারের খবরাখবর লইয়া রওনা হইলাম। ৫ মাইল দূরে কালী নদী পার হইতে হইবে। এখন আর রাস্তা খারাপ নয়। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর ধারে পৌঁছিলাম। অনেক বিবেচনার পর আমরা রশি দিয়াই নদী পার হইলাম। রশি দিয়া পার হওয়ার অর্থ, খুব মোটা রশি এবার ওপার বাঁধা হইয়াছে, তার মধ্যে একটা কাঠ ও বাঁশ দিয়া বসিবার চৌকীর মত করা হইয়াছে। উহার সহিত রশির যোগ আছে। চৌকীটার ভিতর বসিলে রশি টানিয়া নদী পার করে।

রশি ধরিয়া নদী পার।

নদী খুব প্রশস্ত বা গভীর নয়, কিন্তু খরস্রোতা। স্রোতের বেগে কেহ দাঁড়াইতে পারে না। আমরা আজ এক নূতন রকমের উপায়ে রাস্তা পার হইব ভাবিলাম। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতাম পাহাড়ীরা রশি ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে নদী পার হয়। দেখিয়াই ভয় লাগিত। ধারচূলা হইতেই এই রশি দিয়া পার হইতে হইবে বলিয়া আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম। শেষে স্থির হইল, আমাদের ৪০ জন কুলী স্রোতের বেগ যেখানে কম সেখানে দাঁড়াইবে, পরে ডাণ্ডির মধ্যে করিয়াই পার করিবে। কিন্তু নদীতীরে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া সেই রশি দিয়াই পার হইতে হইল। বৃষ্টি কম হইলে জল আরও কমিয়া যায়।

আমরা আজ বৈকালে 'বালুয়াকোঁট' পৌঁছিলাম। ধারচূলা হইতেই তাঁবু আনা হইয়াছিল। একটা সমতল স্থানে তাঁবু ফেলিয়া রাত্রি-বাসের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। বাহিরে পাথর ফেলিয়া ডাল ভাত রান্না হইল। সেখানেই খোলা আকাশের নীচে বসিয়া সকলের

আহার হইল। জ্যোতিষ দাদার জ্বরটা কালই ছাড়িয়া গিয়াছে। একটু ভাল আছেন। এই স্থানটার একদিকে ঘন জঙ্গল। কালীগঙ্গা বেশী দূরে নন, তাঁর গর্জ্জন খুবই শুনা যাইতেছে। এইভাবে আজ রাত্রি এখানেই কাটিয়া গেল।

১৭ই শ্রাবণ, সোমবার—আজ সকালেই আমরা 'আস্‌কোট' রওনা হইলাম। 'ধারচুলা' হইতে 'বালুয়াকোট' দশ এগারো মাইল। 'বালুয়াকোট' হইতে 'আস্কোট' প্রায় দশ এগারো মাইল। কুলীরা সাধারণতঃ প্রতিদিনে দশ এগারো মাইল করিয়াই চলে।

জ্যোতিষ দাদা ভাত খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ভোরে মা জ্যোতীষ-দাদাকে সামান্য ভাত পথ্য করাইয়া রওনা করাইলেন। আমরা আস্কোট পৌছিয়া খাওয়া দাওয়া করিব। বেলা ২টায় আমরা আস্কোট পৌছিয় ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। জ্যোতিষ দাদা রৌদ্রে ভয়ানক অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাকে নিয়া মা ও আমরা ব্যস্ত। সন্ধ্যায় রাজবাড়ীর সকলে মার দর্শনে আসিলেন। খাবার জিনিষ পত্র রাজবাড়ী হইতে আসিল। রাজা কাল মার নিকট আসিবেন। সারাদিনের পর অনেক রাত্রিতে আমাদের খাওয়া দাওয়া হইল। আজ মা কয়দিন যাবতই চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্র খাইতেছেন। একদিন সুজির রুটি ও তরকারী, এক-দিন ভাত, আটার রুটি, ডাল যা' হয় এই সবই একটু খান। এই ভাবেই এখন মার খাওয়া চলিতেছে। আজ রাত্রে ধর্ম্মশালাতেই কাটিয়া গেল।

১৮ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার—সকালে রওনা হইতে বেলা প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। খাওয়া দাওয়া কাহারও হইল না মাকে রাজবাড়ীতে নিবার জন্য খবর পাঠাইয়াছিল। রওনা হইয়াও মা রাস্তা হইতে রাজবাড়ী গেলেন। সেখানে নানারকম খাবার তৈয়ারী করিয়া মাকে ভোগ দিল। তারপর আমরা চলিলাম। একটু রাস্তা চলিতেই স্বামিজীর ডাণ্ডি

ভাঙ্গিয়া গেল। টুনুদাদা, দাশুদাদা, পার্ব্বতী, রুমাদেবী ঘোড়ায় চড়িয়াছেন। ডাণ্ডি একটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে টুনু হাঁটিয়া চলিল। স্বামিজী ও ভোলানাথ ডাণ্ডি জোগাড় করিতে আস্কোটে ফিরিয়া গেলেন। আমরা অগ্রসর হইলাম, পথে তাঁহারা আমাদের ধরিলেন ; এ' পথে রোগী লইয়া চলা বড়ই মুস্কিল! সাত মাইল চলিয়া আমরা 'ডিডিহাট' স্কুলে উঠিলাম। শিক্ষক ও ছাত্রদল ছুটিয়া আসিয়া মার ডাণ্ডি ঘিরিয়া ফেলিল এবং অতি যত্নের সহিত মাকে স্কুলে উঠাইয়া লইল। আহার ও রাত্রিবাসের জন্য এখানেই অপেক্ষা করিব স্থির হইল। ফরেষ্ট রেঞ্জার সাহেব নৈনিতাল হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি মার দর্শনে আসিয়া কিছু ফল দিয়া মার চরণ বন্দনা করিলেন। মাকে ধূপ দিয়া আরতি করিলেন, বলিলেন, "অনেকদিন যাবত মার দর্শনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ আমি ধন্য হইলাম। আমাকে পথ দেখাইয়া দিল।" এই বলিয়া অনেক কিছু বলিতে লাগিলেন। মাও কিছু কিছু উপদেশ-বাক্য বলিলেন। তিনি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। একবার চলার পথে তা'র বাংলায় যাইবার জন্য মাকে প্রার্থনা জানাইয়া গেলেন। আমাদের খাওয়া দাওয়া হইতে আজও রাত্রি হইয়া গেল। আজ রৌদ্র ছিল না, তাই রোগীকে নিয়া অনেক আরামে আসা গিয়াছে। শিক্ষকেরা নিজেদের থাকিবার ঘর মার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। স্কুলঘরেই ছাত্র ও শিক্ষকেরা থাকেন।

১৯শে শ্রাবণ, রবিবার—ভোরে দশ মাইল দূরস্থ 'থল' নামক স্থানে রওনা হইলাম। রেঞ্জার সাহেব মার সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য সঙ্গে চলিলেন। অনেকেই উপদেশ শুনিবার জন্য সকালে মার কাছে আসিলেন। আমরা জ্যোতিষ দাদাকে যথাসম্ভব সাবধানে নিয়া রওনা হইলাম ও বেলা প্রায় দুইটায় 'থল' স্কুলঘরের বারান্দায় রাত্রি-

বাসের জন্য স্থান করিয়া লইলাম। পথের কষ্টে রোগী খুবই কাতর কিন্তু কোনই উপায় নাই। তাই চলিতে হইতেছে। পথে একটু বৃষ্টি হইল, বিশেষ কিছু অসুবিধা হইল না। খাওয়া দাওয়ার পর বৈকালে খুব বৃষ্টি আসিল। পিশু পোকার যন্ত্রণায় আমরা অস্থির। কাল রাত্রিতে কাহারও ঘুম হয় নাই। আজও অবস্থা প্রায় সেই রকমই। সকলেরই শরীর ব্রণময় হইয়া গেল। এই ভাবেই আজ রাত্রিও কাটিয়া গেল।

২০শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—বৈকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা, তাই সকালেই চলিতে হইতেছে। যদিও সকালে চলিয়া খাওয়া দাওয়া করিতে করিতে রোজই প্রায় রাত্রি হইয়া যাইতেছে। সকালেই যাওয়া স্থির ছিল, কিন্তু বৃষ্টি হওয়াতে যাওয়া হইল না। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করিয় বেলা প্রায় ১১টায় আমরা রওনা হইলাম। রাস্তায় বেলা প্রায় তিনটায় খুব বৃষ্টি পাইলাম। দশ মাইল দূরবর্ত্তী 'বেণীনাগ' চলিয়াছি। থলে দোকান, ডাকখানা সবই ছিল, কিন্তু বেণীনাগে ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে। দোকান ও বেশ দু'চার খানা ঘর আছে। অনেক জিনিবই পাওয়া যাইবে।

আমরা বৈকালে বেণীনাগ পৌছিলাম এবং স্কুলে স্থান নিলাম। মা আসাতে তাড়াতাড়ি স্কুল ছুটি দিয়া ঘর খালি করিয়া দিল। শিক্ষক মহাশয় অসিয়া বলিলেন, "মা, যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকুন। আমি অন্যত্র স্কুল করিব।" ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল। তিনি আসিয়া রোগী দেখিলেন। ঔষধ পথ্যাদিও পাওয়া গেল। জর আজ কিছু কম, রাস্তার কষ্টেই রোগী অস্থির। বৃষ্টি চলিতেছে, একটা বালিশ তৈয়ার করিতে গেলাম। শুনিলাম, এখানে তুলার বালিশ হয় না। কাপড় ভিতরে দিয়াই বালিশ তৈয়ার করে। তা'ই একটা করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। রাত্রি এখানেই কাটিল।

২১শে শ্রাবণ, শুক্রবার—সকালবেলা বৃষ্টি চলিতেছে, রওনা হওয়া হইল না। বার মাইল চলিয়া 'গনই' নামক স্থানে পৌছিবার কথা ছিল কিন্তু রোগী বড়ই দুর্ব্বল, তাই আজ যাত্রা বন্ধ রহিল। আমরা অতি ধীরে ধীরে চলিয়াছি, কবে যে পৌছিব ঠিক নাই। এদিকে কুলী-দের বসাইয়া রাখাও দায়। তাই দাসুদাদা, ব্রহ্মচারী, টুনু প্রভৃতি, কয়েকজন কুলীসহ কিছু মাল লইয়া আলমোড়া রওনা হইয়া গেলেন। আমরা স্কুলেই রহিয়া গেলাম। মার দেরাদুনের এক ভক্ত এদিকে নিজের জমি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খোঁজ করিয়া আসিয়া মাকে দর্শন করিলেন। আজ তিনিই আহারাদির সব বন্দোবস্ত করিলেন এখানে লাকড়ীর অভাব, রান্নারও জায়গা নাই। তবে তিনি একটা স্থানে রান্নার ব্যবস্থা করিলেন। সকলের খাওয়া দাওয়া হইল। আমি ষ্টোভে ভাত করিয়া নিলাম। এখানেও অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিল।

২২শে শ্রাবণ, শনিবার—প্রাতে রওনা হইলাম। আমি ও ভোলানাথ ঘোড়ায়; আমাদের ডাণ্ডি টুনু ও দাসুর সঙ্গে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। রাস্তায় ভয়ানক বৃষ্টি, খুব ভিজিলাম, ডাণ্ডিতে বসিয়া মা ও স্বামিজী খুব ভিজিলেন। শুধু রোগীর ডাণ্ডি অনেক যত্নে ঠিকভাবে আনা হইল। বেলা প্রায় ২॥টায় বার মাইল দূরবর্ত্তী 'গনই'এর ডাক বাংলায় পৌছিলাম।

কাহারও জলটুকুও খাওয়া হয় নাই। সকলে ভিজিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছেন। স্বামিজীও খালি গায়ে ভিজা কাপড় পরিয়া বসিয়া রহিলেন। মোট-বহা কুলী বহু পরে পৌছে। কাজেই ছাড়িবার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। স্বামিজীরও শরীর খুব খারাপ, কিন্তু উপায় কি? নীচে একটা দোকানে চাদর পাওয়া গেল। তখনই দুই খানা কিনিয়া মা ও স্বামিজীকে দিলাম। স্বামিজী তাহাই জড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু মা আর কিছু নিলেন না।

ভিজা কাপড়ই গায় শুখাইলেন। অনবরত বৃষ্টি চলিতেছে, রাত্রিতেও ভয়ানক বৃষ্টি। অনেক রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া হইল। রোগীর একই অবস্থা।

১৩শে শ্রাবণ, রবিবার—সকালেই রোগীকে পথ্য করাইয়া রওনা হইলাম। ১২ মাইল চলিয়া 'কেনেরা' পৌছিতে হইবে। সেখানেও ফরেষ্ট বাংলা আছে। আজও একটু একটু বৃষ্টি পাইলাম, তারপর আবার রৌদ্রে পোড়াইতেছে! অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, ডাণ্ডি দেখা যায় না। তাই রাস্তায়, ডাণ্ডির জন্য অপেক্ষা করিব ভাবিয়া একটা ছায়া-শীতল স্থানে বসিয়া পড়িলাম।

মার মৌন অবস্থা। জ্যোতিষ রায় মহাশয়ের অসুখে, জননীর সন্তানের অসুখে যে স্বাভাবিক ভাব মা সেই মূর্ত্তিই ধরিয়াছেন।

সম্মুখে কালীগঙ্গা চলিয়াছেন, তীরে বসিয়া লিখিতে লাগিলাম। মা একবারই যাহা হয় খান, জল ছাড়া আর কিছুই খান না। ধারচুলা পৌছিবার পরদিন হইতেই আজ প্রায় ৮।১০ দিন যাবত এ'রূপ খাওয়া চলিতেছে। তারপরে আজ প্রায় ৪।৫ দিন যাবত বস্ত্র পরিবর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়াছেন। যে জামা কাপড় পরা আছে তাহাই পরিয়া আছেন। বেণীনাগ আসিবার দিন খুব ভিজিলাম, তথায় পৌছিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িতে বলিলাম, ছাড়িলেন না; অবশ্য আমাদের কাহারও সঙ্গে দুই খানা ছাড়া আর বস্ত্র নাই। তাই মার জন্য এক জোড়া কাপড় কিনিয়া লইলাম। কিন্তু মা ঐ ব্যবহৃত বস্ত্র আর ছাড়িতেছেন না, জামাও একটা চলিয়াছে—বলিলেও ছাড়িতেছেন না।

আজ গণই হইতে রওনা হইবার সময় জ্যোতিষ দাদার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পরে তাঁহাকে রওনা করিয়া দিয়া ডাণ্ডিতে আসিয়া বসিলেন। আর কথা বলিলেন না। তখন ইহা বিশেষ লক্ষ্য

কার নাই। কিছুদূর আসিয়া কুলীরা বিশ্রাম করিতেছিল। মা জ্যোতিষ দাদার ডাণ্ডির কাছে আসিয়া তাঁর বিছানা প্রভৃতি ঠিক করাইতেছিলেন। তখনই স্বামিজী লক্ষ্য করিলেন, যে মা কথা বলেন না। আমরা ঘোড়ায় তথায় আসিয়া পৌঁছিতেই তিনি এই খবর দিলেন। কথা না বলিলে মা ইসারাও করেন না। বহুদিন পর মার কথা বন্ধ হইল। আমার মহা মুস্কিল হইল। রোগীর পথ্যাদি সব মার কথামতই দেওয়া হইতেছে। রোগীর সমস্ত শুশ্রূষা ও ব্যবস্থা মা নিজে করাইতেছেন। দিনরাত রোগীর শিয়রে নিজের কম্বলের বিছানাটুকুতে বসিয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে একটু শুইয়া পড়েন। ঐ এক স্থানেই আছেন।

মার চেহারাও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। কথা হাসি প্রায় বন্ধই হইয়া গিয়াছে। শুধু রোগীর ব্যাপারেই মা কথাবার্ত্তা বলিতেন। কথা বন্ধ হওয়ায় কি করিব, কি খাওয়াইব সবই আমাকে ভাবিতে হইতেছে। মার কথা বন্ধ হওয়াতে মনটা বড়ই খারাপ লাগিতেছে। মোট কথা সন্তানের অসুখে জননীর যে স্বাভাবিক ভাব, মা সেই মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। মা সব লীলাই ঠিক ঠিক মত করিয়া আসিয়াছেন। এই লীলাই বা অসম্পূর্ণ রাখিবেন কেন? তাই মার কোন অঙ্গেরই ত্রুটি নাই। মৌন হওয়ায়, আমারই জ্যোতিষদাদার সব ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। আবার রওনা হইলাম। এখনও তিন মাইল বাকী। বেলা প্রায় ৪টায় বাংলায় পৌঁছিলাম। আজও খাওয়া দাওয়া করিতে রাত্রি হইয়া গেল।

২৪শে শ্রাবণ, সোমবার—পাঁচ মাইল যাইয়া আজ ধবলচীনা ডাকবাংলায় থাকিতে হইবে। সকালেই রওনা হইলাম। আলমোড়া আর ১৩ মাইল দূর। এরপর আর থাকিবার সুবিধা নাই, তাই আজ ধবলচীনাতেই থাকা হইল।

মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত—ভাইজী

তৃতীয় অধ্যায়— ভাইজীর মৃত্যুশয্যা

২৫শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার—প্রায় ৮টায় রওনা হইলাম। দিনটা ভালই ছিল। এতদিনের যাত্রা আজ শেষ হইল। ১৩ মাইল পরেই আলমোড়া পৌঁছিলাম। কৈলাস যাত্রাও সাঙ্গ হইল। আমরা রোগী নিয়া একটি নূতন বাড়ীতে (যেখানে এখনও লোক বাস করে নাই) উঠিলাম। নূতন বাড়ীতে থাকার বাধা নাই। মাণিক ও নরেশ বাবুর স্ত্রী ৮ দিন যাবত এখানে মার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই মিলিত হইলাম।

কৈলাস যাত্রা শেষে আলমোড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন।

২৬শে শ্রাবণ, বুধবার—জ্যোতিষদাদার অসুখের জন্য কয়েকদিন এখানে থাকিতে হইবে। মা পথে কথা বন্ধ করিয়াছেন ও এক বস্ত্রে আটদিন দশদিন যাবৎ আছেন, পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আজ মা এতদিন পর বস্ত্র ত্যাগ করিলেন, কথা বন্ধই আছে। মা এখন ইসারায় জ্যোতিষ-দাদার ব্যবস্থা করাইতেছেন। বহুকাল পর বোধহয় মার এইরূপ কিছু কিছু কাজ করানো। কখনও মা নিজেও একটু আধটু করিয়া ফেলিতেছেন। দিল্লীর নরেনবাবুর স্ত্রী ও মাণিক, টুনু এখানেই আছে। সকলেই মাকে দর্শন করিতে আসিতেছে কিন্তু মা মৌন, কাজেই সকলেরই প্রাণে লাগিতেছে। মা জ্যোতিষদাদার শয্যাপাশেই বসিয়া আছেন আজ যেন জগতের জননী জ্যোতিষদাদার মা সাজিয়া বসিয়া আছেন!

২৭শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার—আজ সকাল হইতেই জ্যোতিষ দাদার খুব হিচকী আরম্ভ হয়, আমরা মহাব্যস্ত। মা জ্যোতিষদা'র মাথায়

একটু হাত দিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ খুব হাসিতে লাগিলেন, হাসিতে হাসিতে জ্যোতিষদা'র কপালের ঘাম মুছাইলেন, ডাক্তারও তখন বসিয়াছিল। মা হঠাৎ একবার সেই কাপড় দিয়াই ডাক্তারেরও মুখ কপাল মুছাইয়া দিলেন। মা ২৪ ঘণ্টায় একবার খাইতেছেন। আজ সারাদিন কিছুই খাইলেন না। রাত্রিতে আহার করিলেন। রাত্রিতে রোগীর অবস্থা কিছু ভাল হইল।

২৮শে শ্রাবণ, শুক্রবার—আজ বিশেষ কোনও ঘটনা উল্লেখযোগ্য নাই। রোগীর অবস্থা একরকমই চলিতেছে। মা রোগীর মাথার কাছেই একখানা চৌকীতে বসিয়া বা শুইয়া থাকেন।

২৯শে শ্রাবণ, শনিবার—গতকল্য রাত্রিতে মা অনেক সময়ই শুইয়া ছিলেন। জ্যোতিষদাদার জ্বর আরম্ভ হওয়ার পর হইতে বোধহয় এত বেশী সময় আর শুইয়া থাকেন নাই। মধ্য রাত্রিতে একবার উঠিয়া বসিয়াছিলেন, শেষ রাত্রিতেও বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ভোরবেলা হইতে মা শুইয়াই আছেন, বেলা ১০।১১টায় একবার উঠিয়া পায়খানায় গিয়া হাত মুখ ধুইয়া আবার আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মার একেবারে উদাসীন অবস্থা।

এ' কয়দিন সামান্য সামান্য ইসারা করিয়া জ্যোতিষদাদার খাওয়া দাওয়ার কথা ইত্যাদি বুঝাইয়াছেন, কিন্তু আজ আবার পূর্ব্বের মত ভাব, মুখ দেখিয়া কোন ভাবই ধরার উপায় নাই। কোন কথা যে কানে যাইতেছে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। পূর্ব্বের মত সারাদিন চাদর ঢাকা দিয়া এলাইয়া আপন ভাবে পড়িয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ৫টায় উঠিয়া বসিয়াছেন।

আজ একবারও রোগীর দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। একেবারেই আপন মনে আপনভাবে আপনাতেই আছেন। এ কয়দিন মায়ের

মতই যত্নাদি সব করাইয়াছেন। পথ্যাদি সব নিজে দেখাইয়া করাইয়া লইয়াছেন। যিনি এতদিন এইভাবে রোগীর প্রত্যেকটী বিষয় নিজে এত দৃষ্টি রাখিয়াছেন, আজ তাঁর একেবারেই যেন কিছু লক্ষ্য নাই। ডাক্তার দেখিতে আসিলে কাছে বসিয়া থাকিতেন, আজ ডাক্তার আসিলে শুইয়াই রহিলেন একটু পরে আপন ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলেন। চোখ বুজিয়া, যেন নেশার ভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর আসিয়া আবার জ্যোতিষদাদার শিয়রে নিজের খাটখানায় নিজের ভাবে শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু রোগী আজ সারাদিন মাকে না দেখিয়া মার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার এরূপ ক্ষমতা নাই যে ঘাড় বাঁকাইয়া মাথার দিকে দেখিবেন। যে মা, এতদিন এরূপভাবে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, আজ সেই মায়ের দেখা না পাইয়া রোগী মার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

জ্যোতিষদাদার কথা কিছু বলিতে গেলাম, মা যে শুনিতেছেন এমন বুঝা গেল না। জ্যোতিষদাদার অবস্থা পূর্ব্ব-মতই প্রায় চলিতেছে। পেটের শক্ত স্থানটা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। হরিরাম দেরাদুন হইতে জ্যোতিষদাদাকে দেখিতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহারা তাঁহাকে খুবই ভালবাসে। এইভাবে আজকার দিনও কাটিয়া গেল। মহারতন প্রভৃতি আশ্চর্য্য হইয়া বলিতেছে যে মা ভাইজীকে (জ্যোতিষদাদাকে) এত যত্ন করিতেছিলেন আজ এইভাবে কি করিয়া আছেন? মার অদ্ভূত চরিত্রের এই এক খবর ইহারা পাইল, কিন্তু কারণ কিছুই ধরিতে পারিল না। ধরিবার উপায়ই বা কী? সবই অদ্ভূত!

৩০শে শ্রাবণ, রবিবার—আজও সকাল বেলাটা মার ঐরূপ ভাবই দেখা গেল। বেলা প্রায় ২টায় ডাক্তার আসিয়া চলিয়া গেলে মার ভোগ হইল। মা সামান্যই খাইতেছেন, খাওয়া দাওয়ার পর মা

আজ জ্যোতিষদাদার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। পূর্ব্বের মত না হইলেও আজ মা রোগীর সম্বন্ধে উদাসীন রহিলেন না।

৩১শে শ্রাবণ, সোমবার—আজ সকালবেলা হইতেই মার আরও একটু পরিবর্ত্তন হইল। মা আজ পূর্ব্বের মত রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার আরামের ব্যবস্থা করিতেছেন। রোগীর বন্দোবস্তের জন্ত ইসারাও অল্প অল্প করিতেছেন। কোন কোন কাজ পূর্ব্বের মত নিজেও করিতেছেন। রোগীর অবস্থা দুপুর বেলা হইতে ভয়ানক খারাপ হইয় পড়িল। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার দুইজন আসিয়া দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলা পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে। শ্বাস কষ্ট, প্রায় মৃতের অবস্থা। মা কাছে চেয়ারে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইলেন, কখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। একবার একটু সরিয়া গিয়া নিজের খাটে বসিয়াছিলেন। রোগী জিজ্ঞাসা করিল, "মা কৈ ?" আমি বলিলাম, "মা আপনার শিয়রে বসিয়া আছেন।" অমনি মা আসিয়া কাছে চেয়ারে বসিলেন। এই যে বৈকালবেলা বসিলেন, সারারাত প্রায় আর উঠিলেন না।

রোগীর অবস্থাও ভয়ানক চলিল। ভোলানাথ যখন কাঁদিয়া আকুল আমাদেরও চোখে জল, মা তখন হঠাৎ অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে রোগীর গায়ে একটু হাত দিলেন। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত ডাক্তাররা অনেক রকম চেষ্টা করিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম "মা! ডাক্তারদেরও বিদ্যা ফুরাইল এ'বার যাহা হয় তুমি করিও।" মা কিছু বলিলেন না. একইভাবে রোগীর আরামের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। একবার আমি হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, মা রোগীর গায় দূর হইতে যেন ফুঁয়ের মতন দিলেন দেখিলাম। তখন বোধহয় আর কেহ ঘরে ছিল না, আমি ও মা ছিলাম, থাকিলেও এত অস্পষ্টভাবে ইহা করিলেন যে কেহ সহজে লক্ষ্য করতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার—ভোর বেলা মাণিক ঘরে আসিলে মা আমাকে ইসারায় একটু শুইতে বলিলেন। মাণিককে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "আমি শুইতেছি, এ'বার মা যাহা হয় কর।" একটু পরেই আমাকে মাথা ধরিয়া নাড়া দিলেন, আমি উঠিয়া বসিলাম। তারপর রোগীর কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দেখি, তিনি চারিদিকে চাহিতেছেন, আমি বলিলাম, "কি দেখিতেছেন?" জ্যোতিষ দাদা বলিলেন, "তুমি ছিলে না, দেখ নাই। আমাকে আসিয়া একজন দুইটা ইনজেক্‌সন করিয়া গেল তাহাই দেখিতেছিলাম।"

রোগীর অবস্থা খারাপ মধ্যে মধ্যে একটু ভুলও বকিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "বেশ ত, ভাল হইয়াছে আপনি ঐ ইনজেক্‌সনেই ভাল হইয়া যাইবেন।"

আজ অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু বায়ুতে পেট ভরিয়া আছে, কিছুই করা যাইতেছে না। মা ভোরবেলা একটু শুইয়া রহিলেন। আবার উঠিয়া বসিয়া আছেন। দুইবার কোন জিনিষ বড় একটা খান না। যাক্, মা যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই। আজ ডাক্তার বলিলেন, "কাল ত আমি একেবারেই আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজ একটু ভরসা পাইতেছি।" আজও রোগীর অবস্থা শঙ্কটজনক একটা saline ইনজেক্‌সন দিল, কালও একটা করিয়াছে। নেশার মতন রোগী পড়িয়া আছে। দুপুর বেলা ডাক্তার আসিলে মা ইসারায় জানাইলেন, রোগী মার কাছে নিবেদন করিয়াছে, আর যেন সেলাইন ইনজেক্‌সন দেওয়া না হয়। ডাক্তার বলিলেন, "ঐ ইনজেক্‌সনের উপরই ত ইনি বাঁচিয়া আছেন, কি করিয়া বন্ধ করিব। আচ্ছা যদি সন্ধ্যাবেলা ভাল অবস্থা দেখা যায় তবে আর দিব না, কিন্তু এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে ঐ ইনজেক্‌সন ছাড়া উপায় কি?"

এক সময়ে মাকে একা পাইলাম, মা ইসারায় জানাইলেন ইনজেক্‌সনটা না করিলে হয় কিনা ? আমি বলিলাম, "ডাক্তার ত বলিয়া গিয়াছে ভাল দেখিলে আর করিবে না, একটু দয়া করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন কর না, তাহা হইলে আর ইনজেক্‌সন দিতে হইবে না। অনেক ত ভোগ হইল, এবার ভোগের শেষ কর।" মা কিছু বলিলেন না।

বৈকালে রোগীর আবার একটু অস্থির ভাব দেখা গেল, মা সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু স্বর্ণসিন্দুর দিতে ইসারা করিলেন। তাই দিলাম। মা কাছেই বসিয়া আছেন, কখনও মাথায় একটু হাত বুলাইলেন, কখনও শয্যার বা পথ্যের সুব্যবস্থা করাইতেছেন। সব দিকেই মা আমার পূর্ণ।

ভাইজী জীবন মরণের সন্ধিস্থানে।

আজ সন্ধ্যার পর রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ, সকলেরই চোখে জল, মা শুধু স্থির, ধীর, শান্ত। রাত্রি ১২টার পর অবস্থা যখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, তখন মা রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া নিজের খাটখানাতে বসিলেন, সব দেখিতেছেন কিন্তু কাছে আসিতেছেন না। কিন্তু দেখিলাম রোগীর খাটে চরণ স্পর্শ আছে। ডাক্তার তাহার শেষ চিকিৎসা,—আর একটা সেলাইন ইনজেক্‌সন দিতে চাহিল। মা দিতে বলিলেন। অনেক চেষ্টার পর ডাক্তার যাওয়ার পূর্ব্বে মাকে আমি ও হরিরাম বলিলাম, "মা আমরা বাইরে যাই তুমি একা রোগীকে নিয়া থাক, ডাক্তারের ত আর কিছুই করিবার নাই এখন তুমি যাহা হয় কর।" হরিরাম প্রভৃতি সকলেই কাঁদিতে লাগিল। আমরা বাহিরে চলিয়া গেলে মা একটু পরেই ডাক্তারকে ডাকিয়া নিলেন। আমরাও গেলাম, তখনই সেলাইন ইনজেক্‌সনের কথা হইল। মা অনুমতি দিলেন। ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চলিয়া গেল। আমরা ঐ মৃতপ্রায় রোগীকে নিয়া বসিয়া রহিলাম।

জ্ঞান খুব আছে একবার বলিল, "মা কৈ? মাকে একবার ডাক।" কিন্তু মা পূর্ব্ববৎ পাথরের মত অবশ ভাবে শুইয়া আছেন। রোগীও ২।১ বার ডাকিল, কিন্তু মা উঠিলেন না; আমাদের ভয় হইল—এ আবার কি! ভোলানাথ ভয়ে মার হাত ধরিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। এই আর এক চিন্তায় আমরা অস্থির, ভোলানাথ ও আমি এ বিষয় অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। ভোলানাথ আমাকে মার খাট ধরিয়া জপ করিতে বলিলেন। আমি, মহারতন ও ছবির মাকে জপ করিতে বসাইলাম। তাহারা একমনে জপে বসিল, তাহারা এ'সব বুঝিতে পারে নাই তাই আমাদের কথা শুনিয়া ভয় পাইল। যাক্ অনেকক্ষণ পর মা একটু নড়িতেই, আমি বলিলাম, "মা একটু উঠিয়া বসো, দাদা ডাকিতেছেন।" মা চোখ বুজিয়াই অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা উঠি।" আমাদের প্রাণে আবার আশার সঞ্চার হইল। ভোলানাথ ও আমি ভয় পাইতেছিলাম। মা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া আবার রোগীর শয্যাপার্শ্বে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। মাথার তালুতে হাত দিলেন, রোগীও মাকে পাইয়া হয়ত একটু শান্তি পাইল, এইভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। শ্বাসের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এই বুঝি প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

২রা ভাদ্র, বুধবার—সকালে মা শুইয়া আছেন। রোগীকে নিয়া আমরা বসিয়া আছি। মা'ও উঠিয়া বসিলেন। আজ জ্যোতিষ দাদার শেষ দিন, আজ মহাত্মা আমাদের ছাড়িয়া চলিলেন। মার কথায় বেলা ১০টায় সিভিল সার্জেনকে আনিয়া দেখান হইয়াছিল। জ্যোতিষদাদার চার পাঁচদিন যাবত হিচ্‌কী চলিতেছিল, কাল হইতে কিছু কম, শ্বাসের ভয়ানক অবস্থা কাল হইতেই চলিতেছে।

জ্যোতিষ রায় মহাশয়ের মার চরণে মস্তক রাখিয়া মহাপ্রয়াণ।

আজও বেশ জ্ঞান আছে, বলিতেছেন "স্বামীজী খেয়েছেন?" আমাকে বলিতেছেন, "মাকে খাওয়াইয়াছ?" কাল রাত্রে আমাকে বলিলেন, "খুকুনী ফিনিস্", আজ ডাক্তার আসিল কি না পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আবার সেলাইন ইনজেক্সন দিতে প্রস্তুত হইয়া আসিতেই দাদা বড়ই আপত্তি করিলেন কিন্তু ডাক্তার রাজী হইল না যতক্ষণ শ্বাস, আশা ছাড়িতে পারেন না। ইনজেক্সন দিলেন, কতরকম চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরে আশা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "নাড়ীর গতি কিছুই পরিবর্ত্তন হইতেছে না এখন মা ভরসা।" মাকে কাঁদিয়া বলিলাম। হরিরামও কাঁদিয়া বলিল। মা ইসারা করিয়া বলিলেন কিছু আসিতেছে না। রোগীর কাছে বসিয়া তাঁহার মাথার ঘাম মুছিতেছেন। মার কথা শুনিয়া আমরা আশা ছাড়িয়া দিলাম। দাদা তখন ২।৩ বার বলিলেন "হরিবোল হরিবোল।" পরে বলিলেন "মা কই?" যেন স্পষ্ট দেখিতেছেন না আমরা দেখাইয়া দিলাম পরে দেখিলেন, অনবরত বলিতে লাগিলেন মা, মা, মা, পরে একটু সুর করিয়াও ২।১ বার বলিলেন মা, মা, মা, মা। মা কাছে স্থিরভাবে বসিয়া ঘামই মুছাইয়া দিতেছেন। আমরা কাঁদিতেছি, একটু পরে বলিতেছেন "খুকুনী নাম শুনাও।" আমি চোখের জল মুছিয়া মা নাম শুনাইলাম। একটু পরে বলিতেছেন "কি সুন্দর" আবার বলিলেন "খুকুনী কি সুন্দর" একটু পরে আবার এক অঙ্গুলী উঠাইয়া বলিতেছেন, "সব এক, এক ছাড়া কিছুই নাই।" হরিরাম কাঁদিয়া বলিল "ভাইজী"। জবাব দিয়া বলিলেন, "এক কথা খেয়াল রাখনা ভাই, এক সব এক।" আমি বলিলাম দাদা বেশ মার কোলে শুইয়া আছেন। বলিলেন "মা ও আমি এক, বাবা ও আমি এক, আমরা সবাই এক, এক ছাড়া কিছুই নাই। পরে সন্ন্যাস মন্ত্র স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিলেন। জোরে জোরে শ্বাস

পড়িতে লাগিল, পায়খানা হয় না, এখন পায়খানা হইতে আরম্ভ হইল। বলিলেন "খুকুনী আমাকে পরিষ্কার করিয়া দাও"। পরে বলিতেছেন, "আমার মুখটা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও", তাই দিলাম। পরিষ্কার জ্ঞানটা, ধীরে ধীরে শব্দ বন্ধ হইল, মার দৃষ্টিতেও কৃপার ভিতর থাকিয়া ধীরে ধীরে মহাপুরুষ ৫৭।৫৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগের ২।১ মিনিট পূর্ব্বে আমি খাট হইতে নামাইয়া লইলাম, মার চরণ মাথায় দিলাম। বালিশে মার পা ছোঁয়াইয়া রাখিলাম। মা চুপ করিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। আমি সকলকে বলিলাম, "মা নাম শুনাও"—তাহা আরম্ভ করিতেই শেষ নিশ্বাস পড়িল।

স্থিরভাবে মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। সুন্দর মৃত্যু, মৃত্যুর একটু পূর্ব্বে মা সকলকে একটু বাহির হইতে বলিলেন। এক মিনিট পরেই আবার ডাকিলেন। আমরা ঘরে যাইতেই জ্যোতিষদাদা বলিতেছেন, "মা আমাকে ঘুমাইতে ইঙ্গিত করিলেন, আমি ঘুমাই।"

মৃত্যুর পর মা আমি বাবা, হরিরাম প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া কথা বলিলেন, মার মৌন থাকাকালীন যেমন অস্পষ্ট হইত সেরকমভাবে বলিতে লাগিলেন—"ইহাকে সমাধি দেবার বন্দোবস্ত কর, কারণ তাহার 'সন্ন্যাস' নেওয়া হইয়াছে, তাহার অবধূত ভাব।" পরে কিছু কিছু, বিবরণ বলিতে লাগিলেন। ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "বলো, বলো, আচ্ছা আমি ছয় বৎসর মৌন থাকার পরে কথা বলিতেছি।" অমনি মা বাধা দিয়া বলিলেন "চুপ" (অর্থাৎ তিনি পাছে মৌনভঙ্গ করে ফেলেন তখন কথা বলতে মা নিষেধ করিলেন)।

মার মুখে জ্যোতিষদাদার সন্ন্যাসের বিবরণ।

আমরা যখন মানস সরোবরে গিয়াছিলাম, তখন তোমাকে, জ্যোতিষকে ও ভোলানাথকে আগে পাঠাইয়া দিয়া আমি রাস্তায় বাবার জন্য অপেক্ষা

করিতেছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া শুনি, জ্যোতিষ নাকি সরোবরে স্নান করিয়া আসিয়াছে। পরে ভোলানাথের কাছে শুনিলাম, জ্যোতিষ স্নান করিয়া বিবস্ত্র হইয়া জলে কাপড় ভাসাইয়া দিয়া নাকী ভোলানাথকে দেখিল, দেখিয়া ভোলানাথের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—বাবা আমার ইচ্ছা হয় আমি এখান হইতেই "অবধূত সন্ন্যাসী" ভাবে চলিয়া যাই। মানস সরোবরের একটা পাশ দেখাইয়া বলিল, আমাকে বিদায় দিন, আমি ঐদিকে চলিয়া যাই। পৈতা ইত্যাদি খুলিয়া নাকি ভোলানাথের পায়ে দিয়াছিল। ভোলানাথ নাকি ঐ সময় বিশেষভাবে বলিতে লাগিলেন —"একি? কি করছ? তোমার মা, ইহারা এখনও ভাসে নাই শীঘ্র কাপড় পর।"

"জ্যোতিষ বোধহয় ভাবিল মাকে ত কিছু বলা হয় নাই ভোলানাথের আদেশ পাইয়া গরম কাপড় পরিয়া নিজেদের তাঁবুর কাছে অপেক্ষা করিতেছিল। বাবা, (অর্থাৎ—অখণ্ডানন্দ স্বামীজী) আসিলে আমরা তাঁবুতে আসিয়া পৌছিলাম দুই ঘণ্টা পর। আসিয়া দেখি জ্যোতিষের মানস সরোবরের স্নান হইয়া গিয়াছে। আমি আসিলেই সকলেই আবার মানস সরোবরে গেলাম তো? যাহারা স্নান করিবার, স্নান করিয়া যাহার যাহার ভগবৎ ভাবের কর্ম্ম করিয়া চলিয়া গেল।"

"আমি ও জ্যোতিষ মানস সরোবরের তীরে হাঁটিতেছিলাম। ভোলানাথের কাছে যাহা বলিয়াছিল সে সব কথা এ' শরীরটাকে বলিতে লাগিল, প্রণাম করিয়া আরও বলিল, 'মা আমার এরূপ হচ্ছে, আর যে ক'দিন থাকি, এ দিকেরই একটা গুহায় বা যেখানে সেখানে থাকিয়া যাই। এ ভাবেই থাকি। আপনি বাবাকে বলুন, আমি একদিকে চলিয়া যাই। এক্ষুণিই চলিয়া যাই—বিদায় দিন।" দেখা গেল, উদাস অবধূত ভাবের একটা প্রকাশ। আমি দেখিলাম এই প্রকাশটা বেশ সুন্দর

তীব্র ; এই ভালো ভাবটা দেখলাম—বললাম কিন্তু তুই এখন সঙ্গে চল।" এ' কথা বলায় চুপ হইয়া গেল।

জ্যোতিষ সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং বলিল আমার একটা নিবেদন—বলুন আমি তবে এখন হইতেই মৌন হইয়া যাই।—আমি বলিলাম "না রাস্তার মধ্যে মৌন হওয়া ঠিক হইবে না।" এই বলিয়া চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, "আজ যখন তোর এইভাবে সন্ন্যাস হইল, আর তোর মৌন হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, তখন তোর নাম হইল "মৌনানন্দ পর্ব্বত"।

এ শরীরটা মানস সরোবরের দিকে এ'দিক ওদিক তাকাইয়া তীরে আপন ভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। মন্ত্র ইত্যাদি যেমন বাহির হয়, এ' শরীরের মুখ দিয়া সেরূপ অনর্গল সন্ন্যাস মন্ত্র অন্যান্য আরও কত সব মুখ দিয়া বার হইতে লাগিল ; এ' সবই আপনা আপনি বার হচ্ছে, এ' শরীরটা বেশ আপনভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ইহার ভিতর দেখা গেল, জ্যোতিষও পিছনে পিছনে হাঁট্‌ছে। ছুটে এসে পায়ে পড়তে গেল, এবং বলতে লাগল, "মা, এ যে সন্ন্যাস মন্ত্র আমি যে পেয়ে গেছি। এই বলতে বলতে গদ গদ ভাবে অনেকক্ষণ পায়ে পড়ে রইল। গলার পৈতা, হার ইত্যাদি এ শরীরটার পায়ের কাছে দিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। ইহার ভিতরে মানস সরোবরে বসিয়া আরও কি সব করিতে লাগিল এবং এ শরীরকে ও আট নয় গণ্ডুষ জল দিল। সেই হইতে উহার সেই সন্ন্যাস মন্ত্র ইত্যাদি :অনবরত জপ ও সেইভাব অসুস্থতার ভিতরেও যথাশক্তি শেষ পর্য্যন্ত ছিল।" মা পরে আবার পৈতা ও হার ইত্যাদি তুলিয়া নিতে বলিয়াছিলেন। মায়ের আদেশ রক্ষার্থে মালার মত পৈতা ও হার গলায় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মা আরও বলিলেন, "কৈলাসযাত্রার আগে যখন বৈজনাথ একবার যাওয়া হইয়ছিল তখন এক সন্ন্যাসী অযাচিতভাবে ডেকে নিয়ে

জ্যোতিষকে এ-জাতীয় মন্ত্র ইত্যাদি নিজে নিজে বলেছিল। এসে বলল, "আমি কিছু তাহার কাছে চাই নাই, বলি নাই, আমাকে সামনে ডেকে নিয়ে বসাল। আমি প্রণাম করে তার কাছে বসলাম, তিনি নিজে নিজে এ সব জাতীয় একটু বলতে লাগলেন।" এ রকমও একটা উহার পূর্ব্বে হয়েছিল ইহা সবই গোপন ছিল। বাহিরে কিছু প্রকাশ করিবে না বলিয়া বাহিরের কিছু পূর্ব্বে বদলায় নাই। ঘটনাচক্রে ঐ দিকের রাস্তায় ত গরম কাপড় পড়িয়াই কাটিয়া গিয়াছে, পরে অল্প সময়ের জন্য হয়ত ধুতি মাজায় জড়াইয়া রাখিয়াছিল, ফিরিবার পথে। তারপর ত অসুখেই পড়িল তখন ত পরার কাপড়টা ভাঁজ করিয়া কোমরে জড়াইয়া দিয়াছিল। তুই যখন বিশেষ অসুস্থ অবস্থায় পায়খানা করিবার পর কাছা ঠিক করে দিতে গেলি তখন বলে উঠেছিল, না কাপড় এমনিই জড়ান থাক! আমি দূরে থেকে শুনছিলাম তাই চলিতেছিল শেষ সময় ত তোরা দেখিলি এবং শুনিলি। সন্ন্যাস ভাবটা যখন ছিল ইহার সমাধিই হওয়া দরকার। এ' সব কথা কাহাকেও বলিবার :অনিচ্ছা প্রকাশ করায় আমি বলিয়াছিলাম, সময় মত আমি সকলকে জানাব, তাই জানালাম।

"আর এক কথা, যখন ও'র যক্ষা হয় তখনই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, 'ভয় পাও কেন? এখন কিছুই হইবে না তুমি কাজে পুনরায় যোগ দাও, আরও এ' কয় বছর আছ।' এ' কথা যে আমি বলিয়াছিলাম তাহা বেশ খেয়াল ছিল। এ' শরীর কখন কি বলিয়াছিল, এ' শরীর ত সে সব কথা পরে খেয়ালেই আনে নাই, কিন্তু জ্যোতিষ তাহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, তাই দেখা গেল সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিতেছিল। রাস্তায় একদিন এ' কথা বলিয়াছিল আমি বলিলাম, 'ও সব কথা ভাবিস কেন?' তারপর রাস্তায় যখন জ্বর খুব বাড়িয়া গেল, তখন জ্যোতিষ একটু চিন্তিত হইয়া আমাকে বলিল,

'কি উপায় হইবে? খুকুনি একা, রান্নাবান্না সব করিতে হয়, আবার সেবা করিতে হয়, ও একা। কি করিয়া চলিবে?" আমি ওর এই ভাব দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিলাম—"তুই ভাবিস্ না, আমি করিব ও সকলকে দিয়া করাইয়া নিব।" এ' কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম তাই একটু আধটু যতটুকু তোরা দেখিয়াছিস করা হইয়াছিল। কাজ ত এ' শরীর দিয়া কিছু হয় না, খেয়াল হচ্ছিল কথা দিয়াছি। সেবার জন্য বিশুকে আল্‌মোড়া আসিয়া থাকিবার জন্য স্বামীজীকে দিয়া রাস্তা হইতেই চিঠি লিখাইয়া দিয়াছিলাম। সেই চিঠি পাইয়াই বিশু আসিয়াছে। যাক্ দু'দিন খেয়াল হয় নাই তাই কিছু দেখা হয় নাই। আবার কথা রক্ষার জন্য যতটুকু হইয়া গেল। এখন কথা বলিলাম কারণ এ' সব কথা জানান দরকার।

সংক্ষেপে মা সন্ন্যাসের কথা কিছু কিছু বলিলেন। হরিরাম সমাধির স্থান ঠিক করিতে চলিয়া গেল। আমরা সকলে মৃতদেহ নিয়া বসিয়া রহিলাম। ৩।৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। মা আবার বলিলেন, "আমার কথা বলিবার বিশেষ খেয়াল হইতেছে না। যখন আবার খেয়াল হইবে বলিব।" আমাকে বলিলেন, "তুমি ও বাবা বিন্ধ্যাচল গিয়া থাক। রুমা দেবী এখন আমার সঙ্গে থাকুক। আমরা আগামীকল্য দেরাদুন রওনা হইয়া যাই কি বল?" তখন বাবা ও আমি একান্তে কথা বলিবার জন্য সবাইকে সরাইয়া দিলাম, কারণ এরপর যদি মা আর কথা না বলেন। দরকারী কথা যাহা যাঁহা বলিবার বলা হইল। মা আমাকে জ্যোতিষ দাদার "ভগ্নী" বলিয়া ২।৩ বার একত্র করিয়া দিয়াছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করা হইলে বলিলেন, "ভগ্নীর কাজ ত যথেষ্ট করিয়া দিয়াছ।" এই সব কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

ভিন্ন স্থান পাওয়া গেল না। পাতালদেবী বলিয়া একটা স্থানে

সমাধি দেওয়া স্থির হইল। সেখানে আরও দুইজন বাঙ্গালী সাধুকে সমাধি দেওয়া হইয়াছে। আমাদের গতবার ঢাকা যাওয়ার সময়ে জ্যোতিষদাদা এখানে ধর্ম্মশালায় থাকিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যাক্, আজ তাঁহার দেহ সেখানেই সমাধিস্থ করা হইবে স্থির হইল। পরে সুবিধামত অন্য কোনও স্থানে শরীরের কোন অংশ নিয়া স্মৃতি মন্দির করিয়া রাখা, হরিরামের ইচ্ছা। স্বামীজীকে মা বলিয়া দিলেন, তুমি সঙ্গে যাইয়া নিজ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সমাধি দিও তোমারই ত প্রথম এই কাজ।" অনেক লোক সঙ্গে সঙ্গে গেল।

পাতালদেবীতে নিয়া উপরে নীচে লবণ দিয়া সমাধি দেওয়া হইল। পরের দিন হরিরাম সেই স্থান একটু পাকা করিয়া রাখিয়া দিল। জ্যোতিষ দাদাকে নিয়া গেলে মা ও আমি সেই ঘরেই বসিয়া রহিলাম। ভোলানাথের হঠাৎ ভয়ানক পেটে বেদনা উঠিল। ভয়ানক চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। নরেনবাবুর স্ত্রী ও আমি কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। ভোলানাথ মাকে পাশের ঘরে উঠাইয়া নিতে চাহিলেন, মা বলিলেন, "হয়ত উঠিলে কথা বলবার আবার খেয়াল থাকবে না। যখন উঠিব, উঠিয়া গিয়া ও'ঘরে শুইব। কালই ত দেরাদুন রওনা হওয়া, আজ নন্দাদেবীর মন্দিরে চলিয়া গেলেও হইত।" আবার বলিলেন, "কালই যখন যাইব, আজ আর নাড়াচাড়ার দরকার কি? এখান হইতেই চলিয়া যাওয়া যাইবে।" আমরাও ভাবিলাম মা যেখানে বসে কথা বলছেন, সেখানেই থাকুন যদি কথা বন্ধ হইয়া যায়, প্রয়োজনমত কথা বলছেন ত। যতক্ষণ কথাবার্ত্তা পাওয়া যায়।

সেই ঘরেই মার বিছানা পাতিয়া দিলাম। সামান্য একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলাম। খগেন মার সঙ্গে দাদার কথা বলিতে লাগিল। এদিকে ভোলানাথ ব্যথায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। পুরুষ কেহই

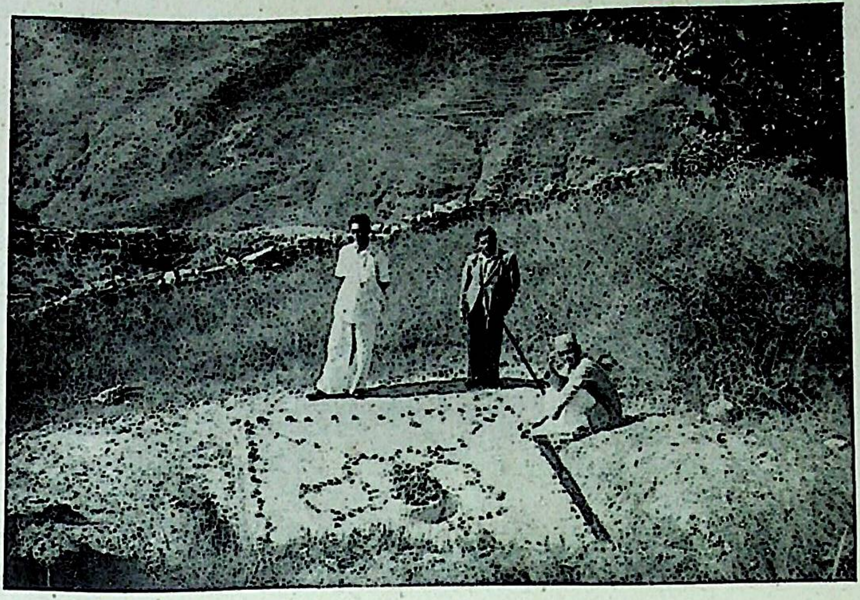

প্রকৃতির চির-শান্ত ক্রোড়ে ভাইজীর সমাধি স্থান

বাসায় নাই, একটি ছেলেকে পাইয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম। শরীরের ও মনের তখন যে অবস্থা, তার মধ্যে এই ব্যাপার। মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। যাক, যথা কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছি। ডাক্তার আসিয়া ডুস দিলেন, ইনজেকসন দিলেন পরে ভোলানাথ একটু চুপ করিলেন।

রাত্রি প্রায় ১১।১২টায় সকলে সমাধি দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মা হরিরামকে বলিলেন, "তোমরা ভাইজীকে ভালবাসিতে, তোমাদের দেশেই তাহার শরীরটা রাখিলে।" হরিরাম খুব কাঁদিতে লাগিল মার চোখ একটু ছলছল দেখা গেল। আমরা সকলেই কাঁদিতেছি। মা হরিরামকে বলিলেন, "জ্যোতিষের যে সৎকাজের ইচ্ছা ছিল, তোমরা তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিতে পার। আত্মার ত ধ্বংস নাই, ইচ্ছারূপে তোমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছিল সে ইচ্ছাই তোমাদের সাহায্য করিবে।"

জ্যোতিষদাদার কথাই চলিতে লাগিল। মা বলিলেন, "সে তো সাধারণ মানুষ ছিল না, তাহা প্রথম থেকেই দেখা গেছে, ভাবগুলি খুব উচ্চ ছিল।" সেই যে হার, পৈতাস্বরূপ সেবাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আবার জ্যোতিষদাদার গলায়ই মা রাখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। সেবাকে সেই হারটি মা'ই দিয়া দিতে বলিলেন। মা উঠিলে আর কথা বলেন কি না ঠিক নাই, এজন্য যাহার যাহা বলিবার একান্তে মাকে বলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। মা সকলের সঙ্গে রান্নাঘরে আসিয়া শুইলেন। আর কোন কথা বলিলেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

৩রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—আজ অনেক বেলায় মা উঠিলেন, সকলেরই প্রাণে একটা হাহাকার। যেন সবই ছত্রভঙ্গ ; মা উঠিয়া বসিলেন, খগেন কাঁদিয়া বিদায় নিল, সে ঢাকা যাইতেছে। জ্যোতিষদাদার স্ত্রী ও পুত্রের কাছে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল এতদিন ত অভিমান ভরে জ্যোতিষদাদার স্ত্রী তাঁহার সহিত কথাই বলেন নাই। যখন ঢাকা যাইবার কথা হইয়াছিল, এবার যখন তিনি ঢাকা যাইতে চাহেন নাই। মা বলিয়াছিলেন, "এবার চল, এবার আর তোকে গালাগালি করিবে না।" সত্যিই এবার তিনি অনেকটা ভাল ব্যবহার করিয়াছেন, বোধহয় এই শেষ বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল। কৈলাস যাইতে তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন জানিয়া মা'ও নিষেধ করিলেন কিন্তু জ্যোতিষদাদা রাজি হইলেন না, তিনি স্ত্রীকে বুঝাইয়া পত্র লিখিয়া দিবেন বলিলেন। এবার অসুখের কথা শুনিয়াই নাকি স্ত্রীও খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আসিতে পারেন নাই। শরীরও তাহার ভাল নয়, মনেরও হয়ত বাধা, যাহা হইবার হইবেই, জ্যোতিষদাদা সন্ন্যাস নিয়াছিলেন তাই আর স্ত্রী পুত্রের সহিত দেখা না হওয়াই সন্ন্যাসীর হিসাবে দরকার ছিল, তাই যাহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন সেই মার কোলেই সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া গেলেন। এইরূপ অবস্থা সকলেরই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের কথা ভাবিয়া আজ সকলেরই প্রাণে আঘাত লাগিতেছে। সব অভিমানই আজ এইভাবে শেষ হইয়া গেল। মা তাহার প্রাণে শান্তি দান করুন এই প্রার্থনা।

৺জ্যোতিষ রায় মহাশয়ের মহাপ্রয়াণের পর।

মা উঠিলে মার মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। একটু দুধ খাইলেন। ঘরে অনেক লোক চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আমি মার জন্য রান্না করিতে চলিয়া গেলাম, একটু পরেই শুনিলাম মা স্বামীজীকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া (জ্যোতিষদাদা যে ঘরে দেহত্যাগ করিয়াছেন), দরজা বন্ধ করিয়া কথা বলিতেছেন। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন, পরে পায়খানায় গেলেন, স্বামীজীই জল দিলেন হাত ধোয়াইয়া দিলেন। আবার কথা চলিল, অনেকক্ষণ পর আমি গেলাম। বলিলেন, "শচীর, নরেনের আর, আর, আর," কথা বন্ধ হইয়া আসিল, একটু পরে বলিলেন, "পত্রের জবাব দেওয়া হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "তোমাকে ত সকলের পত্র (এর মধ্যে যা' আসিয়াছে) শোনাইবার সুবিধা হয় নাই, তাই জবাবও দেওয়া হয় নাই। আমি ত সঙ্গে যাইব না, মাণিককে সব দিয়া দিলাম, সে তোমাকে শুনাইয়া জবাব দিবে।" মা বলিলেন, "আর কি শুনিব, সকলের সব কথাই শোনা হইয়াছে।" চোখ বুজিয়া বুজিয়া এই সব বলিতেছেন। একটু পূর্ব্বেই স্বামীজীকে দিয়া বিছানা এ'ঘরে আনিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়া এ ঘরে আসিয়া খাওয়ার কথা বলিলাম, কিন্তু মার শরীর অবশ, বলিলেন এখন শুইব খাইতে পারিব না। দেখিলাম যেরূপ শরীরের অবস্থা এখন খাওয়া অসম্ভব, শুইয়া পড়িলেন।

পরে হরিরাম আসিল। আরও একটী মিশনের সাধু আসিলেন তিনি মার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া বলিলেন মেয়েদের যাহাতে একটা থাকিবার স্থান হয়, তাহারা এক স্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিতে পারে, সেইরূপ হইলে ভাল হয়—অনেক মেয়েরা এরূপ আবেদন করিয়াছে। মা বলিলেন, "জ্যোতিষেরও এরূপ ইচ্ছা ছিল, তুমি যখন নিজ হইতেই এরূপ প্রস্তাব করিলে ইচ্ছা হইলে হরিরাম, স্বামীজী প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া এই কাজে যোগ

দিতে পার। আমি ত তোমাকে বলি নাই, তুমিই আসিয়া বলিতেছ। "হরিরাম বলিল তোমার আদেশ ছাড়া কিছুই হইবে না। মা বলিলেন, আমি ত কিছুই বলি না, তোমরাই সব করিয়া থাক। যদি তোমরা করিতে চাও করিতে পার। এ'শরীরের কোন কথা নাই। মনে প্রাণে সৎকাজ যাহা করা যায় সে কাজ সফল লাভ করে। যাহা যাহা নিয়ম করিতে হয় তোমরা মিলিয়া মিশিয়া করিয়া লইতে পার।"

এ' শরীরের ত এ'সব কাজে থাকবার খেয়াল হয় না। এ শরীরকে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না। খুকুনী ইহারা আছে। তোমাদের ইচ্ছাতেই এ'সব বলিলাম, কাজ ত তোমাদের। জগতের যে যত সৎকর্ম্ম কর, সবই যে এক ভগবানের সেবা, তোমরা জগতের সকলেই কর্ম্ম করত, করলে সৎকর্ম্ম কর। সত্য লাভের চেষ্টাই একমাত্র করণীয়। সেই অনুকূল যে কর্ম্ম, সে কর্ম্ম গ্রহণীয়, ভগবৎ ভাবের সহায়ক কর্ম্মই কর্ম্ম আর যা কিছু সব অকর্ম্ম, ত্যজ্য।" আরও ২।৪ কথা বলিলেন। পরে আমাকে ২।১টা গোপনীয় কথা বলিয়া শুইয়া পড়িলেন, একদম চুপ করিয়া।

কালও নাকি যাওয়া হইবে না। "যাহা হয় ভোলানাথের শরীর বুঝিয়া তোমরা করিও।" এই কথা বলিলেন, আজও ভোলানাথের অসুখের জন্য যাওয়া হইল না। মা চুপ করিলেন। বেলা তখন ৩টা, খাইবার কথা আবারও বলা হইল, কিন্তু খাইলেন না। কাল রাত্রিতেই হরিরাম বলিয়াছিল, "মা, পিতাজীর ত আজ অসুখ হইল, কাল যাওয়া হইবে না। কাল ভাইজীর সমাধির উপর একটু চিহ্ন দিয়া রাখিব। বৈকালে আপনাকে তথায় দেখাইতে নিয়া যাইব, পরশু আমরা রওনা হইব।" সেই কথায় মা আজ স্বামিজীকে বলিয়া রাখিলেন, "হরিরামকে বলিও এ শরীরটা যদি তাহার সহিত যাইতে না পারে, আমি তাহার সঙ্গেই

থাকিব সে যেন মনে করে।" তাহাই হইল। বৈকালে হরিরাম, মহারতন, নরেনবাবুর স্ত্রী, মাণিক সকলকে নিয়া জ্যোতিষদাদার সমাধির স্থান দেখাইতে নিয়া গেল। মা পড়িয়াই আছেন। রাত্রি হইয়া গেল, মা উঠেন না। তখন কীর্ত্তন আরম্ভ করা হইল, কিন্তু মাকে উঠান গেল না। ঘরে অনেক লোক সারারাত্রি রহিল। রাত্রি প্রায় ১টায় অনেক চেষ্টায় মাকে উঠান হইল, এবং বসাইয়া দেওয়া হইল। সামান্য একটু দুধ মুখে নিলেন, আবার পড়িয়া রহিলেন।

৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার—বেলা অনেক হইল, কিন্তু মার উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। ভোলানাথও ব্যস্ত হইয়া অনেক ডাকাডাকি করিলেন। আমরাও অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা আবার কীর্ত্তন আরম্ভ করা হইল। মা দুপুর বেলার মধ্যে একটু পাশ ফিরিলেন। কিন্তু শরীর অবশ পাথরের মত। চোখ বুজিয়াই আছেন। বৈকালের দিকে মার শ্বাসও এক একবার দ্রুত গতিতে বহিতে লাগিল, আমরা প্রমাদ গণিলাম। চিন্তায় চিন্তায় সকলের শরীর অবশ।

কীর্ত্তন চলিতেছে, মা একবার কি যেন বলিলেন, মুখের কাছে কান দিয়া শুনিলাম। মা বলিতেছেন, "সকলকে একটু বাহিরে যাইতে বল শুধু তুমি থাক।" তখনই তাহা করা হইল মা যাহা বলিলেন সময়ে প্রকাশ হইবে, এখন বলিতে নিষেধ করিলেন। আর কিছু বলিলেন না, ভোলানাথ আসিয়াও কত চেষ্টা করিলেন আর কোন কথাই বলিলেন না। শ্বাসের অবস্থা দেখিয়া ভয় পাইয়া ভোলানাথ মাকে পাশের ঘরে নিয়া যাইতে বলিলেন, তাই নিয়া যাওয়া হইল। মার অবস্থা দেখিয়া এবং মা যাহা বলিয়াছেন ভাবিয়া আমাদের মনে মার জন্য একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা হইল। আবার মা অস্পষ্ট ভাষায় আমাকে ২।১টী কথা বলিলেন তাহাও এখন প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মার কাছে চারিদিকে বসিয়া আছেন। জ্যোতিষদাদার এইরূপ মৃত্যু তারপর মার শরীরের এই অবস্থা আমাদের অবস্থা লিখিয়া জানান সম্ভব নয়। কি অবস্থায় সময় কাটীতেছে মা'ই জানেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মার মাথা ঘুরিয়া গিয়া পিঠে ঠেকিল। চোখ জল জল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চোখ খুলিয়াছেন। সন্ধ্যার পর উঠাইয়া যেন বসাইতে বলিলেন, আমার দিকে হাত একটু বাড়াইয়া দিলেন। আমি অমনি হরিরামের সাহায্যে ধরিয়া তুলিতেই মা আসন করিয়া বসিলেন। শরীরে যোগের ক্রিয়া একটু একটু হইতে লাগিল। আবার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেই আমরা শোয়াইয়া দিলাম। হরিরাম বলিতেছে, "আলমোড়াবাসীরা টিট্‌কারী দিত, তাই আজ মা তাহাদের নিজের রূপ দেখাইতেছেন, কিছু ভয় নাই।" যাক্ সকলে ফুল ছিটাইতেছেন, ঘরে লোক ধরে না। কেহ কেহ আরতি করিতেছে। কিন্তু ভয়ে দুশ্চিন্তায় আমাদের সারারাত্রি কাটিল, সমস্ত রাত্রিই নাম চলিল। বেশী রাত্রিতে বাইরের লোক বড় কেহ ছিল না। ঘরে বড় আলো জ্বালাইয়া সকলে মাকে নিয়া বসিয়া রহিল, মা পড়িয়া আছেন।

৫ই ভাদ্র, শনিবার—আজ পূর্ণিমা। আজ সকালেও মা ঐ ভাবেই পড়িয়া আছেন কিন্তু ভাবের যেন একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। শরীর অবশ, কিন্তু বাহ্য জ্ঞানের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। ইহা দেখিয়া সকলের প্রাণে বল আসিল। ভোলানাথ বলিলেন, "আর এখানে কিছুতেই থাকা নয়, আজই এই অবস্থায়ই রওনা হইব। সে ত এর পূর্ব্বেই যাইতে চাহিয়াছিল। কালও সকলে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু মাকে উঠাইতে না পারায় যাওয়া হইল না। ভোলানাথ বলিলেন, "তুমি ত আমার সঙ্গে দেরাদুন যাইবে বলিয়াছ।" মা বলিলেন, "আমি সব সময়ই

ত বলি, যদি শরীর ঠিক ঠিক থাকে, বেশ ত শরীরটা পারলে তোমরা নিয়া যাইও।" ইহাতে সকলেই ভয় পাইল, বলিল "না না তুমি না গেলে আমরা কেহই নিতে পারিব না। এই শরীর নিয়াই তোমার যাইতে হইবে। মা আর জবাব দিলেন না।

হরিরাম সকলকেই একটু রাগের সহিত কি বলিতেই মা বলিয়াছিলেন, "রাগ করিও না, নিজের ভাব ছাড়।" কাল ঐ অবস্থায়ও অতি অস্পষ্ট ভাষায় এই সব কথা হইয়া গিয়াছে তাই ভোলানাথ আজ নিয়া যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলেন। তাঁর ইচ্ছায় সকলেই প্রস্তুত হইল। ইজি চেয়ারে করিয়া অতি সন্তর্পণে মাকে মোটর বাসে উঠাইয়া আমরা বেলা ১০টায় আলমোড়া হইতে রওনা হইলাম। মার এখনকার অবস্থা যেন শরীর নাড়িতে পারিতেছেন না, কিন্তু বাহ্য জ্ঞানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ২।৩ ঘণ্টা মোটরেই মা আবার অস্পষ্ট ভাষায় আমাকে বলিতে লাগিলেন—"ভোলানাথ বোঝে না, বলে মায়া। এ কি মায়ার কাজ? ইহা মায়ার কাজ নয়, আমার এ অবস্থা কি তোমরা আর দেখ নাই? কিছুদিন পূর্ব্বে হইতেই ত' বন্ধ কর—বন্ধ, কর, একটা শব্দ আমার বাহির হইতেছিল। তোমরা শুনিয়াছ, জ্যোতিষের অসুখের মধ্যেও কতবার শুইয়া পড়িয়াছি, আবার উঠিয়া বসিয়াছি। একবার রমনা আশ্রমে শরীরটা শুধু বসিয়াই থাকিত, উঠিতে পারিতাম না, তুমি কাঁদিয়া জ্যোতিষকে বলিলে, তারপর হইতেই জ্যোতিষ ভোরে আসিয়া আমাকে নিয়া হাঁটিত। তখন শরীরটা বসিয়া ছিল এখন আবার শুইয়া পড়িয়াছে, ইহার ত কত অবস্থায়ই চলিতেছে, ভোলানাথ না বুঝিয়া বলে এখানে থাকিলে বেশী হইবে, আমি কি মায়ায় বদ্ধ যে এই জন্য হইয়াছে?"

জ্যোতিষদাদাকে নিয়া যাওয়ার পর ভোলানাথের যে বেদনা হয়,

তখন হইতেই ভোলানাথ মৌন ভাঙ্গিয়াছেন। ভোলানাথ মার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমার ভাব দিয়া আমি বলিয়াছি। আমার খুব লাগিয়াছে, তাই আমি বলিয়াছি; তুমি যে মায়ায় বদ্ধ না তাহা কি বুঝি না। তোমার কত প্রিয়—ছোট বোন সুরবালা মারা গেল তাহাতেই তোমাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই। আরও ২।৩ কথা, মা কখনও চোখ বুজিয়া কখনও একটু খুলিয়া—আমাকে বলিতে লাগিলেন। আবার কতক্ষণ চুপ করিলেন পরে বলিলেন, "হরিরামকে বলিয়া দাও শরীরটা যেখানেই থাকে, যেন দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয় গোলমাল না হয়। যদি একান্তই কেহ যায় কয়েক মিনিট দেখিয়া চলিয়া যায়।" হরিরাম বলিল, "তাহাই হইবে। আমি ছুটী নিয়া মার কাছে থাকিব।"

আমি বলিলাম, "তোমার শরীরের এই অবস্থা আমরা কি করিয়া বিন্ধাচল যাইব? তুমি বলিলে, অবশ্য যাহা বলিবে তাহাই করিতে হইবে —কিন্তু প্রাণে বড়ই লাগিবে।" মা বলিতেছেন, "শরীরের সেবার জন্য এখন ত কত লোক আছে, তুমিত কতই করিয়াছ, এখন ঢাকার আশ্রমে একবার যাইয়া সকলকে বলিবে, আশ্রমের ভিতর যেন অন্য বিষয়ের কথা একটীও না হয়। পুরুষদের বলিবে, মেয়েদের দোষ দেখিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া যাহাতে মেয়েরা এই কাজে সাহায্য পায়, তাহাই তাহাদের করা দরকার। সকলে মিলিয়া মিশিয়া না চলিলে কিছুই হয় না। এক লক্ষ্যেই সকলের চলিতে হইবে। তাহাতেই সকলের মঙ্গল। তুমি গিয়া এই কথা বুঝাইয়া না বলিলে হইবে না। তোমারই এই কাজ। কলিকাতায় গিয়া বলিও তাহারা যে একটা স্থান করিবার কথা বলিয়াছিল যদি তাহারা একটা স্থান করেই, মেয়েদের ভিন্ন স্থান করিতে না পারে তবে, সেই এক স্থানেই ভিন্ন সময়েতে (যখন পুরুষেরা যাইবে তখন মেয়েরা নয়) স্ত্রীলোক ও পুরুষরা ধ্যান জপ, কীর্ত্তন কি পাঠ করিবে। আর যদি

কেহ (স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ) সেস্থানে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকিতে চায়, তাহার ব্যবস্থা সকলে মিলিয়া, ইচ্ছা হইলে করিয়া দিতে পারে। তাহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে। এই সব কথা তুমি সকলকে বলিয়া কাজ করাইবে। মনে করিও ইহাও সেবা। সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করা ইহাও সেবা।"

এই সব কথাবার্ত্তায় গাড়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌছিল। আমি বলিলাম, "সকলকে কি বলিব?" মা বলিলেন, "এক লক্ষ্যে, একভাবে থাকিতে বলিও।" হলদোয়ানীতে বাস আসিল; ৫টায় ট্রেন। ট্রেন আসিয়াছে, সব বন্দোবস্ত হইতেছে। নৈনিতাল হইতে দেবী দত্ত ও মুন্নী আসিয়াছে, তাহারা মার সঙ্গে দেরাদুন যাইবে। মা বলিলেন, "বাথরুমে যাইবেন" এই শুনিয়া আমাদের আরও একটু ভরসা হইল। এখন পর্য্যন্ত কিছু খাওয়ান যায় নাই। অনেক চেষ্টায় ধরিয়া উঠাইয়া বসাইলাম, শরীর একেবারে অবশ, প্রস্রাব হইল না। আবার শুইয়া পড়িলেন। ইজি চেয়ারে করিয়া ট্রেনে উঠান হইল। ট্রেনে আসিয়া আবার প্রস্রাব করিতে চাহিলে—এবার অনেক চেষ্টায় বসাইয়া প্রস্রাব করান হইল। মার আরও একটু বাহ্য ভাবের আভাষ পাওয়া গেল। চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। চামচ দিয়া মুখে একটু জল দিতেছি পড়িয়া যাইতেছে। অনেকবার চেষ্টার পর একবার গিলিলেন চোখও খুলিলেন, কিন্তু স্থির-দৃষ্টি।

রাত্রি ৯টায় বেরিলি পৌছিবে। তারপরই আমাদের মার সঙ্গ ছাড়িতে হইবে—শরীরের এই অবস্থা! মনটা আমাদের বড়ই ব্যাকুল হইল। কিন্তু উপায় নাই, আদেশ পালন করিতেই হইবে। মা আবারও ২।৪ কথা বলিলেন, আমি আবারও বলিলাম "মা কি করিয়া তোমাকে ফেলিয়া যাইব? তুমি যাহা বল, তাহাই অবশ্য করিতে

হইবে।" মা বলিলেন, "পূর্ব্বে যখন বলিয়া ফেলিয়াছি এখন যাও; হরিরামকে বলিয়া দাও, দরকার হইলে যেন তোমাকে চিঠি দেয়।" মার আদেশই মাথা পাতিয়া নিলাম, কিন্তু প্রাণে খুব আঘাত লাগিল। মা ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন, দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া বেরিলী পৌঁছিল। কত স্ত্রীলোক পুরুষ মার জন্য অপেক্ষা করিতেছে কিন্তু মার এই অবস্থা দেখিয়া আর কাহার মুখে কথা নাই, সকলেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা অতি ধীরে ধীরে মাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া নিলাম। ঘণ্টা খানেক পর দেরাছুনের গাড়ী আসিবে। মাকে ঘিরিয়া সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা ১২টার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল রওনা হইব।

মাকে কিছুই খাওয়ান যাইতেছে না। বলিলাম, "মা কাছে রাখিলে না—কিছু খাইও"; অনেক প্রার্থনার পর বলিলেন—"আচ্ছা"। বলিলাম, "আমাদের সকলের দিকে চাহিয়া শরীরটা রক্ষা করিও।" বলিলেন, "শরীর ত একদিন যাইবেই"। পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "শরীরটা থাকুক না থাকুক, নিজেদের কাজ ঠিক ঠিক করিয়া যাইও।" এই সব কথায় মার শরীর সম্বন্ধে বড়ই আশঙ্কা হইতেছে। চারিদিকের অবস্থায় মাথা এখন যেন অস্থির। নির্দ্দিষ্ট সময়ে গাড়ী আসিলে মাকে তুলিয়া দিলাম। চোখের জল ফেলিয়া নামিয়া আসিলাম।

মার দেরাছুন গমন।

মহারতনকে তার স্বামী মার সঙ্গে দেরাছুন পাঠাইয়া দিল। আমরা ষ্টেশনেই অপেক্ষা করিলাম। মার ভক্ত, কয়েকটী ছেলে রাত্রি ১২৷৷ টায় আমাদের বিন্ধ্যাচলের গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

৬ই ভাদ্র, রবিবার—আজ অনেক দিন পরে মাকে ছাড়া, বিশেষতঃ মার শরীরের যেরূপ অবস্থা, জ্যোতিষ দাদার অভাব, সব

মিলিয়া প্রাণটা হাহাকার করিতেছে, আবার শরীরের অবসন্নতা এত বেশী যে চিন্তা করিবারও বেশী শক্তি নাই। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে শুইয়া রহিলাম। বেলা ১০ টায় গাড়ী এলাহাবাদে পৌছিল। মার ভক্তদের সহিত দেখা করিয়া ১২ টার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। বেলা ২ টায় বিন্ধ্যাচল পৌছিলাম। বিরাজ মোহিনী দিদি ও অনঙ্গ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মার আদেশে এখানে আছেন। সব যেন শূন্য হাহাকার, মাকে ছাড়া হইলাম!

৯ই ভাদ্র, বুধবার—আজ হঠাৎ মাণিক, ভোলানাথ ও শঙ্করানন্দ স্বামী ও গোদাবরী সকালে কাশী হইতে আসিয়া উপস্থিত। খবর শুনিলাম মাকে নিয়া রবিবার প্রাতে সকলে দেরাদুন পৌছিয়াছেন। সোমবার ভোলানাথ মায়ের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার সন্ন্যাস নিতে ইচ্ছা হইতেছে, কে কার?" ইত্যাদি ইত্যাদি। মা নাকি অমনি বলিলেন, "আজই তবে কাশী রওনা হইয়া যাও, শঙ্করানন্দের কাছে যাইও, সময় উপযোগী যদি সহায়তা করিতে পারে।" মাণিককে মা ভোলানাথের সঙ্গে দিয়া দিয়াছেন।

শুনিলাম, মা এখন জল খাইতেছেন, কিন্তু আর কিছু খান না। কথা ঐ রকমই অল্প অল্প বলেন অবশ ভাবে শুইয়াই আছেন। পাশ কেহ ফিরাইয়া দেয়। মোটের উপর শরীরটা অবশ! কথাবার্ত্তা আবশ্যক মত বলিতেছেন। গোদাবরীকে ও রমাদেবীকে দিয়া আশ্রমের নিয়ম আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু এখন শুনিলাম গোদাবরীকে আমার কাছে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন, বলিয়া দিয়াছেন—"সেইখানেই তোমাদের খুকুনি দিদির কথামত কিছুদিন মৌন, জপ ইত্যাদি নিয়মমত করিতে থাক, বিরাজমোহিনীও আছে সকলে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও।" রমাদেবীকে দেরাদুনের আশ্রমে থাকিতে

বলিয়াছেন। নিশি বাবু ও মাসীমা (সুশীলা) রায়পুর হইতে মার কাছে আসিয়াছে শুনিলাম। দেরাতুনের সব ডাক্তারেরা মার সেবা করিতেছেন।

মা সকলকে মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তন করিতে বলেন আর সব সময় চুপ-চাপ থাকিতে বলিয়াছেন। কি করিলে কি হইবে বুঝিতেছেন না। ভোলানাথকে আবার মা মৌন হইতে বলিয়াছেন, তাই তিনি আবার মৌন আছেন। উত্তরায়ণ না হইলে সন্ন্যাস হয় না তাই মাঘ মাসের পূর্ব্বে সন্ন্যাস নেওয়া হইবে না। ভোলানাথ শঙ্করানন্দ স্বামীকে নিয়া আগ্রা হইতে বীরেন দাদাকে নিয়া মার কাছে যাইতেছেন; গোদাবরী আমাদের কাছেই রহিল। মার আদেশ মত কাজ হইতে লাগিল। টেলিগ্রাম করিয়া হরিরামের নিকট খবর পাইলাম মা একটু ভাল। ভোলানাথ আজই বৈকাল ৩ টার গাড়ীতে রওনা হইয়া গেলেন। জ্যোতিষদাদার জন্য ভাণ্ডারা দেওয়ার আলাপ হইতেছে; বাবার কাছে মা বলিয়াছিলেন, জ্যোতিষদাদার সন্ন্যাসের নাম "মৌনানন্দ" হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব জন্মেও তাঁর ঋষি ভাব ছিল।

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার—আলমোড়াতে মহারতন একটী ঘটনা জানাইয়াছিল। আমরা যখন কৈলাস রওনা হইবার সময় বেরিলি যাই, ও সন্ধ্যার সময় মাকে নিয়া বাজার করিতে গিয়াছিলাম, তখন জুতার দোকানে গিয়া জুতা কেনা হইতেছে—হঠাৎ মা দোকানদারকে বলিয়া উঠিলেন, "আমার জুতার দাম নিও না।" হাসিয়া হাসিয়া এ কথা বলিলেন, কেহ বড় গ্রাহ্য করিল না। মহারতন আমার ও মার জুতার দাম দিয়া আসিয়া যখন মোটরে উঠিতেছে মা বলিলেন "ও কি আমার জুতার দাম নিল না কি?" মহারতন বলিল, "হাঁ মা নিল, রাজি হইল না।" মা বলিলেন, "আহা ভাল করিলে না, ভাল হইবে না, এ' পয়সাটা ভিন্ন করিয়া

রাখিয়া দাও।" দোকানদার মুসলমান সে এসব কথায় বিশেষ কানও দিল না। আমাদের প্রাণে লাগিল, আমি বলিলাম "এ'কি মা 'ভাল হইবে না' কি বলিতেছ?" মা বলিলেন, "কি করিব, আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল?" মহারতন দোকানদারকে মার আদেশ বুঝাইয়া বলিয়া আসিল। আলমোড়াতে জ্যোতিষদাদার মৃত্যু সময় মহারতন গিয়া বলিল এক মাসের মধ্যেই নাকি সেই দোকানদারটা মারা গিয়াছে।

আজ রাত্রিতে নরেন চৌধুরীর স্ত্রী, যুথিকার পত্রে জানিলাম—২৪শে আগষ্ট মাকে ২।৩ মিনিটের জন্য বসান হইয়াছিল। মা কথাবার্ত্তা ভালই বলিতেছেন, তবে জল ছাড়া আর কিছুই খাইতেছেন না, বলিয়াছেন, "যখন আর কিছু খাইব, বলিব।" আগ্রার পত্রে জানিলাম বীরেনদাদাকে নিয়া ভোলানাথ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

১৩ই ভাদ্র, রবিবার—আজ প্রাতে যুথিকার পত্র আসিল—২৭।৮।৩৭ তারিখের পত্র। মার মাথায় জটার জন্য কেহ ছাড়াইতে পারিতেছিল না খানিকটা চুল আজ দেবী দত্তকে দিয়া মা কাটাইয়া ফেলিলেন। ইহা শচীবাবুর বোনের কাছে যাইবে, তুমি এখন এ' কথা আর কাহারও কাছে বলিও না। এখন কথাবার্ত্তা বেশ বলিতেছেন। আলমোড়ায় দ্বিতীয় দিন মাকে নিয়া যে কাঁদাকাটী করিয়াছিলাম, মনে আছে? কাল মা নিজে বলিলেন; সেদিন শরীরে শ্বাসের গতি গতিটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, পূর্ব্বেও ত এইরকম হতো, সেই জাতীয়। সত্যিই সেইদিন শ্বাস দেখিয়া আমাদের ভয়ানক ভয় হইয়াছিল, তাই আমরা কাঁদাকাটি করিতেছিলাম।

১৫ই ভাদ্র, মঙ্গলবার—নেপালদাদা পাঁচ দিনের ছুটী নিয়া মাকে দেখিতে দেরাদুন গিয়াছিলেন, আজ ফিরিয়া আসিতেই আমরা

কাশীধামে। তাঁহার কাছে মার খবর শুনিতে গেলাম। ৩।৪ দিন হয় আমরা কোনও কার্য্যোপলক্ষে কাশী আসিয়াছি। শুনিলাম, মা এখনও শয্যাগতই আছেন। তবে দিনের মধ্যে ২।১ বার মাকে ধরিয়া ২।৪ মিনিট বসান হয়, তাহাও অপরের সাহায্যে বসিয়া থাকেন। শরীরের নিম্নভাগ একেবারেই অবশ। দিনের মধ্যে এক পোয়া কি দেড় পোয়া শুধু জল খান, আর কোনও খাদ্য নাই। তবে, কথাবার্ত্তা বেশ বলেন। সকালের দিকে ঘরে কেহ বড় থাকেন না। একজন বসিয়া একটু আধটু যা' দরকার হয় করেন। বৈকালের দিকে বাধা সত্ত্বেও লোক সমাগম খুবই হয়। মা'ও তখন হাসিমুখে সকলকে উপদেশাদি দেন, রাত্রি প্রায় ১১টা অবধি কথাবার্ত্তা চলে।

মা এখন মধ্যে মধ্যে হাসিখুসি হইয়া কথাও বলিতেছেন। খাইতে বলিলে বলেন, "আমি ত সংকল্প করিয়া কিছু করি নাই, শরীরটা এখন চাহিতেছে না, যখনই আবার খাইতে চাহিবে, খাইব। আমার ত সময় অসময় নাই রাত্রি ১২টায় ১টায় ও যদি চায় তখন খাইব, তোমরা চিন্তা কর কেন?" মুখ রোজই ধোয়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কুলি করিয়া জল পর্য্যন্ত ফেলিতে পারেন না, শরীর এত অবশ। পাশ ফিরাইয়া দিতে মধ্যে মধ্যে বলেন। তখন নাকি কেহ অতি সন্তর্পনে ধরিলে বলেন, "এ'রকম ভয় পাও কেন? পাথর যেমন ঠেলিয়া দেয় সেইভাবে ঠেলিয়া ঠিক করিয়া দাও। শরীরটা ত পাথরের মতই হইয়া গিয়াছে।" সকলের কুশলাদি নেপালদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

জ্যোতীষদাদার মৃত্যুর ১৩ দিনের দিন, হরিদ্বারে সাধুদের ভাণ্ডারা দিবার জন্য শঙ্করানন্দ, ভোলানাথ ও মাণিক উহারা গিয়াছে। জন্মাষ্টমীর দিন মার আদেশ মত মনোহর মন্দিরে মন্মথবাবু ও ভোলানাথ যজ্ঞাদি করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই সেই নিয়মে যজ্ঞাদি হইবে বলিয়া

দিয়াছেন। আশ্রমে যাহাতে বাজে কথা ও হাসি গল্প না হয় তাহার জন্য মার আদেশ মতই নিয়ম হইয়াছে প্রাতে ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মধ্যের কীর্ত্তনের হলটাতে সকলে ধ্যান জপ ইত্যাদিতে বসিয়া থাকিবেন। সন্ধ্যায় ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সকলে সেই ঘরে কীর্ত্তনাদি করিবেন। সেইরূপই কাজ হইতেছে নানা দেশ হইতে মার ভক্তেরা সপরিবারে মাকে দেখিতে আসিতেছেন। আশ্রমে যাহাদের জায়গা না হইতেছে, নিকটে বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন। মার অস্পষ্ট কথা এখন বেশ স্পষ্ট হইয়াছে। মা সকলের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, "আমি বেশ সুস্থ আছি।" কথাবার্ত্তায়ও বেশ আনন্দের ভাব আছে। কিন্তু শরীর অবশ।

নেপালদাদা বলিলেন, "জ্যোতিষদাদার অসুখের কথা মা বেশী উঠান নাই, তবে একবার কি কথায় বলিয়াছেন—"রাস্তা হইতেই ত জ্যোতিষের অসুখ আরম্ভ হইল। তা খুকুনী এবার খুব সেবা করিয়া দিয়াছে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াও সেবা করিয়াছে।" অসুখ সম্বন্ধে মাত্র এই কথাই বলিয়াছেন, আর কোনও কথা উঠান নাই। তবে কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে ২।৩ বার জ্যোতিষদাদার নাম উঠিয়াছিল। বীরেনদা, নিশিবাবু, সুশীলা মাসীমা, দেবী দত্ত, যুথিকা চৌধুরী, সকলেই মার কাছেই আছেন। উল্লেখযোগ্য আর কোন কথা শুনিলাম না।

আমরা মার কথামতই কাশী আসিয়াছি। স্বামিজী মার আদেশ ছাড়া কোথাও যান না; যখন যেখানে থাকিতে বা যাইতে বলেন তাহাই যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি। ২।৩ দিনের মধ্যেই আমরা পুনরায় বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইব।

নেপালদাদার কাছে আর একটী কথা শুনিলাম। অম্বোটের রাজার ভগ্নীপতি, রাণাসাহেব কাশীতে থাকেন। তাহার সহিত

রাস্তায় মার দুই বার দেখা হইয়াছিল। এবার অফোটে ফিরিয়া আসিলে তাহার জনৈক বন্ধু নাকি ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন —"কি ভাই, শ্বশুরবাড়ীতে এবার নূতন জিনিষ কি দেখিয়া আসিলে?" তিনি নাকি জবাব দিয়াছিলেন, "ভাই, এবার শ্বশুরবাড়ীর পথে এমন এক জিনিষ দেখিয়াছি যাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না।" বন্ধু বলিলেন, "কি দেখিয়াছ?" রাণাসাহেব বলিলেন এক বাঙ্গালী মাতাজী—নাম 'আনন্দময়ী মা'—তাহাকে দেখিয়াছি। ভাই, তাঁর চোখ দুটীর কথা আমি ভুলিব না, যেন ভিতরের সব কাড়িয়া নেয়। এমন জিনিষ আমি আর কখনও দেখি নাই।" রাণাসাহেবের এই বন্ধুটী কাশীর খ্যাতনামা ডাক্তার গোপাল দাস মহাশয়, তিনিই এই কথা নেপালদাদাকে বলিয়াছেন।

এ কথা শুনিয়া আমার কলিকাতার রামতারণবাবুর কথা মনে হইল, তিনি পত্রে লেখেন, "আমি বিলা মন্দিরে দূরে দাঁড়াইয়া মাকে দেখি, কারণ লোকের ভীড়ে নিকটে যাইবার উপায় নাই। কি সুন্দর মূর্ত্তি, দেখিয়া দেখিয়া যেন আমার তৃপ্তি হয় না। কত স্ত্রীলোক কত সাজসজ্জা করিয়া মার চারিদিকে বসিয়া আছেন, কিন্তু মার রূপের কাছে তুলনাই হয় না। নিরাভরণা মা আমার, কিন্তু তবুও যে কত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার নিয়া বসিয়া আছেন—কি যে মূর্ত্তি, দেখিতে দেখিতে আমি মুগ্ধ হইতাম; আমার প্রাণের ভাব আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না।" আরও কতজনে এইভাবের কত কথা বলিয়াছেন।

ইহা ত বাহিরের সৌন্দর্য্যের কথা। বাহিরের দিক দিয়া মা এমন কিছু অপ্সরা-সুন্দরী নন, কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিতে মিশান সেই মূর্ত্তি যে অতুলনীয়। মানব কি করিয়া ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিবে?

তাই অনেক ভক্তই তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে গিয়া মৌন হইয়া গিয়াছেন —চোখের জলেই শুধু সেইভাব কিঞ্চিত প্রকাশ পাইয়াছে। আমার এসব কথা যে অতিরঞ্জিত নয়, তাহা যিনি মাকে দেখিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন ; কখনও সেই চোখ দুটী জ্ঞানের প্রতিভায় উজ্জ্বল-স্থির-ধীর, আবার কখনও ভাবের নেশায় ঢল ঢল, আবার কখনও ঠাট্টা করিয়া বলেন "বহুরূপী"। কিন্তু ঠাট্টা নয় সত্যিই যে মা আমার বহুরূপিণী।

নেপালদাদার কাছে আরও শুনিলাম, মা বেলা ৯৷৷৹।১০টায় চোখ খোলেন। তারপর সকলে মুখ ধোয়াইবার ব্যবস্থা করেন। এইজন্য বেলা ৯টা বাজিলেই ২।৪ জন সেই ঘরে গিয়া কেহ হয়ত পায় হাত বুলাইতে সুরু করে, কেহ হয়ত একটু শব্দ করে যাহাতে মা চোখ খোলেন। তাই মা একদিন বলিলেন, "আমি যখন নিজে চোখ খুলিব, তখনই তোমরা আসিও, এর পূর্ব্বে কেহ আসিও না।" পরদিন হইতে তাই হইল। সেদিন মা ১০৷৷৹টায় চোখ খুলিয়া বলিলেন, "পাশ ফিরাইয়া দাও।" তখন সকলে ঘরে গিয়া মুখ ধোয়াইয়া একটু জল খাওয়াইয়া দিলেন। মা জল খাওয়াইবার পর প্রায়ই বলেন, "উঠাইয়া বসাও"। একজনে ধরিয়া বসাইয়া পিঠের দিকে ধরিয়া বসিয়া থাকেন। ৪।৫ মিনিট বসিবার পর মা আবার শুইয়া পড়েন। তখন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন। বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হয়। পরে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মাকে একা চুপ চাপ বিশ্রাম দেওয়া হয়। ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা অবধি লোক সমাগম খুব হয়। তখন মা বেশ কথাবার্ত্তা বলেন কোনরূপ ক্লান্তির ভাব দেখা যায় না।

একদিন নাকি মা হাত দুইখানি চিৎ করিয়া শুইয়া আছেন হঠাৎ নেপাল দাদার চোখ একখানি হাতের উপর পড়িল। নেপালদা

দেখিলেন + চিহ্ন রহিয়াছে, তাই নেপালদা বলিয়া উঠিয়াছেন তোমার হাতে একটা ক্রশ চিহ্ন রহিয়াছে। মা নাকি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহার পাশে ত্রিশূলও রহিয়াছে। আবার অন্যহাত বাড়াইয়া বলিলেন, "দেখ, এই হাতে ধনুর্ব্বাণও রহিয়াছে।" নেপালদা দেখিলেন কথিত মত ত্রিশূল ও ধনুর্ব্বাণের রেখা মার হাতে রহিয়াছে, আর একটা ধ্বজার চিহ্নও হাতে দেখা গেল।

মার হস্তে ক্রশ, ত্রিশূল ও ধনুর্ব্বাণ চিহ্ন।

আরও শুনিলাম, আমরা যখন ঢাকা গিয়াছিলাম, তখন ঢাকার পাশ করা একটী ডাক্তারকে নাকা জ্যোতিষ দাদা সাধন ভজনের সাহায্য করিবার জন্য দেরাদুন হরিরামের কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহার নাম সুশীল। সেই ছেলেটী দেরাদুন আশ্রমে আছে, মা তাহার প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখিতেছেন। তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে উপরে মৌন সাধনার ঘরে বসিয়া সে সাধন ভজন করিবে। বৈকালে উঠিয়া আহারাদি করিবে। রাত্রিতে আর কিছুই আহার করিবে না। সে আদেশ মত সাধন ভজন করিতেছে। সেই মৌন সাধনার ঘর (যে ঘরে বৎসাশন পাতা হইয়াছে) বন্ধই থাকে কেহ সে ঘরে যায় না। শুধু যিনি মৌন ভাবে সাধন করিবেন তিনিই নীরবে গিয়া সেই ঘরে ধ্যান করিতে পারিবেন।

১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার—আমরা আগামী কল্য বিন্ধ্যাচল রওনা হইব। আজ গোপীবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম, মার খবর গোপীবাবুকে বলিবার জন্য নেপালদাও সঙ্গে গেলেন। গোপীবাবু আগ্রহভরে মার প্রতিদিনের খবর সব শুনিলেন। গত সোমবার জ্যোতিষ দাদার ভাণ্ডারা দিবার জন্য, শঙ্করানন্দ স্বামী ভোলানাথ ও মাণিক হরিদ্বার গিয়াছেন। কিন্তু ভাণ্ডারা হইয়াছে কিনা নেপালদা খবর পাইয়া

আসেন নাই। কারণ সোমবার রাত্রিতেই তিনি রওনা হইয়া আসিয়াছেন। গোপীবাবুও আমাদের মতই অনুমান করিয়া বলিলেন—হয়ত ভাণ্ডারার পর মা খাইবেন। তখন আমি বলিলাম, "জ্যোতিষদাদার মৃত্যুর পর ত মা দুইবার খাইয়াছেন।" তখন গোপীবাবু বলিলেন, "তাইত! তবে ত ভাণ্ডারার পরই যে খাইবেন এ কথাও বলা চলে না। ইঁহারা কি জন্য যে কি করেন, কিছুই বলা চলে না, তবে আমরা বাহিরে দেখিয়া অনুমান করি, হয়ত জ্যোতিষবাবুর মৃত্যু উপলক্ষ্যেই মার এই ভাবটা হইয়াছে। অবশ্য আমাদের এই অনুমানের কিছু মূল্য নাই।" আমি বলিলাম, "মা ত এই কারণে এই হইয়াছে ইহা স্বীকার করেন না বরং কেহ বলিলে প্রতিবাদই করেন।" গোপীবাবুও বলিলেন, "তা ত ঠিকই, আমাদের অনুমান মাত্র।" আমি ইহাও বলিলাম, 'এই যে অনাহার, ইহাও ত মার কিছু নূতন নয়, অনেক দেখিয়াছি। এই ভাবে পড়িয়া থাকাও নূতন নয়। তবে অনেক দিন এই ভাবটা হয় নাই, আর জ্যোতিষদাদার মৃত্যুতে আমাদেরও মনটা দুর্ব্বল হইয়াছে। তাই ভয় হয়।"

১৮-ই ভাদ্র, শুক্রবার—আজ আমরা বিন্ধ্যাচল আসিয়াছি। আসিয়া যূথিকা দেবীর, ভোলানাথের ও মাণিকের পত্র পাইলাম। নূতন খবর বিশেষ কিছু নাই। মা অনেকটা ভাল, এখন নিজেই পাশ ফিরিতেছেন, সমস্ত শরীর নাড়াচাড়া করিতে পারেন। এখনও জল ছাড়া আর কিছুই খান না, তবে কথাবার্ত্তা বেশ বলিতেছেন। আলমোড়ায় ৺জ্যোতিষদাদার উদ্দেশ্যে ভাণ্ডারা দেওয়া হইবে, তাহার ভার দেবী দত্তের উপর দেওয়া হইয়াছে। মায়ের গায়ের জামা কাটিয়া খোলা হইয়াছে; এক টুক্‌রা কাপড় গায় জড়াইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়াছেন, "এখন জামা খোলা ও পরা মুস্কিল,

বিন্ধ্যাচলে।

উঠিলে জামা পরিব, এখন এই ভাবেই থাক্।" তাঁহাদের শেষ চিঠির তারিখ ১৬ই ভাদ্র।

নেপাল দাদার মুখে শুনিলাম, মা কৈলাস-যাত্রা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, বাবারই (স্বামী অখণ্ডানন্দের) শ্বাস কষ্ট খুব বেশী হইয়াছিল। তাহাতে নেপাল দাদা বলিলেন, "তাঁহার ত বহু পূর্ব্বেই হার্টের দোষ ছিল।" মা বলিলেন, "না, বাবার কিন্তু হার্টের কিছু দোষ হয় নাই, উপরে যাওয়ায় শুধু শ্বাস-কষ্টই হইয়াছিল, আবার নীচে নামিয়া আসিতেই সে কষ্টটা ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে লাগিল। হার্টের কিছু ক্ষতি হয় নাই। বাবাজি যে এতদিন শ্বাসের ক্রিয়া করিতেছে তাহার কি একটা ফল হয় নাই? সেই জন্যই এত পরিশ্রমেও হার্টের কিছু ক্ষতি হইতে পারে নাই।" বাবার যে পূর্ব্বে হার্টের দোষ ছিল তা মার আদেশ মত ক্রিয়া করিয়া তিনি খুব ফল পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মা বলিয়াছিলেন, "এই ভাবে শ্বাসের ক্রিয়া আর কাহাকেও বলি নাই, শুধু তোমাকেই বলা হইতেছে এবং তুমিও নিয়মমত করিতেছ। হয়ত তোমার অতীতে এই সব সংস্কার ছিল, তাই তোমাকেই বলা হইতেছে।"

সত্যই বাবা পূর্ব্বেও এই সব ক্রিয়া করিতেন, কিন্তু ঠিকমত উপদেশ না পাইয়া কাজ করায় খারাপই হইতেছিল। মা ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা ব্যক্তিকে নানা ভাবের উপদেশ দেন কিন্তু তাহা বড় গোপনে বলেন। মা বলেন, "যাহার কথা শুধু তাহার কাছেই বলা হয়, অপরের শুনিবার দরকার নাই।" তাই ক্রিয়াদি সম্বন্ধে আমাকে বা অপরকে যাহা বলিয়াছেন, কোন কথাই লেখা হয় নাই, হইবেও না। ইহা ছাড়াও অনেককে হয়ত অনেক কথা বলিয়াছেন কিন্তু গোপন রাখিতে বলিয়াছেন, সে সব কথাও প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

২১শে ভাদ্র, সোমবার—আজ বৈকালে বীরেন দাদার ১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার লিখিত এক পত্র পাইলাম। তিনি দেরাদুন হইতে স্বামীজীকে লিখেছেন—"মা আজ সকালে আঙ্গুরের রস গ্রহণ করিয়াছেন। আসিয়া যে অবস্থা দেখিলাম তাহাতে ভয়ই হইয়াছিল; যাহা হউক, এখন পরিবর্ত্তন খুব শীঘ্র শীঘ্র হইতেছে; আগে হাত, পরে পা নাড়িতে আরম্ভ করেন। পরশু কোমরেও একটু জোর পান এবং নিজেই পাশ ফিরিতে আরম্ভ করেন। আজ বাথরুমে হাঁটিয়া গিয়া মুখ ধুইয়াছেন। এখন দুই ঘণ্টা পর পর একটু একটু দিয়া যাইব, অবস্থা বুঝিয়া ক্রমশঃ আহার পরিবর্ত্তন করা যাইবে। আশা হয় মা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এবং শীঘ্রই স্বাভাবিক হইয়া উঠিবেন। ইচ্ছা আছে, কল্য আমরা চাঁদা করিয়া ২/০ মণ আন্দাজ মিঠাই গরীবদের ডাকিয়া খাওয়াইব। আর কোনও চিন্তা করিবেন না ইত্যাদি।"

ভোলানাথের ১৮ই ভাদ্র, শুক্রবারের লিখিত চিঠিতে লিখিতেছেন, "আজ একটি শুভ সংবাদ দিতেছি। আজ আপনাদের মা বীরেনের হাতে ভাত খাইল। বীরেন ভাত পাক করিয়াছিল, ছবির মা শুক্ত ও কুমড়ার ভোগা সিদ্ধ করিয়াছিল। আজও একটু হাঁটিয়া হাত মুখ ধুইয়াছেন। আমি, মাণিক ও শঙ্করানন্দ হরিদ্বার গিয়াছিলাম। শ্রীমৎ মঙ্গলগিরির ওখানে ৩৭ জন পরমহংসের ভাণ্ডারা দেওয়া হইয়াছে। অন্য একটি ধর্ম্মশালায় দণ্ডী ব্রহ্মচারী ও বিদ্যার্থীদের ভাণ্ডারা দিয়া গতকল্য আসিয়াছি। গিরি মহারাজ বেশ লোক, ইত্যাদি।" মা শুক্লা ত্রয়োদশী বৃহস্পতিবার ৩রা ভাদ্র শুইয়াছিলেন, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শুক্রবার ভাত খাইলেন। ১৭ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার মা উঠিয়া বসিয়াছেন।

২২শে ভাদ্র, মঙ্গলবার—আজ প্রাতে ভোলানাথের চিঠিতে জানিলাম, মা ১৮ই ভাদ্রের পর হইতে নিয়মিত রূপে

খাওয়া দাওয়া করিতেছেন। এবং এই প্রায় ১৮ দিনের দিন থাইতেছেন।

২৫শে ভাদ্র, শুক্রবার—প্রায়ই মাণিকের পত্রে মার খবরাদি পাইতেছি। মা ভালই আছেন। সামান্যই খান। মাত্র পায়খানায় যাওয়ার সময় হাঁটেন, আর বসিয়াই থাকেন। প্রাতে টমেটোর ঝোল ও তরকারী খান। রাত্রে একটু দুধ ও রুটি দেওয়া হয়। কলিকাতা, মোরাদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে ভক্তেরা গিয়াছেন।

৩রা আশ্বিন, রবিবার—ভোলানাথ ও মাণিকের পত্রে জানিলাম, মা যুথিকা চৌধুরী ও মাণিককে দেরাদুন হইতে চলিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়াছেন। মার আবার একটু পেট ব্যথা হইতেছে, খাওয়া দাওয়া সামান্যই করিতেছেন। তাহাতে শরীর আবার খারাপ হইতেছে। এখন মেয়েদের মধ্যে সুশীলা মাসীমা ও রুমা দেবী মার কাছে আছেন। লক্ষ্মী দেবীও আশ্রমে আসিয়া আছেন। তিনিই সম্প্রতি মাকে রান্না করিয়া খাওয়াইতেছেন। ইতিমধ্যে কালী প্রসন্ন কুশারী মহাশয় ও নলিনী বাবু (বেবীদির স্বামী) মারা গিয়াছেন, খবর পাইলাম।

১৫ই আশ্বিন, শুক্রবার—মা এখন ভালই আছেন খবর পাইতেছি। কলিকাতা, কাশী ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত পূজার বন্ধ উপলক্ষ্যে মার কাছে যাইতেছেন। মা এখনও বসিয়াই থাকেন। বেশী হাঁটিবার কথা বলিলে বলেন, "এখনও হাঁটিবার ভাব নাই, ভাব হইলে হাঁটিব। রুমা দেবীর বেশ একটু ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। খবর পাইলাম তিনি নাম করিতে করিতে অনেক সময় অজ্ঞানের মত পড়িয়া যান।

মা এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, রুমা দেবী বলিয়াছিল—"সেবাদি অনেক

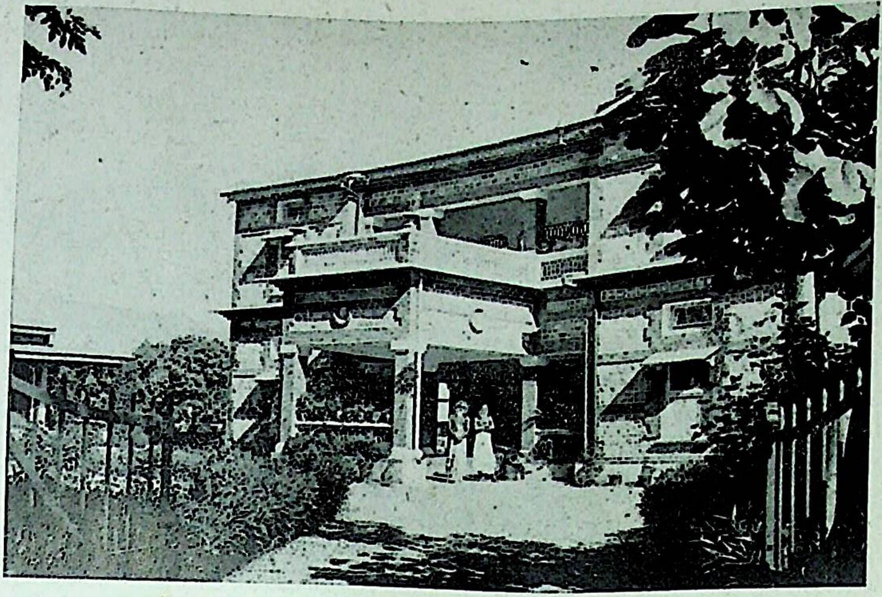

কিষণপুর আশ্রম—দেরাদুন

করিলাম। আশ্রমেও অনেক কাজ করা হইয়াছে, কিন্তু আমি শান্তি পাই নাই। তাই, মার সঙ্গে আসিয়াছি, এখন মার আদেশ মত একান্তে একটু নিজের কাজ করিব।" এই ভাব নিয়াই সে আসিয়াছিল। ইহার ভাবটা বেশ ভাল। যাক্ মার কৃপায় অতি শীঘ্রই তাঁহার এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত।

২৮শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, (বিজয়া দশমী)— কোনও কারণে আমরা আজ কয়েক দিন হয় কাশী আসিয়াছি। এখান হইতে বাচ্চু ও তাহার মা মাতৃ দর্শনে দেরাতুন গিয়াছে। এবার দুর্গা পূজা ২৫শে আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অষ্টমী তিথিতে রাত্রি প্রায় ৪টায় আমরা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। রাত্রি প্রায় ৩টা হইতেই দর্শনার্থীরা ১০৮ বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রদক্ষীণ সুরু করিয়াছেন ; স্ত্রী, পুরুষের জন্য মধ্যে রেলিং দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের এই ভাবটা আমার বেশ সুন্দর লাগিল। আরও কয়েকটা মন্দিরে গেলাম। সব মন্দির খোলা হয় নাই, কিন্তু দর্শনার্থীর দল ভীড় করিয়া দরজায় বসিয়া আছেন। মন্দিরের দরজা খোলামাত্র দেবতা দর্শন করিয়া যাত্রীর দল আবার অন্য মন্দিরে চলিয়াছেন।

এখনও বেশ অন্ধকার। আমরা পূজার পরই বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইব স্থির ছিল, হঠাৎ আজ দেরাতুন হইতে শচীবাবুর টেলিগ্রাম পাইলাম— বাবাকে লিখিতেছেন, "মা নবমী রাত্রিতে হরিদ্বার যাইতেছেন। আপনি দিদিকে নিয়া হরিদ্বারে মার সঙ্গে দেখা করুন।" আজ সুবিধামত গাড়ী না পাইয়া আমরা কাল রওনা হইব স্থির করিলাম।

৯

পঞ্চম অধ্যায়

২৯শে আশ্বিন, শুক্রবার—আজ আমরা বেলা ১১টায় হরিদ্বার রওনা হইলাম।

৩০শে আশ্বিন, শনিবার—সকালবেলা নানকী বাইর ধর্ম্মশালায় উঠিয়া দেখি মা সকলকে নিয়া তথায় আসিয়াছেন। আমরা যখন পৌঁছিলাম, মা তখন শুইয়াছিলেন। আমরা ঘরে যাইতেই মা বলিলেন, 'টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে'? চোখ বুজিয়া বুজিয়া এই কথা বলিতে বলিতেই আবার কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

হরিদ্বারে আসিয়া মার দর্শন। নর্ম্মদা যাত্রা।

দেরাতুন হইতে মার সঙ্গে বাবা ভোলানাথ, ভ্রমর, শঙ্করানন্দ, অসীমানন্দ, দাদামহাশয়, দিদিমা, সুশীলা মাসীমা, নিশীবাবু, রমা দেবী, বাচ্চু, ও তাহার মা, শচীবাবু, সতীশবাবু, অবনীবাবু এবং আরও অনেক কাশ্মীরী ভক্তেরা আসিয়াছেন। নানীর পুত্রের (মনকেশ্বর রয়না) সমস্ত পরিবার আজ দুই মাস যাবৎ মার সঙ্গে আছে। তাহারাও আসিয়াছে। নরেন বাবু সপরিবারে আসিয়াছেন, মাণিকও আছে।

সকলের মুখে শুনিলাম, মা মন্মথবাবুর আহ্বানে নবমী পূজার দিন পূজা দর্শন করিতে বাঙ্গালীদের হরিসভায় যান; তথা হইতে আনন্দচকে কাশীবাবুর বাড়ী যান। সেখানে গিয়াই বলিলেন, 'যখন বাহির হইয়াছি, এখন আর আশ্রমে যাওয়া হইবে না। ৩টার গাড়ীতে সব হরিদ্বার যাইবার জন্যই প্রস্তুত হও।" এত লোক; কাহারও

খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই, তাই মাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ৬টার গাড়ীতে হরিদ্বার যাওয়ার মত করান হইল।

৬টার গাড়ীতে সকলে হরিদ্বার আসিয়া পড়িলেন। ভক্তেরা মাকে ঘিরিয়া বসিল। মাকে মুখ ধোয়াইয়া একটু জল খাওয়াইতে নেওয়া হইল, তখনই কথায় কথায় আভাস পাওয়া গেল, মা হয়ত শীঘ্রই হরিদ্বার ছাড়িতেছেন। জল খাইয়া উঠিয়াই অখণ্ডানন্দ স্বামীজিকে বলিলেন, "কৈলাস হইতে আসিয়া ত মঙ্গলানন্দ গিরির সঙ্গে দেখা কর নাই, চল আমরা এখনই যাই।" মার এ কথা শোনামাত্রই ভক্তবৃন্দও সব সাজিলেন। প্রায় আট দশ খানা টাঙ্গা করিয়া সকলে কন্‌খল্, গিরি মহারাজের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরি মহারাজ তখন খাওয়া দাওয়া করিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছিলেন। এই অবস্থায় কেহ গেলে তিনি বড় অভ্যর্থনা করেন না, দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়েন। কিন্তু মাকে দেখিয়া বসিবার আসন বিছাইয়া দিলেন এবং সকলকে বসিতে বলিলেন। কথায় কথায় মাকে বলিলেন, "তুমি না আসিলে আমি শুইয়া পড়িতাম, আর কাহারও জন্য দরজা খোলা রাখিতাম না।" সেখানে প্রায় ঘণ্টা খানেক আনন্দ করিয়া মা আবার সকলকে নিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিলেন।

দেরাদুন হইতে হরিরাম, লছমী; আলমোড়া হইতে শ্রীনিবাস প্রভৃতি আসিয়াছেন। তাহার কিছু পূর্ব্বেই বেলা প্রায় ১১টায় মা অসীমানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া আমাদের সকলের নিকটেই বলিতেছেন, "তুমি না নর্ম্মদা নিয়া যাইতে চাহিয়াছিলে? নর্ম্মদার গাড়ী কয়টায়?" তিনি বলিলেন "রাত্রি ৯১টায়।" মা বলিলেন, "চল"।

তখনই ভক্তদের মধ্যে কে কে যাইবে স্থির হইয়া গেল। সকলের যাওয়া হইবে না কারণ কাহারও কাহারও স্কুল ও অফিস খুলিয়া গিয়াছে। অনেকে কলিকাতা ও কাশীর দিকে ফিরিলেন। আমরা অনেকেই

(প্রায় ১৫ জন) মার সঙ্গে নর্ম্মদার দিকে রওনা হইলাম। রাত্রি ১১টার গাড়ীতে আমরা রওনা হইলাম। ময়মনসিংহের জ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে মার দর্শনে দেরাদুন গিয়া দর্শন না পাইয়া হরিদ্বারে আসিয়া দর্শন পাইলেন। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে দিল্লী পর্য্যন্ত চলিলেন। দিল্লীতে পঞ্চুবাবু ও পঙ্কজবাবু সস্ত্রীক মার দর্শনে ষ্টেশনে আসিয়াছেন।

৩১শে আশ্বিন, রবিবার—আজ সকাল ৭টায় দিল্লী পৌছিলাম, রাত্রি ২টায় বরোদা পৌছিলাম। তথা হইতে মোটরে ৪ মাইল দূরে ষ্টেশনে গিয়া রাত্রি কাটাইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, নির্জ্জন স্থান। ষ্টেশনটি সহরের বাহিরে। শচীদাদা, নরেন বাবু (প্রফেসার) প্রমুখ সকলেরই স্থানটী বড়ই মনোরম বোধ হইয়াছিল। তথায় বাকী রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিলাম।

১লা কার্ত্তিক, সোমবার—আজ সকালে ৭টায় নর্ম্মদার গাড়ীতে উঠিয়া ৮॥টায় আবার গাড়ী বদল করিয়া বেলা প্রায় ৯॥০।১০টায় নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী চান্দোদ পৌছিলাম। অসীমানন্দের এই স্থান পূর্ব্ব-পরিচিত। তাঁহার মুখে মার নাম শুনিয়া অনেকে মাকে দর্শন করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নর্ম্মদা-তীরে চান্দোদে বিষ্ণু-মন্দিরে গমন।

আমরা ষ্টেশনে পৌছিলে দেখিতে পাইলাম একটী খেলনা-বিক্রেতা অনেক খেলনা ঠেলা গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মা গিয়া সেই গাড়ীর কাছে দাঁড়াইলেন। আমি বলিলাম, "কি চাই, বল।" এই বলিতে বলিতেই শ্রীযুত নরেন চৌধুরীর স্ত্রী যুথিকা দেবীও সেখানে গেলেন। তিনি একটা খেলনা তুলিয়া মার হাতে দিলেন, সেটা দেখিতে অনেকটা গদার মত, :একটা "ঝুনঝুনী।" মা অমনি

বলিলেন, "গদা ত হইল; শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম।" আমি অমনি চক্রের মত একটা খেলনা উঠাইয়া মার হাতে দিলাম, মা ধরিয়া রহিলেন। পরে ভোলানাথ একটা কড়ির খেলনা মার হাতে দিলেন। মা চুপে চুপে আমাকে বলিলেন, "শঙ্খের বদলে কড়ি হইল।" তখন আমি পদ্মের পরিবর্ত্তে একটী গোল ফুলের মত খেলনা মার হাতে দিলাম। যূথিকা দেবী দুইটী ছোট ছোট বালতি ও আরও একটী খেলনা দিলেন। মা মহানন্দে তাহা নিয়া চলিলেন।

একটু দূরে গিয়া আমরা দাঁড়াইলাম, মা তখন কাহার কোনটা ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করিয়া এক একটা খেল্না এক এক জনের হাতে দিলেন। সেই খেলনাগুলি প্রায় সবই বাজে; তাহা বাজাইয়া বাজাইয়া শচীবাবু নরেনবাবু প্রভৃতি সকলে নাম আরম্ভ করিতেই চারিদিকে অনেক লোক তামাসা দেখিতে দাঁড়াইয়া গেল। মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা দেখিতেছি লোক জমাইয়া তুলিলে।" এই সব কাণ্ড করিয়া আমরা অসীমানন্দ স্বামীর নির্দ্দেশ মত চলিলাম।

খানিকটা হাঁটিয়া যাইতে হয়। অসীমানন্দজী ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে বিষ্ণুদাস মন্দিরে মাকে উঠাইলেন। সেইখানেই থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে অসীমানন্দ স্বামী আসিয়া এখানেই ছিলেন। গিয়া দেখি ইহা একটী বিষ্ণু মন্দির। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে একজন স্বপ্নে একটী ছোট বিষ্ণু-মূর্ত্তি পাইয়া এখানে স্থাপিত করেন। পরে বর্ত্তমান বড় বিষ্ণু-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বেশ বড় মন্দির, একজন মোহন্ত ও কয়েকজন সেবায়েৎ আছেন। মন্দির সংলগ্ন আরও কয়েকটী প্রকোষ্ঠ আছে। উপরে আমাদের থাকিবার স্থান দেওয়া হইল। ঘরগুলি খুব বড়, মেজেগুলি মাটির।

সকলে নর্ম্মদায় গিয়া স্নান করিয়া আসিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ পাইলেন।

বেশ ভাল ভাত, তরকারী, পুরী, মোহনভোগ ও আচার প্রসাদ দিল! শুনিলাম এখানে যাত্রীদের প্রসাদ দেওয়া হয়। বিস্তৃত জমীদারী আছে, তাহার আয়েই সব চলিতেছে। কাহাকেও ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। সকল সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা ও গৃহস্থরা যতদিন ইচ্ছা এখানে অবস্থান করিতে পারেন। মন্দিরে অনেক বিদ্যার্থীও আছেন, সকলকেই প্রসাদ দেওয়া হয়। খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মা'ও একটু বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। ম'ার চেহারাটা বেশ রুগ্ন। এতদিন হাঁটেন নাই, এখন হাঁটিতেছেন। তবে বাহিরের দিক হইতে কোনও অসুখ নাই। মা মন্দিরে আসিয়া বলিলেন, "দেখ বিষ্ণু মন্দিরে যে আসিব তাহা ত আমরা আগে শুনি নাই। কিন্তু বিষ্ণু মন্দিরে আসিতেছি তাই ষ্টেশন হইতেই শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মের খেলা উঠিয়াছিল।"

গাড়ীতে আসিবার সময় কয়েকটী কথা হয়। তাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া লিখিতেছি। নরেনবাবু বলিলেন, "মা এক জায়গায় আছে ভগবান বলিতেছেন, "আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, ভক্তি দিতে কাতর হই।" ভক্তিই বড় এই ভাবটা প্রকাশ করিলেন। মা বলিলেন 'শুদ্ধা-ভক্তি', ইহা ভিতরেও আছে, তাঁকে পাবার আশায় সাধন করে যাও, সব মিমাংসা তিনি হৃদয়ে ফুটিয়ে দেন। একটা ছাড়া আর একটা নাই।"

আবার মা বলিতেছিলেন, "একজন কাশ্মীরী স্ত্রীলোক 'মা মা' কীর্ত্তন করে বলিয়া অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি ত শক্তির উপাসক নও, তবে মা মা কর কেন? এই কথায় তাহার খট্‌কা লাগে কিন্তু সে আসিয়া আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পায় না। লক্ষ্মীকে (কাশীবাবুর স্ত্রী, দেরাদুন) দিয়া আমাকে :এই কথা বলিয়া

পাঠাইল। তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "দেখ, যদি তোমার ভিতর এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা থাকে যে আমি রাম বা কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত; আমি সে নাম ছাড়া আর কিছুই করিব না, তবে তোমার তাহাই করা দরকার। তাহাতেই সব আছে। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ভগবানকে ত কেহ মাতা, কেহ পিতা, কেহ সখা বলিয়া ডাকে। যাহার যে ভাব ভাল লাগে, সে সেই ভাবে ডাকিতে পারে। সেই হিসাবে 'মা' বলিয়া ডাকিলেও তাঁহাকেই ডাকা হয়, দোষ হয় না। এই কথার পর তাহার খট্‌কা ভাঙ্গিয়া যায়।"

শচীদাদা অনেক দিন পূর্ব্বে গম্ভীর নাথ বাবাজীর জীবনীর একটি ঘটনা পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে বাবাজী নর্ম্মদা তীরে কয়েক দিনের জন্য আসন পাতিয়াছিলেন। একটী সাপ রোজ তাঁহার কাছে আসিত। তিনি বলিয়াছিলেন সাপটীর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিলেই বাবাজীর সমাধি হইয়া যাইত। সেই স্থানে একটী সাধু ১২ বৎসর তপস্যা করিতে ছিলেন। তিনি কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে গম্ভীরনাথ বাবাজী সেখানে আসিয়া আসন করিয়াছিলেন। যখন সেই সাধুটী ফিরিয়া আসিয়া বাবাজীর মুখে শুনিলেন যে একটী সাপ রোজ তাঁহার কাছে আসে, তখন সাধুটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই সর্পের দর্শনের জন্য আমি আজ ১২ বৎসর এখানে তপস্যা করিতেছি, কিন্তু দর্শন পাই নাই; আর আপনি কি ভাগ্যবান আসিয়াই তাঁহার দর্শন পাইলেন।" এই ঘটনা পড়িবার পর হইতেই শচীদাদার নর্ম্মদা দর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল।

শচীদাদা আজ সকালে গাড়ীতে যখন হঠাৎ একটু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তখন মা বলিয়া উঠিলেন, "কি, তুমি যে একেবারে চুপ চাপ গম্ভীরনাথ বাবাজী হইয়া বসিয়া আছ।" কথাটীতে শচী

দাদার প্রাণে কেমন একটা ভাব জাগিল ; তিনি মন্দিরে আসিয়া মাকে বলিলেন, 'মা, তোমার এই কথাটীতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। আমার যেন মনে হয় তুমি আমাকে আজ গম্ভীরনাথ বাবাজীর কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই হঠাৎ ঐ কথা বলিয়াছিলে। বাস্তবিক তাঁহার জন্যই যে আমার এই নর্ম্মদা আসার ইচ্ছা জাগিয়াছিল, আজ নর্ম্মদার তীরে আসিয়া তুমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিলে। মা একটু হাসিলেন।

রাস্তায় রাস্তায় এইরূপ কত ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অবতারের অবতরণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এক হিসাবে ত সকলেই অবতার। আর যদি তাহা ছাড়িয়া দাও, তবে কোনখান হইতে অবতরণ হয়? ইহার উত্তরে বলা যায় নির্গুণ ও সগুণের প্রকাশ। সগুণ ও নির্গুণের যুগবৎ প্রকাশই অবতার। যেমন গাছের অঙ্কুর, সেই অঙ্কুর হইতেই গাছপালা হয় অঙ্কুরাবস্থায় কিন্তু গাছের রং ও প্রকৃতি ধরা যায় না। বীজ মাটির সঙ্গে মিলিয়া থাকিলে অঙ্কুর জন্মে ও ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে গাছপালা ফুল ফল বাহির হয়। সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের যুগপৎ প্রকাশ হইতেই অবতার। তাই অবতারের মধ্যে দুই ভাবেরই খেলা দেখা যায়। আবার দেখ, সমুদ্রের উপরের অংশটা কেমন তরঙ্গময়। কিন্তু ভিতরের অংশে সেই তরঙ্গ নাই,—প্রশান্ত গম্ভীর। সেইরূপ অবতারের মধ্যে চল ও অচল দুই ভাবেরই খেলা চলে।"

অবতারদের মধ্যে ভাবের খেলা।

আমি প্রশ্ন করিলাম—'কখনও কখনও দেখা যায় তোমার কৃপায় রোগ সরিয়া গেল। তোমার শরীরেও ভোগ হইল না। রোগ যদি কোথাও প্রকাশ না পাইল, তবে কোথায় গেল? রোগীর কর্ম্মফল ত কাহাকেও ভোগ করিতেই হইবে। জগাই-মাধাইয়ের পাপ গ্রহণ

করিয়া চৈতন্যদেব কালো হইয়া গেলেন।" মা বলিলেন—"দেখ, কখনও কখনও দেখিয়াছ রোগ এ শরীরে আসিয়াছে। আবার রোগ এক শরীর হইতে অন্য কাহারও শরীরে দিয়ে দেওয়া যায়, নিজে রাখিতে হয় না। রোগ কখনও এই শরীরে সামান্য প্রকাশ পাইয়াছে। আবার কখনও তার চিহ্নও দেখা যায় নাই। এর কারণ, যেমন ধর আগুন, সে সবই ভস্ম করিয়া দিতে পারে, এতটুকু চিহ্নও রাখে না, সবই যে সম্ভব।

দীক্ষার কথায় প্রশ্ন করিলাম—"তোমার যে দীক্ষা হইয়াছে বলা হয়,—কেন বলা হয়? ইহাতে কি বিশেষ কিছু লাভ হইয়াছে?" মা বলিলেন, "কোনও প্রয়োজন ছিল না, তবে আবার সবই যেমন শরীরটায় খেলিয়া যাইতেছে, এ'ও যে সেরূপ। তাই ঝুলনের দিন যখন এইরূপ একটা কিছু হইয়া গেল, তখন ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল, 'দীক্ষা হইয়াছে'—আমি বলিলাম হ্যাঁ। ছেলে বেলায় গাছপালার সঙ্গে কথা হইত। কত রকমের শব্দ যে এই শরীরটা দিয়া বাহির হইত। তারপর স্তোত্রাদি বাহির হইতে দেখিয়াছ। দীক্ষাও তেমনি, ভিতর হইতে নিজে নিজেই প্রকাশ পাইল। সব যেমন বাহির হইয়া গিয়াছে এও তেমনি হইয়া গিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা মা, এই যে তুমি কত সময় বল, শরীরটা পড়িয়াছিল, আমি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছিলাম। বোধ হয় দরকার আছে, তাই তোমাদের ইচ্ছায় আবার শরীরের কোন স্থান দিয়া ফিরিয়া আসা সম্ভব হয়। কোথায় যায়? যেমন এখানে হয়ত কোন প্রয়োজনে আসিয়াছ? সেখানে যাওয়ারও কি সেইরূপই কারণ থাকে?" মা বলিলেন, "দেখ, নানারকম আছে, শরীরের ঊর্দ্ধ বা অধোভাগ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়া যায়, আবার নবদ্বারের যে কোন

দ্বার দিয়া বাহির হওয়া যায়। আবার আছে, সব স্থান দিয়াই বাহির হওয়া যায়, যেমন পায়ের আঙ্গুল, লোম, চুলের গোড়া ও চুলের ভিতর দিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রের যে কোন স্থান দিয়াই বাহির হওয়া যায় ; সবই ত অনন্ত, ইহাও অনন্ত।"

আমি বলিলাম, "এই যে কোথায় চলিয়া যাও, ইহা কি ঊর্দ্ধলোক হইতে কেউ নিতে আসেন না, নিজেই কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাও ?" মা বলিলেন, "কখনও কখনও ডাকিয়া নিয়া যায়, এই যেমন তোমরা নিয়া যাও, আমি যাই। আবার কত সময় দেখিয়াছ, আমি বসিয়া কথা বলিতেছি, কেহ আমাকে ডাকিতেছে না, আমি হঠাৎ উঠিয়া অপর একস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে হয়ত এমন কিছু ঘটিতেছিল, যাহা আমার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা হইতেছিল, আমি হঠাৎ যাইতে রহস্য প্রকাশ হইয়া গেল। এই যে মঙ্গলগিরির আশ্রমে হঠাৎ গেলাম, সে ত ডাকে নাই, কিন্তু আমি গেলাম এরও প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন থাকে বলিয়াই ক্রিয়া সব হইয়া যায়। সে তোদেরই প্রয়োজন, অপ্রয়োজন। কিন্তু বাহিরের দিক দিয়া হয়ত কিছুই বোঝা যায় না।" আজ মন্দিরে কি কথায় কথায় উঠিল, জানা আছে। ভোলানাথ ও মা দুই জনেই তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, "যাহা না, তাই জানা" অর্থাৎ এই যে প্রপঞ্চ-বিলাস যাহা আমরা জানিবার যোগ্য বা জ্ঞেয় মনে করিয়া বলি, আমরা ত জানি, সেই জ্ঞেয় জগৎ কিছুই নয়—অর্থাৎ অসৎ।

২রা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার। আজ আমি দরজা বন্ধ করিয়া মা ও ভোলানাথকে একান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের দীক্ষার যথাযথ ঘটনা আমি শুনিতে চাই। এই কথা পরম পাবন—জগতের কল্যাণকর। এখন আপনাদের দুই জনের নিকট হইতে আমি যদি

মা ও ভোলানাথের দীক্ষার বিবরণ।

ইহার যথাযথ বিবরণ না শুনি, আর কে ঠিক ঘটনা আমাদিগকে শুনাইবে?" তখন দুই জনের মুখ হইতে দীক্ষার নিম্নোক্ত বিবরণ শুনিলাম।

ভোলানাথ সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে, দীক্ষা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া জল খাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া কাছারীতে চলিয়া যান। মা ভোলানাথকে ২।৩ বার ডাকাইয়া পাঠাইলেন; কিন্তু বাবা আসিলেন না। শেষে মা বলিয়া পাঠাইলেন, "বল গিয়া যদি তিনি না আসেন তবে আমিই কাছারী যাইব।" লোকটী গিয়া ভোলানাথকে তাহাই বলিল, ভোলানাথ মাকে জানেন, কি জানি তিনি কি করিয়া বসেন। কাছারী আসিয়া উপস্থিত হওয়াও বিচিত্র নয়। এই সব ভাবিয়া ভোলানাথ বাসায় আসিয়া দেখেন মা পায়চারী করিতেছেন ও তাঁহার মুখ দিয়া স্তোত্র-মন্ত্রাদি বাহির হইতেছে। ভোলানাথ আসিতেই মা তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিলেন এবং তাঁহার পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রখানি আনিয়া দিলেন। ভোলানাথ স্নান করিয়া আসিলে মা ও ভোলানাথ আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মা'র মুখ হইতে একটী বীজমন্ত্র উচ্চারিত হইল। মা ভোলানাথকে ঐ মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন ও আবশ্যকীয় যাহা যাহা সব বুঝাইয়া দিলেন। তদবধি ভোলানাথ তাহা জপ করিতে লাগিলেন, ইহার পর হইতে ভোলানাথকে বৃথা মাংসাদি খাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। শুদ্ধ পবিত্রভাবে থাকিতে বলিলেন, তিনিও সেইভাবে চলিতে লাগিলেন। এইভাবে ভোলানাথের দীক্ষা হইয়া গেল।

ভোলানাথের দীক্ষার কাহিনী এমন দ্বিধাহীন পরিষ্কারভাবে অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ আজ দুই জনের মুখেই ইহা শুনিয়া ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। দুই জনের নিকটই মার দীক্ষার কথা উঠিল, এ বিষয়ে মা শ্রীমুখে যাহা বলিলেন লিখিতেছি—"ধর, প্রথমতঃ, বাবা মা'ই গুরু। একদিন বাবা বলিলেন হরির নাম

করিলে ভাল হয়। অনেক দিন পরে সেই হরির নাম করিলাম—তাহার ফলে, কীর্ত্তন-কালে শরীরে যে সব ক্রিয়া হইয়া যাইত, তোমরা শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ। তারপর ধর বিবাহ যখন দিল, স্বামী গুরু, শরীরের মা বলিয়া দিল। যখনই যাহাকে গুরুর স্থানে বসানর খেলাটা এ' শরীর খেলিয়াছে বলিয়া জানিয়াছি, তখনই তাহার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপিয়া দেওয়া হইয়া যাইত; নিজের স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছারই খেলা হইত না। গুরু যাহা বলেন, তাহা বিনা বিচারে শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত। আমার, যখন হরির নামে ঐ রকম শারীরিক ক্রিয়াদি হইতে লাগিল, তখন একদিন ভোলানাথ বলিলেন, "দেখ আমরা বৈষ্ণব ত নই, হরি নামে তোমার এ সব হওয়া ঠিক নয়। আমরা শৈব, কাজেই আমাদের পক্ষে ইহা ঠিক নয়।" মা শিশুর মত ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে আমি কি করিব? জয় শিব শঙ্কর, ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর বলিব?" ভোলানাথ একটু জোর দিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ তুমি তাহাই কর।" মা'ও অমনি বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই করিব।" তখন ত বাহ্য-সূত্রে বীজাদি জানিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তাই মা ঐ নামই করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় একদিন মা নাকি ভোলানাথকে বলিলেন, "আমি মাটিতে বসিয়া কাজ করি?" (রাত্রিতে মা বিছানাতেই নিজের ভাবে বসিয়া থাকিতেন) ভোলানাথ বাধা দিতেন না, মা তখন হইতে মাটিতেই নাম করিতে বসিতেন। মা বলিতেছেন, "হরি হর যে একই; তাই পূর্ব্বে কীর্ত্তনে যে শারীরিক ক্রিয়াদি হইয়া যাইত এই নামে তাহা আরও বাড়িয়া গেল" এইভাবেই সম্ভবতঃ ১৩২৯ সনের শ্রাবণ মাসে ঝুলন পূর্ণিমার দিন রাত্রি ১২ টার মধ্যেই মা'র ভিতর হইতেই দীক্ষাদি আপনা আপনিই হইয়া গেল।

মা বলিলেন, "এই জন্যই আমি প্রথম হইতে সকলকে বলি, "যাহার যে নাম ভাল লাগে সে তাহাই করিতে থাক। গুরুর আদেশ বিনা বাক্যে পালন করিয়া যাও। নিজেকে তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া যাও। নিজের কোন ইচ্ছাই বড় করিয়া তুলিও না, দেখিবে আপনা হইতে সব ফুটিয়া উঠিবে: কলিযুগে সরল সোজা নাম-সাধনেই সব হয়—ইহা ও ত কথা আছে। তোমরা ভাবিও না যে সংস্কৃত শব্দে দীক্ষা না হইলে ভগবানকে ডাকা যাইবে না এবং কোন কাজই হইবে না। এ শরীরকেও ত দেখিতেছ এবং কথা শুনিতেছ। ইহাই কি কেবল কথা? দরকার মত সব নিজে নিজেই আসিয়া যাইবে। বলিয়াছি ত রেজিষ্টারি খাতায় নাম লিখাইতে হইলে ভাল নাম চাই। তোমার যে নাম ভাল লাগে করিয়া যাও। দরকার মত সব আসিয়া যাইবে। "বীজ" অর্থ বিশেষ পরিচয়; যেমন তোমার নাম জানা আছে আর কিছু পরিচয় জানা নাই কিন্তু নাম ধরিয়া ডাকিলেই কাছে আসিলে, তাহার সব পরিচয়ই পাওয়া যায়।"

"গুরুর আদেশ বিনা বাক্যে পালন করিয়া যাও।" কলি-যুগে নাম সাধনেই সব হয়।

আবার বলিতেছেন, "এইজন্য জ্যোতিষকে একবার বলিয়াছিলাম, তোমাদের আশ্রমে কীর্ত্তনের পূর্ব্বে "জয় শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম হর হর" এই নাম কয়টা করিয়া নিতে পার। জ্যোতিষ তখন কীর্ত্তনের পূর্ব্বে ঐ নাম কয়টা সকলকে করিতে বলিয়া দিল। অন্নপূর্ণার মন্দিরে আরতির সময় এই নাম আজও হয়। কি জন্য বলিলাম, তাহা হয়ত জ্যোতিষকে খুলিয়া বলা হয় নাই।" মা দেখাইলেন, "নামের মধ্যে বীজ আছে। তবেই না নাম করিতে করিতে বীজ স্ফুরিত হয়। বীজের মধ্যেও নাম আছে; সবের মধ্যেই সব; যে ভাবেই যাহা ধরিয়াই হউক

প্রকাশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাহা হয় একটা কর, বৃথা সময় ও শ্বাস নষ্ট করিও না। যাহা করিবে তাহাতেই ফল হয় সেরূপেই সেই একেরই প্রকাশ।" মা বলিলেন "হরি ও হর একই। আবার আলাদাও।" আবার 'মা মা' শব্দ প্রথম মার মুখ হইতেই বাহির হয়। কাজেই আমরা দেখিতেছি, মা'র মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশও নাই বা ছিল না। এ সব কথা এত দিন গোপন ছিল। আজ একান্তে মা ও ভোলানাথের শ্রীমুখে এই সব শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। দুই জনেরই চরিত্রের অসাধারণত্ব ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কথায় কথায় আরও একটি বিশেষ কথা বাহির হইল—ঘটনাটা এই, অদ্যাবধি জগতে যত অবতার বা মহাপুরুষ আসিয়াছেন সকলেরই একটি বিরুদ্ধ দল ছিল বলিয়া শুনা যায়। মা'রও আছে; মা বলেন, তাহা অঙ্গের ভূষণ। এইরূপ একটি দল ভোলানাথের নিকট মার নিন্দা-সূচক চিঠি পাঠায়। মা ও ভোলানাথ তখন দেরাদুনে। ভোলানাথ তাহাদিগকে এই জবাব দেন, "আমি তাঁহাকে (মাকে) ১২ বৎসর ১০ মাস বয়সে বিবাহ করিয়াছি, আজ পর্যান্ত তাহাকে পূর্ণ ব্রহ্মচারিণী বলিয়াই বিশেষভাবে জানি। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা কখনও দেখি নাই, তাই আমি নিঃসন্দেহে তাঁহাকে জগতের সকলের কাছে ছাড়িয়া দিয়াছি।" ভোলানাথের নিকট হইতে এইরূপ স্পষ্ট ক্ষুরধার জবাব পাইয়া বিরুদ্ধবাদীরা অনেকেই শান্ত হইয়া যায়। তাহাদের অনেকেরই মনের সংশয় ঘুচিয়া যায়। ভোলানাথের সুন্দর সরল ভাবের জন্য আমরা মা'র কত অসাধারণ লীলার খবর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। আজও মা'র এই পরিচয় পাইয়া চরিত্রের অসাধারণত্বের আরও একটি ইঙ্গিত পাইলাম। সামান্য কয়টি কথায় যে কত বড় একটী চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিবেন সন্দেহ নাই।

মা নিজে প্রয়োজনরহিতা, যাহা কিছু প্রকাশ ভক্তদের জন্যই।

তাই মা বলেন "যাহা দরকার, মাত্র তাহাই এই শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া গিয়াছে। আমার ত কিছুরই প্রয়োজন নাই হয়ত তোমাদের প্রয়োজন ছিল, তাই সাধনার দিকটাই বিশেষভাবে এই শরীরে হইয়া গিয়াছে। এই যে যোগ-ক্রিয়াদি শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, আমার নিকট সেগুলি ঠিক ছেলেবেলার খেলা-ধূলার মতই। কোনও পার্থক্য বোধ হয় নাই।" মার মুখে এই সব কথা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া যাইতে লাগিলাম। এই সব কথা এ ভাবে কে বলিতে পারে! আমরা যে তাহা ধারণাই করিতে পারি না। এত বড় একটা শক্তিকে নিয়া আমরা খেলা-ধূলাই করিয়া গেলাম। তিনিও আমাদের ভাবে যোগ দিয়াই আমাদের সঙ্গে কত ছেলেখেলাই করিতেছেন ও করিয়াছেন!

বেলা প্রায় ১টা। দরজা খুলিয়া দিলাম। মা আজ সকালে উঠিয়া জলযোগ করিয়াই ভোলানাথের স্যুটকেস নিয়া তামাসা করিয়া তাঁহাকে ক্ষেপাইতে লাগিলেন। ভোলানাথের ভাবটাও এখন শিশুর মত সরল। উভয়ের এই ভাবের লীলা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ। মা যে কত ভাবে; কত খেলা করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! আজ বেলা প্রায় ৩টায় খাওয়া দাওয়া হইল। বিষ্ণু মন্দিরেই প্রসাদ আসিল। আজ কোজাগর লক্ষ্মী পূর্ণিমা, দেখিলাম এখানেও কিছু কিছু নিয়ম পালন করা হয়। ঠাকুরের আজ বিশেষ পূজা করা হয়। এখানকার গুজরাটী ভাষা আমরা ভাল বুঝি না। অসীমানন্দজীর কয়েক জন শিষ্য (এই দেশের) মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মাকে আহমেদাবাদ, নর্ম্মদার তীরে ও অন্যান্য স্থানে নিয়ে যাইবেন বলিলেন। মার এক কথা—"আমার ত কিছু ঠিক নাই যাহা হইয়া যায়।"

বৈকালে প্রায় ৫টায় আমরা নর্ম্মদা বক্ষে নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইলাম। তীরবর্ত্তী মন্দিরাদির ইতিহাস বলিতে বলিতে স্বামী অসীমানন্দ চলিলেন। শুনিলাম, অদূরে সাধুদের বহু 'কুটীরা' আছে, তাহাতে অনেক সাধু বাস করেন। প্রায় ৪০ মাইল ঊর্দ্ধে শূলপাণেশ্বর; তথায় চক্রতীর্থে ডুব দিলে শিব-লিঙ্গ পাওয়া যায়। নর্ম্মদা-তীরে বরোদা ষ্টেটের ধর্ম্মশালা ও শিব-মন্দির আছে, নর্ম্মদেশ্বরীর মন্দির আছে। একটী শিব মন্দির দর্শন করিয়া আমরা এক সাধুর আশ্রমে চলিলাম। আশ্রমের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া উপরে আশ্রমে গেলাম।

নর্ম্মদা-ভ্রমণ ও মন্দিরাদির বিবরণ।

এই আশ্রমের বর্ত্তমান মোহন্তর নাম কৈলাসানন্দ : তাঁর গুরু কেশবানন্দ, তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ। এই ব্রহ্মানন্দই দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুরু। বালানন্দ ব্রহ্মচারী এখানেই প্রায় ৫০ বৎসর ব্রহ্মচারী-জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ ও কেশবানন্দের প্রকাণ্ড ৩ খানি প্রতিমূর্ত্তি দেয়ালে টানান দেখিলাম। আশ্রমে শিবমন্দির এবং একদিকে যাত্রীদের থাকিবার ধর্ম্মশালা আছে। তাঁহারা মাকে মোহন্তের থাকিবার ঘরে নিয়া গেল, আমরাও সঙ্গে গেলাম। দেখিলাম এক রাজসিক ব্যাপার! সাধারণ বড লোকের ঘরেও এই রকম আসবাব-পত্র থাকে না। মার সঙ্গে মোহন্তের কিছুকাল কথা হইল। প্রসাদ পাইবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করিলেন, অস্বীকার করায় সকলকে দুধ আনিয়া দিলেন। কোজাগর লক্ষ্মী পূর্ণিমা বলিয়া সত্যনারায়ণ ও চন্দ্রের পূজা হইতেছে, নবান্ন ভোগ দেওয়া হইতেছে। নবান্নের প্রসাদও সকলকে দিল। দেখিলাম এই গুজরাটীদের মধ্যে বাংলাদেশের কয়েকটী প্রথা প্রচলিত আছে। এই সব আশ্রমকে 'কুটীরা' বলে। একদিন

তাঁহাদের কুটীরায় প্রসাদ নিবার জন্য মোহন্তজী বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন।

আমরা রাত্রি প্রায় আটটায় নৌকায় ফিরিলাম—তখন নর্ম্মদায় বেশ একটা ভাব জাগিতেছিল। মা নৌকায় গান ধরিলেন, "হরিনামের তরী বাঁধ ভাই।" আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। স্থান, কাল, পাত্র সবই মধুর। আমরা রাত্রি প্রায় ১০টায় বিষ্ণুদাসের ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। মা অনেকক্ষণ বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। এখানেও আজ ঠাকুরকে বাহিরে আনিয়া সাজাইয়া কীর্ত্তন ও আরতি করিতেছিল। রাত্র প্রায় ১০৷৷টায় সকলে ভোগের প্রসাদ পাইলেন। কাল নৌকায় নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী ব্যাস, অনসূয়া প্রভৃতি স্থানে যাওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। এখানে নাকি রাত্রিতেই নৌকায় যাতায়াত বেশী হয় কারণ নৌকার উপরে কোন আবরণ নাই, রৌদ্রে যাতায়াত কষ্টকর হয়। আজ রাত্রি প্রায় শেষ করিয়া আমরা শয্যায় আশ্রয় নিলাম। মা'ও তখনই শুইলেন।

৩রা কার্ত্তিক, বুধবার—আজ সকালে মা অনেক বেলায় উঠিলেন। এই মন্দিরের মোহন্তটীর কোন রকম বিলাসিতার ভাব দেখা যায় না, খুব সাধারণভাবেই থাকেন। এই মঠের সকলেই আমাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন।

ব্যাসে গমন।

কোন অসুবিধা নাই। শুনিলাম, সকল ধর্ম্মের লোকেরাই এখানে আসিয়া আশ্রয় পায়। আজ বৈকাল প্রায় চারিটায় আমরা নৌকায় ব্যাস যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যাবেলা ব্যাসে পৌছিলাম; বেশ নির্জ্জন স্থান। দ্বীপের মধ্যে কয়েকটী মন্দির ও আশ্রম আছে। নর্ম্মদার এক দিকে ব্যাস অপর দিকে শুকদেবী। আমরা ব্যাসে গিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে উঠিলাম। সেখানে একজন সস্ত্রীক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ (গুজরাটী)

আছেন। সকলেরই স্থানটি বেশ ভাল লাগিল। ভোলানাথ বেড়াইতে বেড়াইতে অগ্নিহোত্রীজির কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে খাদ্য-দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। মন্দিরের পূজারিণী তবুও কোন প্রকারে একটু খিচুড়ী করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রিতে ঐস্থানটী বড়ই ভাল লাগিল। আতাফলের গাছে স্থানটী পূর্ণ বলিলেই হয়। রাত্রি এখানেই কাটান হইল। মার খুব গলা ব্যথা হইয়াছে, শরীর অসুস্থ।

৪ঠা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—নর্ম্মদায় স্নানাদি করিয়া ব্যাস দেবের তপস্যার স্থান দর্শন করিয়া, আমরা তাঁহার স্ত্রী অনসূয়া দেবীর স্থান দেখিতে চলিলাম। বেলা প্রায় ১টায় তথায় পৌঁছিলাম। এখানেও মন্দিরাদি আছে। প্রবাদ আছে, এই স্থানের মাটি গায়ে মাখিলে কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য হয়, তাই অনেক কুষ্ঠ রোগী এখানে থাকে। তাহাদের একটা হাঁসপাতালও এখানে আছে। একজন বাঙ্গালী সাধু এখানে একটী সুন্দর কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সেই কালীমূর্ত্তিটীও এখানে আছেন। অনসূয়া দেবীর মন্দির আছে। একটী প্রকাণ্ড বট গাছ আছে। আমরা বেলা ১১টায় তথা হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৭টায় চান্দোদ পৌঁছিলাম। কাহারও খাওয়া দাওয়া হয় নাই। মন্দিরে ভোগাদির পর রাত্রি প্রায় ৯টায় সকলে প্রসাদ পাইলেন। সকলেই মাকে নিয়া মহা আনন্দে দিন কাটাইতেছেন। শচীদাদা প্রমুখ সকলেই বলিতেছেন, আজ যেন ক্ষুধার উদ্রেকই হইল না। কি এক শক্তিবলে এত কালের অভ্যাসও সকলে অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন।

শ্রীঅনসূয়া দেবীর মন্দিরে গমন।

৫ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—বেলা ৪টার গাড়ীতে আমরা মা'র

সহিত আহমেদাবাদ রওনা হইলাম। তথা হইতে ৩।৪ জন মাকে নিতে আসিয়াছে। আমরা বরোদা ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইলাম। বরোদা সহরটি বেশ সুন্দর সজ্জিত। আমরা সকাল ৭টায় আহমেদাবাদের ট্রেন ধরিব।

৬ই কার্ত্তিক, শনিবার—আজ প্রাতে ৭টার গাড়ীতে বেলা প্রায় ১।টায় আহমেদাবাদ পৌছিলাম। এখানে স্বামী অসামানন্দের কয়েক জন শিষ্য আছেন; স্বামিজীর মুখে মার কথা শুনিয়া অনেক শ্রদ্ধালু ভক্ত মার ফটো পূজা করিতেছেন। আজ মা আসিবেন শুনিয়া অনেকে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। মার গলায় ফুলের মালার বোঝা জমিয়া উঠিল। আমরা ষ্টেশনের নিকটেই একটী ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। অনেকেই মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। গুজরাটী ভাষা আমাদের জানা নাই, কাজেই কথাবার্ত্তার বড় অসুবিধা হইতেছিল। তবে ইহারা কিছু কিছু হিন্দি বোঝেন, তাহা দিয়াই কোন প্রকারে কাজ চলিতেছিল। অসীমানন্দজী কিছু কিছু গুজরাটী ভাষা শিখিয়াছেন।

আহমেদাবাদ আগমন।

এখানকার লোকদের বেশ সরল ভক্তি বিশ্বাস দেখিলাম। একটি স্ত্রীলোক প্রায় ২ মাস হইল স্বপ্নে নিয়ত মার দর্শন পাইতেছিলেন ও মার অভয়-বাণীও শুনিতেছিলেন। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। মাকে, এমন কি আমাদের অনেককেই, তিনি স্বপ্নে পরিষ্কার দেখিয়াছেন, বলিলেন। আমাদের দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। চান্দোদ হইতেই মার গলায় বেদনা, এই স্ত্রীলোকটী নাকি তাহাও বলিতেছিলেন এবং কবে মা আসিতেছেন, তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। মাকে পাইয়া এ মেয়েটী আর ছাড়িতে চাহেন না। সমস্ত দিন মার কাছেই বসিয়া আছেন।

সন্ধ্যার সময় অসীমানন্দ স্বামীজী মা ও আমাদিগকে সরস্বতী

নদীর ওপারে গান্ধী-আশ্রমের সন্নিকটে তাঁহার এক ভক্তের বাড়ীতে নিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে সন্ন্যাসীদের আশ্রম দেখিয়া আসা হইল। এখানে বহু সন্ন্যাসী থাকিবার ব্যবস্থা আছে। বেশ ৩।৪টী বড় বড় দালান। আমরা এই সব দেখিয়া আবার ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম। এখানকার একটী কবিরাজ মাকে আনিতে চান্দোদ গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টা অবধি অনেকেই বসিয়া রহিলেন, পরে মার বিশ্রামের কথা বলাতে সকলে উঠিয়া গেলেন। ২।৩ জন রাত্রিতে ধর্ম্মশালায় রহিয়া গেলেন।

৭ই কার্ত্তিক, রবিবার—মা ভোরে উঠিয়াছেন। শচীদাদা আজ কলিকাতা যাইতেছেন, মার সঙ্গে একান্তে কি কথা বলিলেন। সন্ধ্যা বেলায় ঢাকার হরিদাস সাধু ও তাঁহার সঙ্গীয় একটী সাধু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা সকলকে নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শয়ন করিলেন।

৮ই কার্ত্তিক, সোমবার—সন্ধ্যা বেলায় কয়েক জন ভদ্রলোক মার উপদেশ শুনিতে আসিয়াছেন। প্রথমে কিছুকাল কীর্ত্তন হইল, ভোলানাথ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনাদির পর সকলে মার উপদেশ শুনিতে বসিলেন। মার গলায় খুব বেদনা; কিন্তু সেদিকে খেয়াল না করিয়া মা প্রায় ঘণ্টা-খানেক সকলের সঙ্গে আলাপ করিলেন। সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন।

স্থানীয় লোকদের গুজরাটি ভাষায় মার উপদেশবাণী ছাপাইবার ব্যবস্থা।

এখানকার লোকেরা গুজরাটী ভাষায় মার উপদেশ ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মার সহজ, সরল উপদেশ-বাণী ইঁহাদেরও প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় শ্রীযুত আম্মালাল নামে একজন গুজরাটী ভদ্রলোকের মেয়েরা আসিয়া মাকে তাঁহাদের বাড়ী

নিয়া গেলেন। তাঁহাদের বাগানে মাকে এবং সঙ্গীয় সকলকে বসাইলেন। জলখাবারের সব আয়োজন করিয়াছেন। ইহাদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা, গোশালা প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। তাঁহাদের অতিথিশালায় থাকিবার জন্য মাকে অনেক অনুরোধ করিলেন; কিন্তু মা বলিলেন, "আমরা কয়দিন এখানে থাকিব, কিছুই ঠিক নাই; যদি থাকি, তবে দেখা যাক কি হয়।" মেয়েরা বেশ সদ্‌ভাবাপন্ন। ইহাদের ধর্ম্ম বিষয়ক কি কি প্রশ্ন আছে। সে জন্য কল্য প্রত্যূষে আসিয়া মাকে নিয়া যাইবে, স্থির হইয়াছে। রাত্রি প্রায় ১॥টায় মা ও সকলে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

৯ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—ভোরে গুজরাটী মেয়েরা আসিয়া মাকে ও আমাকে নিয়া গেলেন। আমরা অনেক দূর মোটরে গেলাম। একস্থানে মোটর দাঁড় করাইয়া মেয়েরা মার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। গুরুর আবশ্যকতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন, "জন্ম হওয়ার পর হইতেই ত গুরু করিতেছ; **বাপ, মা, শিক্ষক, এমন কি যাঁহার নিকট হইতে কোন একটী বিষয় জানিতে পারিয়াছ, সবই ত গুরু।** সব কাজের জন্যই একটা উপলক্ষ্য চাই যে কোন জ্ঞান লাভ করিতে চাও গুরুর প্রয়োজন।"

গুরুর প্রয়োজনীয়তা।

আবার প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন, "**কর্ম্ম না করিলে কিছুই হইবে না, কর্ম্ম করা চাই। অশুদ্ধ বন্ধন কাটাইতে হইলে শুদ্ধ বন্ধনে পড়িতে হয়।** যেমন কাপড়ে গেরো দিয়াছ, সেটি খুলিতে হইলে তাহার মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়া হাত দিয়া খুলিতে হইবে। সব কাজই এই রকম, ইত্যাদি।"

কথাবার্ত্তার পর বেলা প্রায় ৮টায় আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। দুইটী

পার্শি মেয়ে এখানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছেন। তাঁহারা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। কলিকাতার ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের নিকট নাকি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন ভাল মহাত্মা দর্শন করিয়াছেন কি?" উত্তরে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমি অনেক মহাত্মা দর্শন করিয়াছি তবে ঢাকার আনন্দময়ী মাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছি। আমার মনে হয়, তিনি পূর্ণ অবস্থায় স্থিত আছেন।"

সেই কথা শুনিয়া এই মেয়ে দু'টীর মাকে দর্শন করিবার বড়ই আকাঙ্খা হইয়াছিল। আজ দর্শন পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। একটী মেয়ে মাকে বলিলেন, "মাতাজি, আমার কোনরূপ প্রতীক উপাসনা ভাল লাগে না। আমার মন স্থির করিবার উপায় কি?" মা অমনি উত্তর দিলেন, "বেশ, তুমি শান্তভাবে বসিয়া যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে থাক, আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। শ্বাস-প্রশ্বাসই তোমার প্রতীক।" মেয়েটী শুনিয়া বড়ই আনন্দিতা হইল। আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা হইলে তাহারা বেড়াইবার জন্য মাকে মোটরে নিয়া গেল।

আজ এখানকার অনেকে মিলিয়া মার ভোগ দিতেছেন। যাঁহারা ভাষা পর্য্যন্ত বোঝেন না অথবা কিছু কিছু হিন্দি মাত্র বোঝেন, সেই সব স্ত্রী পুরুষও মার মূর্ত্তি দেখিয়াই সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া মানিয়া নিতেছেন।" সকলেই বলিতেছেন, "আমরা মাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বেলা প্রায় ১২টায় মা গান্ধী-আশ্রম ও অন্যান্য স্থান দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ভোগাদি হইয়া গেল। রাস্তা হইতে মা বলিয়া আসিয়াছেন, আজই আহমেদাবাদ ত্যাগ করিবেন। সকলে থাকিবার জন্য খুব অনুরোধ করিতেছেন। আজ অনেক বড় বড় লোক মার খবর পাইয়া দর্শনে আসিয়াছেন। আজই চলিয়া যাইবেন শুনিয়া

তাঁহারা বড়ই দুঃখ করিতেছেন। অম্বাশঙ্কর বৈদ্যরাজ, এবং অন্যান্য সকলে কতপ্রকারে মা ও সঙ্গীদের সেবা-যত্ন করিতেছিলেন। এত শীঘ্র মা চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া ইঁহারা সকলেই কত দুঃখ করিতেছেন।

শ্রীযুত কান্তিলাল ও রতিলাল দুই ভ্রাতা এখানকার প্রসিদ্ধ ধনী। তাঁহারাও মাকে রাখিবার জন্য কত বিনয় করিয়া অনুরোধ করিতেছেন।

আহমেদাবাদ হইতে বরোদা যাত্রা।

পার্শী মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় আসিয়া, আজই মা চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া মাকে থাকিবার জন্য কত অনুরোধ, কত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মা হাতযোড় করিয়া হাসি মুখে সকলকে বুঝাইয়া রাত্রি ৯টার গাড়ীতে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমরাও বুঝাইয়া বলিলাম, মার খেয়াল হইলে শত অসুবিধা সত্ত্বেও কথার নড়-চড় হয় না। আরও বলিলাম, মা কখন যে কোথায় যাইবেন বা থাকিবেন, কিছুই ঠিক নাই। হয়ত কেহ মাকে দেখিতে মোটরে আসিয়াছেন, মা তখনই কোন গাড়ী আছে কি না খবর নিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমাকে এই গাড়ীতেই ষ্টেশনে নিয়া চল',—এই ভাবেও রওনা হইয়া যান। আজও আমাদের বলিতেছেন, "দেখ গাড়ীর সময় যেন চলিয়া না যায়, আজই যাওয়া চাই।" ইহার অর্থ কিন্তু সাধারণভাবে কিছুই বোঝা যায় না। এখানে মাত্র ২।৩ দিন আসিয়াছেন, থাকিবার জন্য সকলের এত আদর-অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মা বরোদা রওনা হইলেন, অথচ তথায় গিয়া কোথায় থাকিবেন তাহারও স্থিরতা নাই। সকলে বলিলেন, "মা, আজ রাত্রিতে না গিয়া কাল সকালে গেলে অনেক সুবিধা হইত।" কিন্তু মা হাসিয়া বলিলেন, "যাহা হয় একটা হইবেই; না হয় ষ্টেশনে থাকা যাইবে। যখন বলিয়া ফেলিয়াছি তখন আজই যাইব।" শত বাধা-বিঘ্নও মার এইরূপ খেয়ালে বাধা দিতে পারে না।

অনেকে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কত কাপড়-চাদর-মালা মার চরণে পড়িতে লাগিল। গুজরাটীরা সকলে মিলিয়া মার স্তোত্রাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। শৈলেনবাবু সপরিবারে আসিয়াছেন।

গাড়ীর সময় হইয়া আসিল অথচ টঙ্গা আসিতেছে না। ঘর ভর্ত্তি লোক মার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। মা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শৈলেনবাবু মা, ভোলানাথ ও আমাদের ২।৪ জনকে নিজের মোটরে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলেন। পরে ধীরে ধীরে সকলে আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। আসিবার দিন সকলে অপরিচিত ছিলেন; আজ এই ৩।৪ দিনেই কত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া মা চলিয়া যাইতেছেন। দলে দলে লোক ট্রেনের কাছে মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অসংখ্য লোক মাব মুখের বাণী শুনিবার জন্য, মার মুখ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছে। ইহারা ফুলের মালায় মালায় মাকে ঢাকিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। আমরা মালা খুলিয়া উপস্থিত সকলের গলায় দিতে লাগিলাম। অসীমানন্দজী এখানে রহিয়া গেলেন। এইভাবে আহমেদাবাদের লীলা শেষ করিয়া মা বরোদা চলিলেন। মাকে আবার আসিবার জন্য স্থানীয় ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এইস্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত, এঁদের ভাষাও আমরা বুঝি না, তবুও মার কৃপায় এ স্থানে আমরা যে প্রাণঢালা সেবাযত্ন লাভ করিলাম, তাহা বহুদিন স্মরণ থাকিবে। মার দু' চারটী উপদেশ পাইয়া ইহারা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। মা কিছুদিন বরোদায় থাকিলে, অনেকে তথায় যাইবেন বলিতেছেন।

আমরা রাত্রি ৯টায় বরোদা রওনা হইলাম। কোথায় উঠিব, কিছুই ঠিক নাই। ধর্ম্মশালায় থাকিবার সুবিধা নাই, গতবার দেখিয়া আসা

হইয়াছে। বরোদা ৩॥৹ ঘণ্টার রাস্তা। বৈদ্যরাজের ছেলে বলদেও আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা বরোদা পৌঁছিলাম। আশ্চর্য্যের ব্যাপার একটী ভদ্রলোক পূর্ব্বেই আসিয়া আমাদের জন্য ধর্ম্মশালা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মশালায় সাধুদের থাকিবার জন্য একটী প্রকাণ্ড হল আছে। বেশ সুন্দর ধর্ম্মশালা। ইহার নাম চিমনলাল মাণিকলাল ধর্ম্মশালা। আমরা আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। দাদামহাশয় ও দিদিমা আমাদের সঙ্গেই আছেন।

১০ই কার্ত্তিক, বুধবার—রাত্রিতে মার ছোটবেলার একটী গল্প শুনিলাম। মা তখন খুব ছোট। চার পাঁচ বছরের হইবেন। গ্রামে কবিগান শুনিয়া আসিয়া বাগানের মত স্থানে, বৃক্ষতলে স্থিরভাবে বসিয়া গান করিতে-

মায়ের পূর্ব্বকথা

ছেন,—উচ্চারণও ঠিক হয় না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোর চোখের জল পড়িল কেন?" পুনঃ পুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, মা তখনি হাসিয়া সকলকে ভুলাইয়া দিলেন। মায়ের দাদামহাশয় অনেককে বলিয়াছেন যে, "ওর ঐ সময়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়াছিলাম, আজও চোখে লাগিয়া আছে।" তারপর আমাদের জিজ্ঞাসায় মা পূর্ব্বকার আরও ঘটনা বলিতেছেন. কিরূপ শুদ্ধ ভাবে সমস্ত কাজ করিতেন বা হইয়া যাইত। যখন ভোগ দেওয়া আরম্ভ হইল, তখন নিজ হাতে জল তোলা, মসলা বাটা, সব করিতেন। বলিতেছেন, "যতদূর সম্ভব শুদ্ধভাবে ভোগরাগাদি দেওয়া হইত।" শা'বাগ আসিয়াই ভোগ দেওয়া আরম্ভ হয়; সেই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "এক দিন খাইতে বসিয়া দেখি, খাওয়া হইতেছে না। শরীরটা বেশ আসন করিয়া বসিল। তারপর সব জিনিষের উপর জপাদি হইতে

লাগিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি জপ হইল?" মা বলিলেন, "যে মন্ত্র ভিতরে চলিত, সেই মন্ত্রেই নিবেদনের মত হইয়া গেল।

"আবার বাজিতপুরে এমন তামাসা আরম্ভ হইল, খাওয়ার পূর্ব্বে ৫ গ্রাস রাখিয়া দেওয়া হইত। আবার ৫ বার মুখে অল্প অল্প দিয়া খাওয়া আরম্ভ হইত। সেইটা কবে জানিস্? ৬ দিন অনাহার ও এক দিন রাত্রিতে বসিয়া থাকার পর আরম্ভ হইল।" আমরা বলিলাম, "গণ্ডুষের ভাবে ক্রিয়াদি হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা, এই সব ক্রিয়া হইবার সময় মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইত না।" মা বলিলেন, "হাঁ, মন্ত্রাদিও কি সব হইয়া যাইত। কিছুদিন এই সব চলিল। নিবেদনও ঐ ভাবে কিছুদিন হইয়া গেল। তারপর আর নিবেদনাদি ঐরূপ ভাবে করা যাইত না। শরীরটা পড়িয়া যাইত। তখন ভোলানাথকে বলা হইলে, সে, নিবেদন করিত। ভোগের চাউল এক একটি করিয়া বাছিয়া দেওয়া হইত। বিশেষ পূজাদির সময় লাকড়িতে পর্য্যন্ত কখনও কখনও গোবর জলের ছিটা দেওয়া হইত। মোট কথা, পূজাদির কাজগুলি যতটা সম্ভব পরিষ্কার ভাবে হইয়া গিয়াছে।"

মার গণ্ডুষের খেলা

১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—আজ বৈকালে মাকে নিয়া সহরে বেড়াইয়া আসিলাম। গাইকোয়াড়ের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিলাম। বেড়াইতে বাহির হইবার সময় ধর্ম্মশালার অপর দিকে একস্থানে বাড়ীর দরজার সামনে একটী মোটর দাঁড়ান দেখিয়া মা হাসিয়া বলিতেছেন—"ঐ মোটরের মালিকদের গিয়া বলি, যে তোমাদের মোটরে আমাকে একটু বেড়াইতে নিয়া চল। বলিলে, নিশ্চয় আমাকে নিয়া যাইবে।" ঐ বাড়ী বা মোটর কাহার আমরা কিছুই জানি না। মার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম—"তা তুমি পার, তোমাকে বিশ্বাস নাই।"

সন্ধ্যাবেলায় একটী ছেলে মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে শুনিলাম,

এই ছেলেটী ঐ সামনের বাড়ীর। আমাদের ধর্ম্মশালার মালিকেরই ঐ বাড়ী। ছেলেটী মালিকের ভাগিনেয়। মা হাসিয়া বলিলেন—"খুকুনি বৈকালে ঐ মোটরের কথা বলিয়াছিলাম, আর এখনই আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিতেছি।" আজ ২।৪ ব্যক্তি মাকে দেখিতে আসিলেন। বাসন মাজিবার জন্য একটী ঝি রাখা হইয়াছে, সে মাকে দেখিয়া বলিতেছে—"ঐ স্ত্রীলোকটী কে?" আমরা বলিলাম,—"মাতাজী।" সে বলিতেছে,—"মুখের জ্যোতি দেখিলেই ঠিক বোঝা যায়।" গুজরাটি ও হিন্দি মিশাইয়া সে এ কথা বলিল। এই কথা লেখার উদ্দেশ্য এই যে মার বদন-মণ্ডলের অসাধারণত্ব সাধারণ লোকেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

১২ই কার্ত্তিক, শুক্রবার—প্রাতে ধর্ম্মশালার মালিক এবং তাঁহার পরিবারস্থ অনেকে আসিয়াছেন। আমাদের বিশেষ যত্ন নিবার জন্য ধর্ম্মশালার ম্যানেজারকে বলিয়া গেলেন। এই ধর্ম্মশালায় তিন দিন থাকিবার নিয়ম। মা তিন দিন পরে কোথাও যাইবেন কি না বুঝিতেছি না—তবে ধর্ম্মশালা ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আজ যথাসময় মালিকেরা মাকে দর্শন করিলেন ও বলিয়া গেলেন—"সাধু মহাত্মাদের জন্য এ সব কোন নিয়ম নাই। মা যে ক'দিন ইচ্ছা এখানে থাকিতে পারেন।" মা পরে হাসিয়া বলিলেন—"দেখলি ত তিনি নিজেই সব ব্যবস্থা করেন, মালিকদের ঠিক ঠিক সময় আসিয়া আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য কে ডাকিয়া আনিয়াছিল।"

রুক্মিণীবাই আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলেন। ইনি গতবার বরোদা হইয়া যাইবার সময় মার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। আজ দু'চার জন গুজরাটি ভদ্রলোক ও মহিলা মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

একজন ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ব্বজন্ম আছে কি না?

কেহ বলে আছে, কেহ বলে নাই।" মা বলিলেন,—"আছে, তবে যাহাদের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম সংস্কার আছে, তাহাদেরই জন্মান্তর হয়। যাহাদের নাই তাহাদের হয় না। যে যে স্তরে দাঁড়াইয়া আছে তাহার সেইরূপ ভাবই জাগে,—সে সেইরূপ কথাই বলে।"

ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তা' হলে ত মুসলমান কি খৃষ্টান হওয়া খুব ভাল। তাহাদের জন্মান্তর সংস্কার নাই, অতএব তাহাদের আর জন্ম হইবে না। আর আমরা, আমাদের কত জন্ম যে যাওয়া আসা করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য।" মা বলিলেন, "তুমি ইচ্ছ করিলেই কি শুধু এই ভাবটুকু নিয়া সংস্কার-মুক্ত হইতে পার? তোমারা যে জন্মগত সংস্কার। আর দেখ, শুধু হিন্দু বা মুসলমান হইলেই হয় না; কত মুসলমানের হিন্দু-সংস্কার থাকে, আবার কত হিন্দুর মুসলমান-সংস্কার থাকে।"

পূর্ব্বজন্ম আছে কি না"—প্রশ্ন ও উত্তর। ব্রহ্ম যদি অজ্ঞেয় হন তবে তাঁহাকে কিরূপে জানা যায়"—প্রশ্নের উত্তর।

ভদ্রলোকটী কথায় কথায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দর্শনাদি হয় কি না এবং হইলে উহা ঠিক কি না?" মা বলিলেন, "নিশ্চয়ই হয়, যেমন তোমাকে দেখিতেছি ঠিক সেই রকম দেখা যায়।" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "লোকে বলে ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অব্যক্ত। যদি তাই হয় তবে তাঁহাকে জানা যায় কিরূপে?" মা বলিলেন, "তুমি একটি ফুল দেিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বাবা ফুলটা কি রকম?' তুমি বলিলে, 'খুব সুন্দর; ফুলটি এই রকম, এই রকম' ইত্যাদি। কিন্তু ফুলের যথাযথ স্বরূপ বর্ণনা হইল কি? তোমার মনের ভাব একেবারে ঠিক ঠিক প্রকাশ করিতে পারিলে কি? তুমি ভাষায় কোন বস্তুরই

স্বরূপ পরিচয় দিতে পার না।" একটু আভাসমাত্র দিতে পার, কারণ বাণী সেখানে কুন্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসে। **প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইই। সেইরূপ ব্রহ্মও ব্যক্ত ও অব্যক্ত, জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয়—যুগপৎ দুইই।** সব ভাবই তাহাতে আছে।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভদ্রলোকটীও খুসি হইয়া বলিলেন, "ঠিকই বলিয়াছ, মা।"

আবার কথা হইল, "কলিযুগে যোগী পুরুষ আছেন কি না?" মা বলিলেন, "আছে।" তিনি বলিলেন, "লোকে বলে কলিযুগ বড় পাপের যুগ, এ যুগে সাধু পুরুষ থাকিতে পারেন না।" মা বলিলেন, "সকলের ভিতরই মোটামুটি ৩টি গুণ আছে। তবে মাত্রা ভেদে কোন কোন সময় কোন কোনটা প্রবল হইয়া উঠে, এই মাত্র। কলিযুগের মধ্যেও সত্য যুগের আভাস আছে, কারণ সত্যযুগ যে আসিতেছে।" এই কথায়ও ভদ্রলোকটি খুব আনন্দ পাইলেন এবং মার কথা মানিয়া নিলেন। ইনি উচ্চ শিক্ষিত। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শয়ন করিলেন। মা ও আমরা কয়েক জন বারান্দায়ই শয়ন করিলাম। মার শরীরটা ভাল নয় তবে হাসিখুসী বেশ আছেন।

১৩ই কার্ত্তিক, শনিবার—মা বেলা প্রায় ৮টায় উঠিয়াছেন। দিদিমা একটু জলখাবার খাওয়াইয়া দিলেন। পরে নরেশবাবু একান্তে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আহমেদাবাদের বৈদ্যরাজের পুত্র বলদেওজী আমাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। ইঁহারও বেশ শুদ্ধ সংস্কার। আজও সকালে ধর্ম্মশালার মালিক আসিয়াছিলেন। মাকে বৈকালে কোথায় বেড়াইতে নিয়া যাইবেন বলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ১টায় ভোগ হইল। ভোগের পর একটু বিশ্রাম করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা মা নাম করিতেছেন, "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,

পতিতপাবন সীতারাম। জয়তি শিব শিব জানকী রাম, জয় রঘুনন্দন জয় সীতা রাম॥" তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, সকলে সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশালার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই কীর্ত্তনে যোগ দিল। আনন্দে নরেশদাদা নাচিয়া নাচিয়া নাম করিতে লাগিলেন। নরেশ দাদা প্রায় সময়ই নাচিয়া নাচিয়া নাম করিতেন। আমরা বলিতাম, "আপনার এই পাগলামী দেখিলে এদেশে কেহ আপনাকে প্রফেসার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।" শচী বাবুরও এই অবস্থা। তাঁহারা জবাব দিতেন, "কলিকাতায় যখন নিজেদের কাজে থাকি, তখন ত এ-ভাব থাকে না। এখানে মার সংস্পর্শে যেন কেমন পাগল হইয়া গিয়াছি।" সত্যই তাঁহাদের ব্যবহার দেখিলে মনে হইত, কি এক নেশায় যেন তাঁহারা মাতিয়া আছেন। মার সঙ্গে আহার-বিহারের অনিয়মে এই সকল ব্যক্তিদের অসুস্থ হইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাঁহারা বেশ আছেন। সকলেরই চেহারায় সাত্ত্বিক ভাবের উজ্জ্বলতা ও শুদ্ধ পরিবর্ত্তন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাত্রি প্রায় ৮টায় শেঠজীর মোটরে আমরা রোকরনাথের (মারুতির) মন্দিরে গিয়া কীর্ত্তনাদি শুনিয়া রাত্রি প্রায় ১০টায় ফিরিয়া আসিলাম। সকলে মা ও ভোলানাথকে নিয়া খাইতে বসিয়া গেলেন। মহানন্দে মুড়ি-চিড়া, দুধ ইত্যাদি দিয়া জলযোগ করিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় সকলে শয়ন করিলেন।

১৪ই কার্ত্তিক, রবিবার—মা আজও প্রায় ৭॥ টায় উঠিলেন। একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—বড় রেলওয়ে অফিসার—সস্ত্রীক মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। মা উঠিয়া বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলেন। আজ শ্রীযুক্তা রুক্মিণীবাই ভোগের জিনিষ পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। বেলা প্রায় ১টায় ভোগ হইল। ভোগের পর মা একটু

বিশ্রাম করিতে শুইয়া পড়িলেন। আজ শেঠজীর সঙ্গে নবদ্বীপের এক বাবাজি আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় বাবাজী কীর্ত্তন করিতে আসিবেন, বলিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় আসিলেন। দাদা মহাশয় খুব ওস্তাদ গায়ক। তিনি গান ধরিতেই বাবাজি নিজের সেতারটী তাঁহার হাতে দিলেন। দাদামহাশয় কয়েকটী গান করিলেন। পরে বাবাজীও ২।৩টি গান করিলেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শুইয়া পড়িলাম।

১৫ই কার্ত্তিক, সোমবার—মা বেলা প্রায় ৭টায় উঠিলেন। মুখ ধোয়াইয়া একটু ফল খাওয়াইয়া দিলাম। কাল রাত্রিতে আবার আহমেদাবাদ হইতে বৈদ্যরাজ আসিয়াছেন। সকলে মার কাছে বসিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ১২টায় ভোগ হইল। মিঃ চ্যাটার্জ্জির স্ত্রী (উপরোক্ত রেলওয়ে অফিসারের স্ত্রী) আজ সকাল হইতেই আসিয়া মার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার স্বামী এ সব সাধু ও ধর্ম্ম কথা বেশী পছন্দ করেন না ; কিন্তু ইনি মার জন্য ব্যাকুল। ঘরের কাজ শেষ করিয়া কখন মার কাছে আসিবেন, এই চিন্তায় গলার হার কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। মার নিকট ছুটিয়া আসিবার চিন্তাতেই মন ব্যাকুল ছিল। এই সব ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায় মা অতি স্বল্পকালে সকলের মন-প্রাণ কিরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করেন। আজ বৈকালে মার ফটো তোলা হইল।

এখন হাঁটা-চলা খুবই কম করিতে করিতে মার এমন হইয়া গিয়াছেন যে অল্প হাঁটিলেই অনেক সময় পা বাঁকিয়া যায়। হাঁটিবার ভাবই নাই। আজ ফটো তুলিবার জন্য মাকে নীচের তলায় নেওয়া হইল। ফটো তোলার পর আমরা বলিলাম, "যখন নীচে নামিয়াছ, চল একটু হাঁটিয়া আসি।" মা বলিলেন, "চল।" রাস্তায় বাহির হইতেই

উকীল, দীক্ষিত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি মাতৃদর্শনে আসিতেছিলেন; কালও আসিয়াছিলেন। মাকে বাহির হইতে দেখিয়া তিনিও আমাদের সঙ্গ নিলেন।

আমরা অল্প একটু হাঁটিয়া যাইতেই পার্শিদের অগ্নিরক্ষার মন্দির দেখিতে পাইলাম। মা বলিলেন, "চল ভিতরে যাই।" চারিদিকে সুন্দর বাগান। মন্দিরের নিকট যাইতে না যাইতেই আমরা সুন্দর একটা গন্ধ পাইলাম। কয়েক জন পার্শির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের মুখে শুনিলাম তাঁহাদের অগ্নিমন্দিরে অপর ধর্ম্মের লোকদের ঢুকিতে দেওয়া হয় না, এমন কি বাহির হইতেও দেখিতে দেওয়া হয় না। অগ্নিতে দুই বেলা আহুতি দেওয়া হয়, ইত্যাদি। আমরা অগত্যা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কল্যই কালীপূজা ও দীপান্বিতা। এখানে দীপান্বিতায় খুব উৎসব হয় শুনিলাম। আজ দেখিলাম, মন্দির-দ্বারে, সিঁড়িতে এবং ঘরের দরজায় দরজায় চাউলের গুঁড়া গুলিয়া চিত্র করা হইতেছে। অগ্নি মন্দিরও বাদ পড়ে নাই। বাংলার চালের গুঁড়ার আল্পনার কথা মনে পড়িল। পূজার দিন ঘরে ঘরে, দরজায় দরজায়, লক্ষ্মী দেবীর পাদপদ্ম অঙ্কিত করা হয়। এ'ও দেখিতেছি সেইরূপ একটা মঙ্গল চিহ্ন। অনেক মঙ্গল কার্য্যেই আলিপনা দেওয়ার প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এই সুদূর দেশেও বাংলার চিরাচরিত প্রথা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

আজ ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলিয়াছে। নানা রকমের বাজির শব্দে কানে তালা লাগিবার উপক্রম। মন্দির হইতে ফিরিবার পথে চ্যাটার্জ্জির বাড়ী হইয়া ধর্ম্মশালা ফিরিলাম। মা বলিতেছেন, "হাঁটিতে গেলেই কেমন পা বাঁকিয়া যাইবে। হাঁটিবার যেন ভাবই

নাই।" মার এই অবস্থায় আমরা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছি। চেহারা অত্যন্ত রুগ্ন, দুর্ব্বল। আজ সন্ধ্যায় কথায় কথায় আমি বলিলাম, "তোমাকে না খাইয়া কত দিন থাকিতে দেখিয়াছি, জল পর্য্যন্ত খাও নাই অথচ শরীর বেশ ছিল। এখন এত যত্ন করিবার চেষ্টা হয়, তবুও শরীর যেন কেমন হইয়া যাইতেছে।" মা বলিলেন, "তখন ত ভিন্ন এক রকম ছিল। শিশুকালে যে ভাবটা ছিল, এখন আবার সেই ভাব। তখনও মা ডাকিয়া ডাকিয়া খাওয়াইতেন, খাওয়ার খেয়াল কোন দিনই ছিল না। তারপর মধ্যে ভাবটা তোমরা দেখিয়াছ। না খাইয়াও শরীরটা ভাল ছিল। তার কারণ, প্রকাশ ও স্বরূপ ইত্যাদির প্রকাশগুলি কর্ম্মযোগী, ভক্তিযোগী ও জ্ঞানযোগীদের অনুভূতির প্রবাহগুলি শরীরের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছে। হঠযোগ, রাজযোগাদির প্রত্যেকগুলিই শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। এখন আবার শৈশবের ভাব চলিতেছে; তখনও শরীরটা সেবায় চলিয়াছে, এখনও সেবায় চলিতেছে। তখন ধীরে ধীরে শরীরটা বাড়িতেছিল, এখন আবার অন্যদিকে চলিতেছে।" আমি বলিলাম, "সিদ্ধেশ্বরীর অসুখটার পর হইতেই তোমার শরীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তারপর নানা সেবাযত্নেও আর সারিল না।" মা বলিলেন, "আমি ত কাহাকেও কোন বাধা দেই না, কিন্তু এ যে স্বভাবেরই নিজের ভাবে বাধা পাইয়াই আবার এরূপটা প্রকাশ হইয়াছিল।" এই ভাবের কথা কিছুক্ষণ চলিল। রাত্রি প্রায় ১টায় সকলে শয়ন করিলেন।

১৬ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। আগামীকল্য কলিকাতা—দিল্লীর অনেক ভক্তও চলিয়া যাইতেছেন। মায়ীমা ও রমণীবাবু কুম্ভমেলা পর্য্যন্ত হরিদ্বারে থাকিবেন। তাঁহাদেরও

হরিদ্বার পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কাল ভোর ৬টার গাড়ীতে সকলে রওনা হইবেন। মা বলিলেন, 'দেখ, ডাকুর যাইবে নাকি। তবে ক'টার গাড়ী, দেখ।" ডাকুরে দ্বারকানাথের বড় মন্দির আছে, আরও মন্দিরাদি আছে। খবর করিয়া জানা গেল কাল ভোর ৭টায় এখান হইতে ডাকুর যাওয়ার গাড়ী আছে। সেই গাড়ী ১০টায় ডাকুর পৌছিবে। আমাদের সেই গাড়ীতেই ডাকুর যাওয়া স্থির হইল। কাল তথায় দ্বারকানাথের মন্দিরে অন্নকূট হইবে।

১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার—ভোর ৭টার গাড়ীতে ডাকুর চলিলাম। সঙ্গে রুক্মিণীবাই ও তাঁহার কন্যা বিজয়া চলিলেন। ইঁহারা ভোলানাথের নিকট দীক্ষা নিয়াছেন। ষ্টেশনে গিয়া দেখিলাম পুঞ্জীলাল শেঠও ডাকুর যাইতেছেন, মাকে দেখিয়া তাঁহার মহা আনন্দ। আমরা বেলা প্রায় ১০টায় ডাকুর পৌছিয়া বল্লভ-ভবন নামে এক ধৰ্ম্মশালায় উঠিলাম। আমরা তখনই 'রণছোড়-রায়জী' (বিষ্ণু মন্দির) দর্শন করিতে চলিলাম। তথায় গোমতীতে (ইহা একটা প্রকাণ্ড সরোবর) স্নান করিয়া 'রণছোড়-রায়জী' দর্শন করিয়া ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

ডাকুরে শ্রীদ্বারকানাথ মন্দিরে অন্নকূট বা অন্ন লুটের বিবরণ।

আজ অন্নকূট; তাই আজ প্রতিপদ তিথিতে এখানে নানাস্থান হইতে লোক সমাগম হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিতেই 'রণছোড়-রায়জী'র, বাল্যভোগ, তরকারী, দুধ, ইত্যাদি আসিল। সকলে প্রসাদ পাইলেন। ২টার সময় হইতে অন্নকূট (এখানে বলে অন্নলুট) আরম্ভ হইবে। এই অপরিচিত স্থানে আসিয়া রুক্মিণীবাই ও শেঠজীর বন্দোবস্তে আমাদের কোনই অসুবিধা হইল না। মা'র কৃপায় সবই সুবন্দোবস্ত হইয়া যায়। বেলা ২টায় আমরা "অন্নকূট" দর্শন করিতে মন্দিরে গিয়া দেখি ভয়ানক ভীড়, গেটের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে

দরজা খুলিতেই ভিতরে গেলাম। সকলেই আগ্রহভরে মা'র জন্য একটু সুবিধাজনক স্থান করিয়া দিল।

একটা প্রকাণ্ড ঘরে দেবতার সম্মুখে ভোগ রাখা হইয়াছে। ভোগের পর পরদা উঠাইয়া দেওয়া হইল। দরজা খোলা মাত্রই জনসঙ্ঘ ভীমবেগে ধাবিত হইয়া সেই প্রসাদ লুটিয়া লইল। সে এক ভয়ানক ব্যাপার! আধ কি এক ঘণ্টার মধ্যেই সব প্রসাদ নিঃশেষ হইয়া গেল। এক একজনের ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হয়। আমরা এই সব দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। মা'র চেহারা দেখিয়াই অনেকে পায়ের ধূলা নিতে লাগিল। শেঠজী সন্ধ্যায় আরতি দর্শন করিতে নিয়া গেলেন। প্রাতেও মা সকলের অনুরোধে অতি দ্রুত ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া মূর্ত্তি দর্শন মাত্র করিয়াই বাহিরে আসিয়াছিলেন। এখনও সকলের কথায় ভিড় ঠেলিয়া মূর্ত্তি একটু দর্শন করিয়াই বাহিরে আসিয়া খোলা যায়গায় উপবেশন করিলেন। জনৈকা মহিলা মাকে আহমেদাবাদে স্বল্পকালের জন্য দেখিয়াছিলেন; তিনি মন্দিরেই মাকে একখানা শাড়ী পরাইয়া দিলেন। প্রবাদ এই যে, দ্বারকানাথ এখানেই আছেন। এখন যে মূর্ত্তি দ্বারকায় আছেন তাহা পরের মূর্ত্তি। প্রাচীন মূর্ত্তি ইহাই; নাম 'রণছোড় রায়জী'। আমরা সন্ধ্যায় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম। শেঠজী এক ব্রাহ্মণ দ্বারা দ্বিপ্রহরে রান্না করাইয়াছিলেন। এ'বেলা ৩৲ টাকা মূল্যের একখানা প্রসাদী থালা আসিল। তাহা বহুপ্রকার ব্যঞ্জনাদি ও মিঠাই প্রভৃতিতে পূর্ণ। সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইলেন। আমি স্বপাক আহার করিলাম,—মা'র এমনই সুন্দর নিয়মিত ব্যাপার। রাত্রিতে ধর্ম্মশালার বারান্দায় সকলে মাকে নিয়া শুইলাম।

১৮-ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—আজ উঠিয়াই অনেকে দেবতা স্পর্শ করিতে মন্দিরে চলিয়া গেলেন। মা শুইয়া রাহলেন,

আমিও মা'র সঙ্গেই রহিয়া গেলাম। বেলা ১২টায় খাওয়া দাওয়া করিয়া ১টার গাড়ীতে বরোদা রওনা হইলাম। বরোদা ষ্টেশনে পৌছিয়াই দেখি শ্রীহরিরাম যোশী আসিয়াছেন। তিনি একমাসের ছুটী নিয়া মা'র সঙ্গ করিতে আসিয়াছেন। আমরা এখানকার সাধু বালাজীর সঙ্গে একত্র ডাকুর হইতে আসিলাম।

তিনি মাকে বরোদার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে নিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমরা একটা বাসে (Bus) করিয়া ধর্ম্মশালায় জিনিষপত্র রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে গেলাম। তথায় আজ নানাবিধ ভোগরাগসহ অন্নকূট দেওয়া হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, সব সাজান আছে।

বরোদায় আগমন ও শ্রীকৃষ্ণ মন্দির দর্শন।

ষ্টেশনে গীতা প্রচারক, বিদ্যারণ্য স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হইল। এই দেশে ইহার খুব নাম। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে মাকে বসান হইল; নরসিং স্বামী এই মন্দিরের কর্ত্তা, তাঁহার সঙ্গেও দেখা হইল। বালাজী মাকে বলিলেন, "মা তোমার চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তুমি পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া আছ, তবুও এখানে সকলকে নিয়া একটু প্রসাদ পাইয়া গেলে আমরা কৃতার্থ হইতাম।" মা অমনি স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "বাবার দেখা পাইয়াছি, বাবার মুখে সৎকথা শুনিয়াছি, ইহাই ত প্রসাদ।" তিনি বলিলেন, "ব্যবহারিক ভাবে তোমাকে এ কথা বলিতেছি।" আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া চলিলাম, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে কিছু প্রসাদ দিয়া দিলেন। মা বলিলেন, 'চল, নর্ম্মদাতীরে, কর্ণালীতে অথবা ব্যাসে যাই।'

ব্যাসে একটা বড় ধর্ম্মশালা আছে। 'বড়খা' গ্রামের নিকটেই সাধু মহাত্মাদের থাকিবার স্থান আছে, গৃহস্থদেরও থাকিবার ভিন্ন স্থান আছে, শুনিলাম। আর কর্ণালীতে মন্দির আছে, তথায় থাকিবার জন্য এখানকার উকিল দীক্ষিতজী, এক চিঠি দিয়াছেন। কর্ণালীতে থাকিতে

হইলে চান্দোদ হইতে সব খাবার জিনিষপত্র আনিতে হয়; আর ব্যাসে থাকিতে হইলেও চান্দোদ ও বড়খা হইতে সব জিনিষপত্র আনিতে হয়। মা বলিলেন, "যখন যেখানে যাহা পাওয়া যায় তদ্বারাই চলিতে হইবে। সব সময়ই যে সহরে থাকা হইবে, সুবিধায় থাকা হইবে; এমন কি কথা আছে?" আমাদের জন্য রাত্রিতেই গয়াগেট (৪ মাইল দূর) ষ্টেশনে গিয়া থাকিয়া কাল ভোর ৭টার গাড়ীতে চান্দোদ যাওয়া স্থির হইল। চান্দোদ হইতে নৌকায় কর্ণালী যাইতে হয়। আহমেদাবাদের একজন ভদ্রলোক কল্য মাকে ভোগ দিবার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় কাল খাওয়া দাওয়ার পর বেলা ১১টার গাড়ী ধরিবার কথা হইল।

আজ হরিরামের মুখে দুইটী বিশেষ খবর পাইলাম। শুনিলাম, একটী ভদ্রলোক নাকি এবার দেরাদুনে মার কাছে যাওয়া আসা করিতেন; এমন কি, তিনি মার সঙ্গে হরিদ্বার আসিবার জন্যও বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। সেই মুসলমান ভদ্রলোকটী মাকে এক চিঠি লিখিয়াছেন যে,

জনৈক মুসলমানের নামাজ করার সময় মাকে দর্শনের কথা।

তিনি রোজার সময়টা ৪০ দিন মার সঙ্গে থাকিতে চান। আর, তিনি নাকি বলিয়াছেন, তিনি আল্লার নাম করিতে বসিলেই দেখেন, মা মাথায় তাজ পরিয়া ও এক হাতে ত্রিশূল ও এক হাতে ডমরু নিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। তিনিও আল্লার নাম করিতে করিতে মার দিকে চাহিয়া থাকেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"আমি চোখ খুলিয়া পূর্ণ জাগ্রৎ অবস্থায় দেখি, আমার নমাজ পড়িবার সময় মা সামনে আসিয়া বসিয়া আছেন। মা যখন যাতায়াত করেন, তখন আমি দেখি না, যখন তিনি একস্থানে থাকেন তখনই আমি দেখি; ইত্যাদি।"

আর একটী ঘটনা এই যে, আমরা মার সহিত আলমোড়ায় একজন জার্মান চিত্রকরের বাড়ী গিয়াছিলাম। তথায় একজন ফরাসী মহিলার সহিত

আমাদের দেখা হয়। জ্যোতিষদাদার দেহত্যাগের পরদিন মা'র যখন সমাধি অবস্থা হয় তখন সেই মহিলাটি আসিয়াছিলেন এবং বহুক্ষণ চোখ বুজিয়া মার কাছে বসিয়া ছিলেন। তিনি স্পেনদেশীয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন শুনিলাম তিনি ফরাসী। একজন ইংরাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি পতিকে ভারতবর্ষে নিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ওঁর স্বামী এখানে থাকিতে পারিলেন না বলিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন, আর ইনি এখানেই আছেন; সাধু সন্ন্যাসীর সহিত খুব দেখা করেন। ইনি শ্রীঅরবিন্দ ও দাক্ষিণাত্যের রমণমহর্ষি—সকলের সহিতই দেখা করিয়াছেন।

এই ফরাসী মহিলাটি মা'র সহিত দেখা করিতে দেরাদুন গিয়া হরিরামের সহিত দেখা করেন। মা তৎপূর্ব্বেই দেরাদুন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম 'পেণ্টরোজ' (Pentrose)। ইনি হরিরামকে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, "আমি অনেক সাধু দেখিয়াছি কিন্তু মা'র মত এমন পূর্ণ ভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমি যখন আলমোড়াতে মা'র সমাধি অবস্থায় মা'র কাছে বসিয়াছিলাম, তখন দেখিতেছিলাম মা'র শরীরটা যেন একটা বিরাট আকার ধারণ করিল। আমি ভাবিলাম, হয়ত আমার দেখিবার ভুল হইতেছে, এই ভাবিয়া চক্ষু খুলিয়াও দেখি সেইরূপ। কিছুকাল পরে মা'র শরীর হইতে একটা সূর্য্য কিরণের মত জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল এবং তাহা শান্ত হইয়া আমার শরীরে প্রবেশ করিল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পরে মা আমার দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম এবং তখন আমি শান্ত হইলাম। অনেক লোকের ভিড় ছিল। এর পরে আমার অবস্থার

জনৈক ফরাসী মহিলার মার শরীরে হীরক অলঙ্কার ধারণ ও জ্যোতি-স্ফুরণ দর্শন।

পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। আমি মনে করি মা'ই 'পরাজ্ঞান'। আমি নিজের ভিতকে দুর্গা কালী তারা প্রভৃতি মূর্ত্তি দেখিয়াছি এবং আমি তারার উপাসক। আমার মনে হয় মা'ই তারা। তিনি আমাকে যে আদেশ করেন আমি তাহাই করিব।"

হরিরাম তাঁহাকে দেরাদুনের 'মৌনঘরে' বসিতে দিয়াছিল। তখনও নাকি তাঁহার খুব সুন্দর এক অনুভূতি হয়। তিনি বলিয়াছেন, "মাকে দেখানেও দেখিলাম বিরাট মূর্ত্তিতে হাত পাতিয়া বসিয়া সকলকে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, 'তোরা বাহিরে কেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস? আমার ভিতর আয়, অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর্।"

ইনি যখন হরিরামের কাছে শুনিলেন, কমলা নেহেরু মা'র কাছে আসিতেন ও মাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, তখন ইনি বলিলেন, "আমার এক ফরাসী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি তিনি কমলা নেহেরুর বন্ধু ছিলেন। কমলা নেহেরু বিলাতে আমার বন্ধুটিকে বলিতেন, এক মাতাজীকে তিনি সর্ব্বদা চোখের সামনে দেখিতে পান। নেহেরু বন্ধুটিকে এই মাতাজীর কথা অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং তিনি আমাকে আসিয়া সব কথা বলিতেন। আমি তখন ভাবিতাম, কে এই মাতাজী? একবার দর্শন পাইলে হইত, এখন বুঝিতেছি আনন্দময়ী মা'ই সেই মাতাজী। আমি আমার ফরাসী বন্ধুকে এ'কথা লিখিয়া দিব।"

ইনি হরিরামের মারফৎ মাকে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতেও মা'র প্রতি তার কি সুন্দর ভাব, কত ধারণা—তাহা প্রকাশ পায়। ইনি মার সঙ্গে কিছুদিন থাকিতে চান এবং আশ্রমে থাকিয়া মা'র আদেশমত কাজ করিতে রাজি আছেন। লিখিয়াছেন, মা সমুদ্রের ধারে অথবা পাহাড়ের উপরে—যেখানেই থাকিতে চান, ইনি বন্দোবস্ত করিতে রাজি আছেন—ইত্যাদি।

আরও একটী ঘটনা:—আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণ মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। একটু পরেই রাস্তার দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, 'ঐ দেখ চাটার্জ্জি বাবা বেড়াইতে যাইতেছেন। বলিয়া দাও আমার মাকে অর্থাৎ তাহার স্ত্রীকে) খবর দিতে যে আমরা আসিয়াছি।"

অন্য এক (বাঙ্গালী) মহিলার মাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন পাওয়ার প্রার্থনায় দর্শনপ্রাপ্তি।

ঐই ভদ্রলোক মা'র কাছে বড় আসেন না যদি তাঁর স্ত্রীর মা'র প্রতি আসক্তিটা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু মাত্র দুই দিনের পরিচয়, কাজেই আমরা ইতঃস্ততঃ করিতেছিলাম, কি বলিয়া ডাকি। এর মধ্যে মা নিজেই দোতলা হইতে ডাকিয়া বলিতেছেন; "বাবা, আমার মাকে একটু খবর দাও যে, আমরা আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন; "সে হয়ত এক্ষুনি আসিবে।"

নিকটেই বাসা। একটু পরেই চ্যাটার্জ্জির স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত। মা কল্যই চলিয়া যাইতেছেন শুনিয়া তিনি শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। কতবার সংশয় আসিতেছে আবার যেন সব ভাসিয়া যাইতেছে। মাকে যেন চিনিতে পারিতেছি না।" কথায় কথায় আরও বলিতেছেন, "মা ঠাকুর যাওয়ার পূর্ব্ব রাত্রিতেই মাকে যেন আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে একবার দর্শন পাই, বিশেষ ভাবে এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম। মা'র সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। তারপর দিন ভোরবেলা মা ঠাকুর চলিয়া গেলেন! আমার মনটা এত খারাপ হইয়া গেল যে আমি নিজেই অবাক্ হইয়া গেলাম।

আমি সহজে কাহারও নিকট মাথা নত করি না। যাহা নিজে ভাল না বুঝি, তাহা কাহারও কথায় ভাল বলি না। যাক্, এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে সেদিন রান্না করিতে আমি সব ভুল করিয়া বসিলাম। ঝোলের মধ্যে জলের বদলে তেল দেওয়া ও তেল দিয়াই হাত ধোয়া

এ জাতীয় ভুল। বুকের ভিতর মা'র জন্য বড় জ্বালা। আমার অবস্থা দেখিয়া বাবু আমাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? মাথা ধরার অজুহাতে এক ঘরে চলিয়া গেলাম।

হাঁটিয়া হাঁটিয়া মনে মনে নাম করিতেছি; হঠাৎ দেখি শ্রীকৃষ্ণ মায়ের মাথার উপর এক পা দিয়াছেন, অপর পা একটু উঠাইয়া রাখিয়াছেন যেন আর কোথাও দিবেন। এই মূর্ত্তি দেখিয়াই আমার মা'র কথা মনে হইল, বেশ বুঝিলাম ইহা মায়েরই খেলা। একটু পরেই সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলেন। তখন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "মা, আর একবার দেখাও।" কিন্তু আর দেখি না, অথচ দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা—বলিতেছি 'মা রাক্ষুসী আর একবার দেখা।' কিন্তু আর দেখিলাম না। এসব কি হইল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহা স্বপ্নে দেখিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "স্বপ্নে দেখিলে এই ধর্ম্মশালায় আর আসিতাম না; প্রত্যক্ষ সত্য।"

স্বামীর মত নয় বলিয়া ইনি দীক্ষা নেন নাই। অল্প সময় মাত্র মার সঙ্গে দেখা। বেশ ভদ্রভাবে আসিয়া মার সঙ্গে কিছুকাল আলাপ করিয়া যাইতেন। আজ শিশুর মত অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। ইহার ছেলে মেয়ে নাই। মা বলিলেন, "আমিই যে তোমার ছেলে-মেয়ে; তাই আমার জন্য কাঁদিতেছ।"

১৯শে কার্ত্তিক, শুক্রবার—আজ আমরা বেলা ১০টায় ধর্ম্মশালা হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইলাম। গয়াগেট ষ্টেশন বরোদা হইতে মাইল দূর; তথায় আসিয়া ট্রেন ধরিলাম। ১১টার ট্রেন ধরিয়া, মধ্যে একবার বদল করিয়া, বেলা প্রায় ৩টায় চান্দোদ পৌঁছাইয়া, তখনই নর্ম্মদার তীরে যাইয়া নৌকা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই

কর্ণালীতে শ্রীমনোহর-মুরলী-ধরের মন্দিরে আগমন।

কর্ণালীতে মনোহর মুরলীধরের মন্দিরে পৌছিলাম। মন্দিরের পূজারী গোপালরাও বালকৃতজীর নিকট দিক্ষীতরা চিঠি দিয়াছিলেন। এ স্থানটী চান্দোদ হইতে প্রায় মাইল দুই দূরে নর্ম্মদার তীরে অবস্থিত। বেশ সুন্দর স্থান; চারিদিকে ধর্ম্মশালা; মধ্যস্থানে মুরলীধরের মন্দির। এখানে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, চান্দোদ হইতে সব আনিতে হয়। রাত্রিতে খিচুরী রান্না হল। মাকে একটু তরকারি সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রায় ১২টায় আমরা শয়ন করিলাম।

২০শে কার্ত্তিক, শনিবার—কালই শুনিয়াছি, এখানে ৩।৪ দিন থাকিবার নিয়ম। পূজারীজি বেশ যত্ন করিয়াই আমাদের স্থান দিলেন। মাকে বলিলেন, "আপনি এখন থাকুন, পরে যাহা হয় বন্দোবস্ত করা যাইবে।" উপরে ও নীচে ২।৩টী ঘর নিয়া এখানেই আমাদের থাকা স্থির হইল। এখন মা'র সঙ্গে ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দ স্বামীজি, হরিরাম, দাদামহাশয়, দিদিমা, রুমাদেবী, নরেশ বাবু ও আমি আছি।

২১শে কার্ত্তিক, রবিবার—এ স্থানটি বেশ শান্ত। নর্ম্মদার তীরেই এই মন্দির; আর একটী ধর্ম্মশালাও আছে। আরও কয়েক ঘর গৃহস্থ আশে পাশে আছে। এদিকে মন্দির বা ধর্ম্মশালা হইতেই বাসন পাওয়া যায়। পয়সা দিলে চাকরেরও বন্দোবস্ত আছে, কোনই অসুবিধা নাই। একটী দোকান আছে, চাউল ডাল ইত্যাদি পাওয়া যায়। তরকারি —চান্দোদ হইতে সব আনিতে হয়। আজ চান্দোদের বিষ্ণুদাস মন্দির হইতে ব্রহ্মচারীরা মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মা তাঁহাদের মন্দিরে কেন গেলেন না, সেজন্য মোহন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন। মা'র শরীর খুবই দুর্ব্বল—সেই শরীরেই চলা-ফেরা করিতেছেন। রাত্রিতে কথা-প্রসঙ্গে মার খুব হাসি ও কান্না হইল। অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়াছিলেন।

২২শে কার্ত্তিক, সোমবার—প্রায় ৯টায় মা উঠিলেন। ভাবটা বড়ই গম্ভীর, চুপচাপ। বেলা প্রায় ১১টায় ভোগের পর মা একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কাল রাত্রিতে মায়ের পেটটা ভাল ছিল না, অনেক-ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, শেষ রাত্রির দিকে শুইয়াছেন। বেলা প্রায় ২টায় আমেদাবাদ নিবাসী একটী ব্রহ্মচারী মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মার নিকট ফুল-ফল রাখিয়া প্রণাম করিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি প্রায় ২৪।৩০ বৎসর যাবৎ এখানে নর্ম্মদার তীরে একটী আশ্রম করিয়া আছেন, নাম রামনলালজী। মাকে একদিন তাঁহার আশ্রমে নিয়া যাইবার জন্য, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাকে দর্শন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! এবার দেখিতেছি সাক্ষাৎ নর্ম্মদা। মা অনেক পূণ্যফলে আপনার দর্শন পাইলাম। তীর্থস্থানরাও সাধু-মহাত্মাদের দর্শন প্রার্থনা করেন, অতএব অপনি একটু নর্ম্মদার তীরে তীরে বেড়াইয়া সকলের উপর কৃপাদৃষ্টি দিবেন। আমার আশ্রম ত এদিকেই,—ইত্যাদি।" প্রায় ৬টায় উঠিয়া মা পাশের ছাদটুকুতে গিয়া বসিলেন। উপস্থিত ভক্তদের সহিত অল্পসল্প কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাকে একটু তরকারি সিদ্ধ খাওয়াইয়া দিলাম।

২৩শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—বেলা প্রায় ১০টায় মাকে ডাকিয়া তুলিয়া মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। পরে একটু রুটী ও তরকারী খাওয়াইয়া দিলাম। মা বসিয়া বসিয়া নরেশ বাবুর সহিত নানাকথা বলিতে লাগিলেন।

বৈকালে আমরা সকলে বসিয়া আছি, কথায় কথায় 'রমণা' আশ্রমের কথা উঠিল। ভোলানাথ বাজিতপুরে একবার বলিলেন, 'আমার একটা বাড়ী করিতে ইচ্ছা করে,—মা অমনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বাড়ী ত তোমার আছে,

রমণা আশ্রমের পূর্ব্বকথা

টাকা অমুকেরই বাড়ীই তোমার—বাড়ী।” এই বলিয়া তাঁহার নামও বলিয়া দিলেন। পরে যখন রমনার আশ্রম হইল তখন, মোহন্তদের কাগজ পত্রে দেখা গেল, ঠিক সেই নামেরই একজন এক সময়ে এই স্থানের (রমণা আশ্রমের) মালিক ছিলেন।

মা'র ছোট ঘরটীর দক্ষিণ দিকে কালী পূজার ঘটের জন্য একটী নারিকেল গাছ রোপন করা হয়। মা'রই আদেশে তাহা করা হয়। মা সে কথায় আজ বলিতেছেন, “তাহারও কিছু কিছু ঘটনা আছে, ভূপতিবাবা জানে, তাকে জিজ্ঞাসা করিও।” মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে ভিত্তি খনন করিবার সময় বহু নীচে কয়েকটী সমাধি স্থান পাওয়া যায়। মন্দিরের নীচে পাশাপাশি তিনটি সমাধি পড়িয়াছে, আর একটী সমাধি, মন্দিরের বাহিরে, এক কোণে পড়িয়াছে। শিবের নীচে একটী সমাধি পড়িয়াছে, সেটি বসা অবস্থায় ছিল। স্বামী অখণ্ডানন্দজী সেই স্থান হইতে হঠাৎ একটি অস্থি বাহির করিয়া মাকে বলিলেন, “মা, আমি ইহা সঙ্গে রাখি?” মা বলিয়াছিলেন, “ইহা সঙ্গে নিয়া গৃহস্থের বাড়ী যাওয়া হইবে না, কাজেই ইহা এখন সঙ্গে রাখিয়া কাজ নাই।” এই প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন, “আরও ত অনেকে ছিল, কিন্তু বাবা গিয়া সেই হাড়িটা উঠাইলেন। আবার তাহার উপর শিব-প্রতিষ্ঠা বাবাই করিয়া দিলেন,”—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। কে জানে এ কথার অর্থ কি?

রমণা আশ্রমের ছোট ঘরটীতে মা একদিন কম্বলে শুইয়া আছেন, অন্যদিকে ভোলানাথ লেপ-তোষক ও নেটের মশারি টানাইয়া শুইয়া আছেন; মা'র অসুখ সারিবার পর ভোলানাথের অসুখের সময় মা যখন রমণা আশ্রমে আসিয়াছিলেন, সেই সময়কার কথা। মা হঠাৎ মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া ভোলানাথকে বলিতেছেন, “তুমি উঠিয়া আমার বিছানায় শোও, আমি তোমার বিছানায় শুইব।” ভোলা-

তাহাই করিলেন। অর্থাৎ মা উত্তর দিকে গেলেন, ভোলানাথকে দক্ষিণ দিকে শোয়াইলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতে মা সেই দিকেই শুইতেন। এখন আর ছবি সেই খানেই রাখা হইয়াছে। মা সেই বিছানায় তিন দিন শুইয়া সমস্ত বিছানা উঠাইয়া রাখিতে বলিলেন। কম্বলের বিছানা পাতিলেন। তখন হইতেই দুইজনের কম্বলের বিছানা। ইহার পর মা বসিয়াছিলেন এবং একটী কঙ্কাল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, আর তাহার সমাধিটী ঐ উত্তর দিকেই দেখিয়াছিলেন; পরে প্রকাশ করিয়াছেন যে উহা জ্যোতিষদাদারই এক জন্মের শরীর, আর ঐ স্থানে বিছানা, সেখানেই জ্যোতিষদাদার পূর্ব্বজন্মের সমাধি দেখিয়াছিলেন।

রমণিকাশ্রম দর্শন ও তাহার ইতিহাস।

আজ সন্ধ্যাবেলায় সতকল্পের ব্রহ্মচারী রামণলালজী মাকে তাঁহার আশ্রমে নিতে আসিলেন; সঙ্গে একটী মহিলাও আসিয়াছেন, শুনিলাম; মহিলাটি ইহার শিষ্যা। ইনিই গুরুর আশ্রম তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন; ইহার মাতাও ইনি গুরুর সঙ্গে এই আশ্রমে থাকেন। আশ্রমের নাম রামণিকাশ্রম। ইনি বোম্বাই নিবাসিনী, বিবাহের ৮ দিন পরেই পতি ত্যাগ করিয়া এইদিকে আসিয়াছেন। ভাই রমনলালজী বলেন, ইনি মীরার অবতার।

মা ও আমাদিগকে আশ্রমে নিয়া গেলেন; বেশ সুন্দর আশ্রমটী, নর্ম্মদার একেবারে উপরে; নীচের তলায় সকলে থাকেন। উপরের তলায় ২টী ঘর ও ছাদ আছে, তাহা সাধুসন্তদের থাকিবার জন্য রাখিয়াছেন। এদিকে সব মন্দিরে আশ্রমেই দেখিতেছি সাধুসন্তদের থাকিবার স্থান রাখা হয়। বিদ্যারণ্য স্বামীর (গীতা প্রচারক) একটী গীতামন্দির এখানেও আছে, তাহারই সংলগ্ন এই রমণিকাশ্রম। আমরা যে মন্দিরে আছি, তাহার চারিদিকে ধর্ম্মশালায় অনেক লোক আছে। যাহারা

নর্ম্মদায় বাস করিতে আসিয়াছেন তাঁহারা সঙ্গে ১টাকা ঘর ভাড়া দিলেই সারাজীবন এইখানে যাপন করিতে পারেন। চান্দোদে টিকমজীর মন্দিরে ও বিষ্ণুদাস মন্দিরে (যেখানে আমরা ছিলাম) অনেক লোকের থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। শুনিলাম এদিকে নর্ম্মদা ও রণছোড়রায়জীরই খুব মাহাত্ম্য। আমরা কিছুকাল আশ্রমে থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। ব্রহ্মচারীজী মাকে নিজের বসিবার স্থান ইত্যাদি সব দেখাইলেন। মা যাওয়াতে তিনি বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন।

মা ফিরিয়া আসিয়া ছোট ছাদটীতে বসিলেন। উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। আজ বৈকালবেলা হইতেই কথায় কথায় মানস সরোবরে জ্যোতিষদাদার সন্ন্যাসের কথা উঠিয়াছিল। মা আমাকে

ভাইজীর সন্ন্যাসের বিবরণ।

বলিতেছিলেন, "যখন দেরাদুনে আমার সেই হারটা সারদাকে দেওয়া হয়, তখন ত তুমি জান; তারপর যখন সোলন হইতে ১ দিনের জন্য দেরাদুন যাই তখন কথায় কথায় জ্যোতিষের ফাড়ার কথা উঠিল। আমি জ্যোতিষকে বলিলাম, হারটা তোর গলায় ত রাখিতে পারিস; "রাখিস্, ছাড়িস্ না,"—এমন ভাবে কথা হইল না, রাখিতে পারিস্—এই কথা হইল। এই কথায় জ্যোতিষ আবার নিজের গলায় হারটা দিল।"

আমি মানস সরোবরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, সে সরোবরে স্নান করিয়া কাপড় ইত্যাদি নাকি সব জলে বিসর্জ্জন দিয়া দিগ্বসন হইয়া ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া অনেক কিছু বলিয়াছিল। ভোলানাথের কথায় আবার গরম কাপড় পরিয়াছিল। আমি পৌঁছিলে আবার আমাদের সঙ্গে মানস সরোবরে গেল, এবং সব কথা বলিয়া হার পৈতা আমার পায়ে দিল। তখন তাহার মনে ছিল না যে এই হার আমি

তাহাকে গলায় রাখিতে বলিয়াছিলাম। দেখ, কেমন যোগাযোগ। সেই সময় সব ভুল হইয়া গেল। আমি কিন্তু সেই কথা খেয়াল করিয়া একবারে চুপ হইয়া গেলাম। যাহা হইবার হইবেই। এই জন্যই হয়ত প্রথমে, "রাখিলে পারিস্" এই ভাবের গা-ছাড়া কথা বাহির হইয়াছিল।"

"যাক, জ্যোতিষ বলিতে লাগিল—আমার এরূপ হচ্ছে। দেখিলাম, একটা উদাস ভাব যেন সেই সময়ের জন্য, উহার সমস্ত শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। আমার পায়ে পড়িয়া বলিল, আপনি বাবাকেও বলুন না, আমি একদিকে কোথাও চলিয়া যাই, আপনি আমাকে বিদায় দিন। দেখা গেল, উদাস ও অবধূতভাবের মত একটা প্রকাশ। আরও শুনিলাম সে স্নানান্তে নাকি বিবস্ত্র হইয়া পুঁথি-পুস্তক ও সাধুসন্তমুখ হইতে যে সব সন্ন্যাস মন্ত্র ও মহাবাক্যাবলি জানা শোনা ছিল, তাহার মধ্য হইতে ঠিক করিয়া নিজে নিজেই নাকি সন্ন্যাস-মন্ত্র জপ করিয়াছে। আমি জানিতাম, উহার এ সব জানা আছে। অনেকস্থানে উহার ভাব দেখিয়া উহাকে সন্ন্যাসী করিয়া নিতে চাহিয়াছে। আমি দেখিলাম, এই প্রকাশটা বেশ সুন্দর ও তীব্র। এই ভাল ভাবটা দেখিলাম কিন্তু বলিলাম, তুই এখন সঙ্গে চল। এ কথা বলায় চুপ হইয়া গেল।"

জ্যোতিষ সঙ্গে সঙ্গে চলিল এবং বলিল, আমার একটা নিবেদন—বলুন তবে এখন মৌন হইয়া যাই। আমি বলিলাম, না রাস্তার মধ্যে মৌন হওয়া ঠিক হইবে না। এই বলিয়া চলিতে চলিতে আমি বলিলাম, আজ যখন তোর এইভাবে সন্ন্যাস হইল, আর তোর মৌন হইবার ইচ্ছা জাগিয়াছে, তখন তোর নাম হইল "মৌনানন্দ পর্ব্বত।"

"এ শরীরটা মানস সরোবরের দিকে ও এদিক ওদিক তাকাইয়া তাকাইয়া তীরে আপনভাবে হাঁটিয়া বেড়াইতেছিল। মন্ত্র ইত্যাদি

যেমন বাহির হয়, এ শরীরের মুখ দিয়া সেরূপ অনর্গল সন্ন্যাস মন্ত্র, অন্যান্য আরও কত সব মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপনা-আপনি এসব হইতেছে। এ শরীরটা আপনভাবে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে, ইহার ভিতর দেখা গেল জ্যোতিষ পিছনে পিছনে হাঁটছে। ছুটিয়া আসিয়া পায়ে পড়তে গেল ও পিছন হইতে—"পেয়েছি, আমার কি সৌভাগ্য" বলিয়া সন্ন্যাস মন্ত্র নিজে নিজে নিয়া নিল এবং আমাকে বলিল, আপনার মুখ হইতে যাহা বাহির হইল, এই যে সন্ন্যাস মন্ত্র। এর পরে আমরা তাঁবুর নিকট চলিয়া আসিলাম। ভোলানাথকে যখন বলিলাম, জ্যোতিষ আমাকে এই কথা বলে; তখন ভোলানাথ বলিলেন, আমি এখানে আসিয়া জ্যোতিষকে খুঁজিতে লাগিলাম, দেখি সে নিকটে নাই। তখন তোমরা আস নাই। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে মানস সরোবরের দিকে গিয়া দেখি জ্যোতিষ স্নান করিয়া বস্ত্রাদি সব জলে বিসর্জন দিয়া একেবারে বিবস্ত্র। আমাকে দেখিয়া পায় পড়িয়া প্রণাম করিল; গলার পৈতাও খুলিয়া ফেলিয়াছিল সব ছাড়িয়া আমাকে বলিল, 'আদেশ করুণ, আমি একদিকে চলিয়া যাই।' তখন আমি বলিলাম, তোমার মা, স্বামিজী এখনও কেহ আসে নাই, তুমি একি করছ? তুমি এখন কাপড় পরিয়া চল।"

"তারপর, আমার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু পর্য্যন্ত আসিতেছিল, তখন তোমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছ।" এরপর মা একদিন নাকি জ্যোতিষদাকে রাক্ষস-তালাও পারে যাইতে যাইতে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"তুই যে এই কাজটি করলি আমাকে একটু আভাসেও পূর্ব্বে জানালি না, বা জিজ্ঞাসা করলি না?" উত্তরে জ্যোতিষদা ছলছল চোখে নাকি বলিলেন, "আমার কি কিছু স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিয়াছেন?" আর আমরা যে এই চরণের আশ্রয়ে আসিয়াছি তার উদ্দেশ্যই ত হইল সেই স্বরূপস্থিতি

লাভ করা। কেহ ঐ দিকে যাইতে পারিলেই যে আপনার আনন্দ ইহা:কি আবার জিজ্ঞাসা? আমরা যে তাহা বুঝি না, এই দুঃখের বিষয়। আমি ত জানি আমি যাহা কিছু করিতেছি—আপনিই করাইতেছেন। তাই আর জিজ্ঞাসার কি আছে? আর আমার —এমন একটা ভাব হইয়াছিল যে, আমি যেন নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলাম না।" মা বলিলেন, "আমি দেখিলাম ঠিক কথাই বলিতেছে, পূর্ণ বৈরাগ্য। সেই বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের ভাব। অবধূত ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই ত প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরের অনুষ্ঠানের তাহার প্রয়োজন নাই, তাই তাহার মৃত্যুর পর--আমার মুখ হইতে সমাধি দিবার কথা বাহির হইল; তবুও আমি রামকৃষ্ণ মিশনের যে দুইটী সাধু ওখানে ছিল, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম,—দেখ এইসব ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, এখন যাহা বিধিমত হয় তাহাই তোমরা কর। আমি ত অবিধি কিছুই করিতে বলিব না। তাহাদের মধ্যে একজন সব শুনিয়া বলিল, 'সন্ন্যাস নেওয়া ঠিকই হইয়াছে, ইহাকে সমাধি দেওয়া যায়।'

"ফিরিবার পথে জ্যোতিষ একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'আমি প্রথম যাহা নিজে নিজেই নিয়াছিলাম তাহা, ও আপনার মুখ হইতে যাহা পাইয়াছি তাহা কিরূপভাবে জপ করিব? সব একই ত বুঝিলাম, তবু জিজ্ঞাসা করিতেছি।' ঘটনাচক্রে সন্ন্যাসীরাও ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম, নিজে যাহা নিয়াছ, তাহা ত রাখিবেই, আর যাহা পাইলে তাহাও সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবে। এইজন্যই বোধ হয় মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই শব্দ কয়টী উচ্চারণ করিয়া জানাইল, আমার মনে আছে।"

এই হার মার চিহ্ন স্বরূপ আমার নিকট রাখিয়াছি।

২৪শে কার্ত্তিক, বুধবার—মা বেলা প্রায় ৯টায় উঠিয়া বসিলেন। মুখ ধুইতে বলিলে বলিলেন, "আরও পরে।" চুপ করিয়া

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় ১০টায় হাত মুখ ধোয়াইয়া কিছু খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। মা'র আজ কাল প্রায় কিছুই হজম হইতেছে না। একটা বেদনা হয়। অতি সামান্যই আহার করেন, তা'ও হজম হয় না। দেখিয়াছি মা'র শ্বাসের গতি কত সময় কত ভাবে চলে। সেই সব সময় ঠিক ঠিক মত খাওয়ার ব্যবস্থা না করিয়াই আমরা মা'র হজমের গোলমাল করিয়া বসি।

আজ খাওয়ার পর মা বেশীক্ষণ শুইলেন না। বসিয়াই নানা-ভাবের কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। রমণা আশ্রমের কালী-বিগ্রহ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "কাহারও কাহারও প্রশ্ন জাগিয়াছে, যদি কালীর অঙ্গ-হানি হয় তবে কি করা যাইবে? তাহার উত্তর এই যে, মানুষের এমন অঙ্গ আছে, যাহা নষ্ট হইলে আর জীবন থাকিতে পারে না। বিগ্রহের যদি এমন কোন অঙ্গ-হানি হয়, তার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়াল তুলিয়া দেওয়া হইবে, পূজা বন্ধ হইবে। নতুবা যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে।" যখন এই কালীর হাত ভাঙ্গিয়া গহনা চুরি করে তখন জ্যোতিষ দাদা কাশীর পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এই কালী প্রতিমার পূজা করা চলিবে কি না? তিনি পণ্ডিতদিগকে সব কথা ভাঙ্গিয়া লিখিয়াছিলেন।

রমণাস্থিত কালী বিগ্রহের অঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গে বিবৃতি।

কাশী হইতে মহামহোপাধ্যায় অন্নদা তর্ক চূড়ামণি মহাশয় জবাব দিলেন, বিগ্রহের অঙ্গ-হানি হইলে মূর্ত্তি-বিসর্জ্জন দেওয়াই সাধারণ বিধি, কিন্তু এ বিগ্রহ মহাপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্রে আছে এ অবস্থায় মহাপুরুষ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। মা'ও বলিলেন, "তোমাদের বাপ, মার যদি হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়, তোমরা কি তাঁহাদিগকে ফেলিয়া দাও?" মার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ দ্বারা

শ্রীশ্রীকালীর হাত জোড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা বলিলেন, "কালীর দরজা খুলিবার ভার যোগেশ বাবুর উপর। অনেকের ভিতর প্রশ্ন জাগিয়াছে, 'তঁহার অভাবে কে দরজা খুলিবে?' তার উত্তরে বলা হইতেছে, যোগেশবাবুদের মধ্যে কেহ, অথবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ এই কাজ করিবে। নিজের ছেলেরা, কি সুরেনবাবুর ছেলেরা, কি অপর কোন আত্মীয় এই কাজ করিবে।"

রাত্রি প্রায় ১১টায় মা শয়ন করিলেন। হরিরাম, নরেশবাবু ও আমরা দুই তিন জন বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। হঠাৎ মার বেদনা বাড়িয়া উঠিল। নরেশদাদা বলিতেছেন, 'মা, এসব হয় কেন? বেদনাটাকে সরাইয়া দাও।' মা সহাস্যে বলিতেছেন, "তোমাদের কি সরাইয়া দেই? উহাদের কেন সরাইয়া দিব। তোমরা যেমন, উহারাও যে আমার নিকট ঠিক তেমনি।" নরেশদা বলিলেন, "একি কখনও হয়? আমরা যেমন উহারা কেন তেমন হইবে?" মা বলিলেন, "সত্য বলিতেছি, উহারাও যে আমারই অঙ্গ। সরাইয়া দিব কি?" অনেকক্ষণ বেদনা চলিবার পর কমিয়া আসিল। সারারাত্রিই মা বেশীক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

২৫শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার—আজও প্রায় ৯টায় মা উঠিয়া বসিলেন। ভোগের পর মা বসিয়া আছেন। দুইটী বিধবা স্ত্রীলোক মাকে দেখিতে আসিলেন। শুনিলাম এখানে 'স্বয়ম্‌জ্যোতিঃ' নামে এক গুজরাটী মাতাজী ছিলেন। এখানে তাঁর আশ্রম আছে। ইঁহারা তাঁহারই শিষ্যা। ইঁহাদের গুরু-ভগ্নী, আর একটী মহিলা ও ইঁহারা দুইজন সেই আশ্রমে থাকেন। একজনের নাম "শিবজ্যোতি।" ইনিই এখন গুরুমাতার গদিতে বসিয়াছেন। কিছুকাল মা'র সহিত আলাপ করিয়া, যাইবার সময় মাকে তাঁহাদের আশ্রমে

যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন, বৈকালে ৫টায় আসিয়া মাকে নিয়া যাইবে স্থির হইল। ইহারা প্রায় ১০।১২০ বৎসর নর্ম্মদার তীরে আশ্রম-জীবন যাপন করিতেছেন। যাইবার সময় ইহাও আমাদের বলিয়া গেলেন, "আপনাদের যখন যাহা দরকার হইবে আমাদের বলিবেন। সাধু মহাত্মাদের সেবাই আমাদের জীবনের ব্রত। আশ্রমের সব আপনাদেরই" ইত্যাদি। মাকে বলিতেছেন, "আমাদের তিনজনকেই আপনার সঙ্গে নিয়া চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে থাকিয়া আপনার সেবা করিব।" গঙ্গাচরণবাবু কলিকাতা হইতে পেন্‌সানের পর চাকুরি নিয়া বরোদা ষ্টেটে আসিয়াছেন। কাল হরিরামবাবু তথায় গিয়াছেন। মাকে দর্শন করিবার জন্য তারা খুব উৎসুক হইয়াছেন। মার সম্প্রতি কোথাও যাইবার ভাব নাই বলিতেছেন।

শিশুরা বৈকালে আসিয়া মাকে স্বয়ম্‌জ্যোতিঃ আশ্রমে নিয়া গেলেন। বেশ আশ্রমটি। মা আশ্রমের বারান্দায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। মা আসিয়া ছোট্ট ছাদটীতে বসিলেন। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, নর্ম্মদা দেখা যাইতেছে। এদিকে কয়েকটি মন্দির ও আশ্রম ছাড়া আর কোন গৃহস্থের বাড়ী নাই। কয়েকটি বড় বড় গাছ আছে, বেশ স্থান। এই ধর্ম্মশালার বাসিন্দারা মার কাছে এতদিন আসেন নাই আজ ধীরে ধীরে সকলেই মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। স্বয়মজ্যোতিঃ মাতাজীর আশ্রম হইতে ফিরিবার পথে দেখিতেছি মাকে সকলেই চারিদিক হইতে প্রণাম করিতেছেন, আর সকলের মুখেই এক কথা—'মনোহর মুরলীধরের মন্দিরে যে এক মাতাজী আসিয়াছেন, তিনি একজন দর্শনযোগ্যা। এমন মূর্ত্তি বড় দেখা যায় না।' আর সকলে আসিয়া 'মা মহেশ্বরী', 'মা নর্ম্মদে' বলিয়া প্রণিপাত করিতেছেন।

২৬শে কার্ত্তিক, শুক্রবার—আজ বরোদা হইতে রুক্মিণীবাই মাকে দর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩।৪ ঘন্টা থাকিয়া পুনরায় বরোদা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন,: বিশেষ ঠেকা আছে। সময়াভাব তবুও একবার মাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছেন। আজও মার পেটে অল্প বেদনা চলিতেছে, কখনও অনুভব করেন, কখনও করেন না। আজও দুপুর বেলা বেশী সময় শুইয়া থাকেন নাই। শুইবার ভাবটা কোন কোন সময় খুব বেশী থাকে, সেই কয়দিন বেশী সময় পড়িয়াই থাকেন, আবার কখনও শুইবার ভাবটা বড়ই কমিয়া যায়, সেই কয়দিন বেশী সময় বসিয়াই কাটান। অথবা শুইলেও, 'শরীরটা স্থির থাকিতেছে না' বলিয়া আবার উঠিয়া বসেন। মার কৃপায় রুমা দেবীর ভাব জাগিতেছে ও নানারূপ দর্শন হইতেছে।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, কেহ হয়ত মাকে নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলিতেছে, "মা আমার এই সব প্রেরণা আসে, এই সব অবস্থা হয়।" মা সহানুভূতির সহিত কথাগুলি শোনেন; তাহার ভাব ত নষ্ট করেনই না বরং উৎসাহ দেন। কিছুদিন পরে ধীরে সুস্থে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন আরও উন্নততর, উন্নততম কতরকম অবস্থা আছে। নিজের ইচ্ছাশক্তিটাই যে কত সময় ভগবানের প্রেরণা বলিয়া মনে হয়, জড় অবস্থাটা যে কত সময় সমাধি বলিয়া মনে হয়, তাহা ধীরে ধীরে শান্তভাবে বুঝাইয়া দেন। আজও সেই সব কথা উঠিল। মা বলেন, "নিজের অবস্থাটা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে আমার এই অবস্থায় ভগবানের শুদ্ধ প্রেরণা আসা সম্ভব কি না? এটি খাঁটি ভগবৎ-প্রেরণা, না, মনেরই একটা ধারণা মাত্র? এইসব বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখা

নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ভাল করিয়া বিচার করা দরকার।

দরকার। আবার নানাপ্রকার বিভূতি আসিয়া পথরোধ করিলে সেগুলিকে নির্ম্মমভাবে দূর করা উচিত, তাহাতে অগ্রসর হওয়ার পথ পরিষ্কার হয়।”

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাকে ছাদে আনিয়া বসান হইল। প্রায় সারা দিন-রাত্রিই মা বিছানায় বসিয়া কাটাইলেন। পূর্ব্বে একটু পথ্য খাওয়ান হইল। একটু রাত্রি হইলেই মা আবার গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। শ্রীরামচন্দ্রের একটা গান গাহিলেন। কএটুপরেই শ্রীকৃষ্ণের কথা উঠিল; নরেশদাদা মধুর ভাবের কথা বলিতেছিলেন। মা অমনি বলিলেন, “মধুর ভাব হইল স্বয়ংপ্রকাশ; ও ত একটা বিশেষ কথা। সমাধির বিশেষ স্তরে না গেলে ইহা বুঝিবার অধিকার কোথায়? শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের চরম অবস্থা বা পূর্ণ পরিণতিই হইল মধুর ভাব। সমাধিতে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণাহুতি হয়, কাজেই তখন অতীন্দ্রিয় মধুর ভাবের প্রকাশ তাহার কাছে হওয়া স্বাভাবিক। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস করিতেছেন। এই যে তাঁহার একদিকের কথা, এটাকে ব্যবহারিক জগতে মানুষ নিজেদের ভাব আরোপ করিয়া এই ভাবটাকে যেন কেমন করিয়া তুলিয়াছে, তাই কাহারও কাহারও মুখে শোনা যায়, রাধাকৃষ্ণের ভাবটা ভাল লাগে না। এই জন্যই শোনা যায়, যে বৃন্দাবনলীলার গোপিনী হইয়াছিলেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা।” এই কথা শুনিয়া নরেশদাদা বলিলেন, “মা, একস্থানে পড়িয়াছি, রাম যখন বনে ছিলেন তখন এক সময়ে ষষ্ঠ সহস্র ঋষিরা রামের সহিত পতিভাবে মিলন চাহিয়াছিলেন। তাহাতে বাধা দিয়া রাম বলিলেন, ‘সে কি! আমি এক-পত্নীক; একমাত্র সীতাই আমার পত্নী।’ তখন ঋষিরা বলিলেন, ‘আমরা যে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি তোমার

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা, অদ্বৈতের খেলা।

সহিত মধুর ভাবের লীলা হইবে।' তখন রামচন্দ্র বলিলেন, 'তোমরা আরও অপেক্ষা কর। দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতারে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে তখন তোমরা গোপিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। এবং মধুর রস আস্বাদন করিবে।"

তারপর সাংখ্য ও বেদান্ত প্রসঙ্গে বেদান্তের মায়ার কথা উঠিল। নরেশদাদা বলিলেন, "বেদান্তে পরিষ্কারভাবে মায়া বুঝাইতে পারে নাই। মায়াকে অনাদি ও অনীর্ব্বচনীয় বলিয়া শেষ করিয়াছে।" তখন মা চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন, হঠাৎ হাসি তামাসায় আপন মনে বলিতে লাগিলেন, 'মায়া কিনা, ম্যায় আয়া অর্থাৎ আমি আসিয়াছি। অর্থ হইল কি না, যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণই মায়া। ঐ 'আমিকে' বাদ দিলেই অদ্বৈতানুভূতি ; তখন আর মায়া নাই।"*

মায়ার অর্থ—'ম্যায় আয়া অর্থাৎ যতক্ষণ আমি আছি

এইসব কথার পর রাত্রি প্রায় একটায় শুইয়া পড়িলাম। মাকে এখন ২।১টী টমেটো সিদ্ধ, তরকারী সিদ্ধ, সামান্য একটু ভাত কি রুটী খাওয়ান হয়। বৈকালে সন্ধ্যার পর একটু দুধ-সাবু দেওয়া হয়, শিশুর মত খাওয়ান হয়।

২৭শে কার্ত্তিক, শনিবার—মা বেলা প্রায় ৮।০টায় উঠিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া স্থিরভাবে বসিয়াই রহিলেন। এমন কি সে অবস্থায় মুখ ধুইবার কথা বলিতেও আমি সাহস পাইতেছিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা পর মার চেহারার একটু পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, মুখ ধুইবে চল।"

'শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মীমাংসায় প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না' কথায় মার প্রতিবাদ।

---

* অহঙ্কার গ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপগুতে।
চন্দ্রবৎ বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ম্প্রভঃ-বিবেকচূড়ামণিঃ (শঙ্করাচার্য্য)

মা বলিলেন, "আর একটু পরে।" কিছুক্ষণ পর বেলা প্রায় ১০টায় মাকে মুখ ধোয়াইয়া দিলাম এবং একটু ঝোল-ভাত ও তরকারি সিদ্ধ (মসল্লা মিশ্রিত তরকারী মা বিশেষ খাইতে পারিতেন না।) খাওয়াইয়া দিলাম। পরিমাণ অতি সামান্য। খাওয়ার পর মা আবার তাঁহার ছোট বিছানাটিতে গিয়া বসিলেন। আমরা সকলে একে একে যাইয়া প্রসাদ নিয়া আসিলাম।

মা আজ দুপুরে নরেশদাদার সহিত নানা কথা কহিতেছিলেন। কাজ শেষ করিয়া আমিও গিয়া যোগ দিলাম। নরেশদাদা বলিতেছিলেন,—"চৈতন্য-দেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদটাই রসাস্বাদনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ভাব। এটি মানুষের চিন্তা-রাজ্যের শেষ কথা; এর চেয়ে সুন্দর জিনিষ মানুষ আর কোথাও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের মীমাংসায় প্রাণটা পরিতৃপ্ত হয় না।" মা অপর দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন, আমি ও নরেশদাদা এইসব কথা বলিতেছিলাম। শঙ্করাচার্য্যের মতবাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য শুনিয়াই মা ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যার যে বিষয়ের জ্ঞান নাই, সে সেই বিষয় কি করিয়া ধরিবে?" মার এই কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া নরেশদাদা লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং মহা আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার শঙ্করাচার্য্যের কথায় এইভাব কেন হইল? ইহাতে মনে হইতেছে শঙ্করাচার্য্যের জন্য তোমার বিশেষ দরদ। আমি এই কথায় একটী বিশেষ কিছু বুঝিয়া নিলাম; তাহা এখন প্রকাশ করিব না।" মা ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "কেন ভাই, কাল যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতেছিল তখনও মা চুপ করিয়া শুইয়াছিলেন, হঠাৎ ফিরিয়া কৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তবেই দেখুন, কৃষ্ণের প্রতিও ত দরদের কিছু কমতি

দেখা যাইতেছে না।" নরেশদাদা তখন আরও উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, এ'ত আরও বুঝিলাম। আমার মার সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিষয়ের সমাধান হইয়া গেল। সেই কথা সময়ে প্রকাশ করিব।"

বৈকালে মাকে একটু ফলের রস খাওয়াইয়া দিলাম। রৌদ্র পড়িয়া যাইতেই মাকে ছোট ছাদটীতে নিয়া বসাইলাম। কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আজও মাকে দুধ ও সাবুদানা খাওয়ান হইল। কিছুই খাইতে চাহেন না। পেটের বেদনাটা সব সময় থাকে না; মধ্যে মধ্যে অনুভব করেন, আবার হয়ত সে বিষয়ে খেয়ালই নাই। এইভাবেই চলিতেছে। মা ছাদেই বসিয়া আছেন, ভোলানাথও আসিয়া বসিলেন। অখণ্ডানন্দস্বামিজী, নরেশদাদা, দিদিমা, ও আমি মার কাছে কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া আছি। মধ্যে মধ্যে কোন কথা উঠিতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে।

বাজিতপুরের পাগল হরকুমারের কথা উঠিল। মা বলিতে লাগিলেন, "আমি ত তাহার সহিত কথা বলিতাম না ঘোমটা দিতাম, কিন্তু সে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে আমার কি দরকার। আমার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে তাহার একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রতিবেশীরা তাহার এই ভাবটা হয়ত পছন্দ করিত না, কিন্তু সে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিত না। আমার সমস্ত সাংসারিক অসুবিধা সে যথাসাধ্য দূর করিয়া দিত। সে কথা বলিত কিন্তু আমি বলিতাম না। সেজন্য কত দুঃখ করিত। শেষে ভোলানাথের আদেশে তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলাম। (নরেশদাদার প্রতি) হরকুমারের চেহারা অনেকটা তোমার সহিত মিলে।"

কিছু পরে ভোলানাথ খাওয়ার জন্য উঠিয়া গেলেন। নীচে রান্না হইত এবং একটী ঘরে ভোলানাথ, অখণ্ডানন্দস্বামী ও দাদামহাশয় থাকিতেন।

মা উপরের কোঠায় থাকিতেন। আমি, দিদিমা ও নরেশদাদা মার কাছেই শুইতাম। সকলে খাওয়া দাওয়া করিতে চলিয়া গেলেন। আমি মার কাছে বসিয়া বাতাস করিতেছি। নরেশদাদা খাওয়া দাওয়া করিয়া উপরে আসিলেন। দিদিমাও আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। মা তখনও ছাদে বসিয়া আছেন। জ্যোৎস্না রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধ, নর্ম্মদাতীরেই এই মন্দির, নদীটীও দেখা যাইতেছে। আমরা মার সহিত কথা বলিতেছি ; কত কথা উঠিতেছে।

নরেশদাদা মার কাছে দিন-রাত্রিই থাকেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বড় ওঠেন না। কত কথা মার সঙ্গে বলেন. বেশ সুন্দর ভাব। সংসারে এমন সুন্দর ভাব বড় দেখা যায় না। মাও ইঁহার খুব প্রশংসা করেন। ইনি সারদেশ্বরী মা'ার শিষ্য। মৈমনসিংহের লোক, কলিকাতায় প্রফেসারী করিতেছেন। কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল। মা উঠিলেন, আমরাও সকলে ঘরে আসিলাম। মা আসিয়া বিছানাটীতে শুইয়া পড়িলেন।

২৮শে কার্ত্তিক, রবিবার—কাল রাত্রিতে মা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। শুইয়া শুইয়া প্রথম গান ধরিলেন, "হরিনামের তরী বাঁধ ভাই, দেখ গগনে আর বেলা নাই।" তারপরও স্থির হইয়া শুইবার ভাবই নাই। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল ; আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ জাগিয়া দেখি মা গিয়া ছাদে বসিয়া আছেন। আমরা সকলে উঠিয়া পড়ায় আবার আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু সারারাত এই ভাবেই কাটাইলেন৷ স্থিরভাবে পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে এইরূপ হয়। আবার কখনও দেখা যায় দিন-রাতের মধ্যে বেশী সময়ই মা মুখে কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন। কখনও এর বিপরীত অবস্থা ; বলেন, শরীরটা চুপ হইতেছে না। স্থির

ভাবই নাই। মা সকালেও অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া বেলা প্রায় ৯টায় উঠিলেন। পরে হাত মুখ ধোয়াইয়া কিছু ভোগ দেওয়া হইল। আজও দুপুরে মার শুইবার ভাব দেখা গেল না, বসিয়া বসিয়া নরেশ দাদার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন; পরে আমিও যোগ দিলাম। কতবার বলিলাম, 'মা, তুমি একটু শুইয়া পড়।' মা বলিলেন, 'শুইবার ভাব নাই।' এইভাবে দুপুর কাটিয়া গেল।

কি উপলক্ষে স্ত্রীলোকের উপবীত গ্রহণের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল মা আজ সেই কথা বলিলেন। নরেশ দাদাকে বলিতেছেন, "কলিকাতার কুশারী মহাশয়ের বাসায় একদিন খুকুনি আমাকে সাবান দিয়া স্নান করাইয়া দিতেছে। গলার সরু হারটা খুলিয়া সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া যখন আবার এক লহরা করিয়া গলায় পরাইয়া দিল, তখন উহা পৈতার মত হইয়া গলায় পড়িল। আমি খেয়ালে খেয়ালে যেন লম্বা করিয়া মাপিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'খুকুনি দেখিয়াছ এটা ঠিক পৈতার মাপ।' ঠিক ঠিক সাম বেদের পৈতার মাপের মত বোধ হইল, ছোট বড় হইল না। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার খেয়াল হইল, এটা পৈতা এবং কাঁধের উপর পৈতার মত ফেলিয়া রাখিলাম। বৈকালে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া আছি; কুশারী মহাশয় খালি গায়ে দাঁড়াইয়া আছেন, দেখি তাঁহার গলায় পৈতা নাই। আমি বলিলাম, 'একি, আপনার গলায় পৈতা নাই কেন?' তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'কয়েক দিন হয় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বলিতেছি, কেহ একটা পৈতা ঠিক করিয়া দিতেছে না।' আমি বলিলাম, 'ঠিক করিয়া দিতেছে না বলিয়া গলায় পৈতা না দিয়া আপনি আছেন?

স্ত্রীলোকের উপবীত গ্রহণের কথা। প্রথমে কি সম্পর্কে উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবৃতি।

তবে এই যে সব ছেলেদের পৈতা দিয়াছেন, তারাও ত এই ভাবে পৈতা ফেলিয়া দিবে, কারণ আপনাকে দেখিয়া তাহারা এই শিক্ষাই পাইল যে, ব্রাহ্মণের পৈতা ছাড়াও থাকা চলে। যদি তাই হয় তবে অনর্থক খরচ-পত্র করিয়া পৈতা দেওয়ার আবশ্যকতা কি ছিল?' আমার এই কথায় তখনই ভোলানাথের গলা হইতে ত্রিদণ্ডী পৈতা নিয়া তিনি ধারণ করিলেন।

বৈকালে গেল এই ঘটনা। সন্ধ্যার পর আবার পৈতারকথা উঠিল। ঐ যে স্নানের সময় আমার পৈতার খেয়াল উঠিয়াছে, তাহারই জের চলিতেছে। সন্ধ্যার পর সকলে বসিয়াছে, আমি খেলায় খেলায় কুশারী মহাশয়ের স্ত্রীকে বলিলাম, 'ঠাকুরঝি, এই নেন, এটা পৈতা, আপনি আমাকে পরাইয়া দিন', এই বলিয়া হারটা তাহার হাতে দিলাম, তিনিও সেইরূপ খেলায় খেলায় তাহা আমার গলায় দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, 'বেশ, আমি ত ব্রহ্মচারী হইলাম, এখন ব্রতভিক্ষা দিন।' তিনি আমার আঁচলে টাকা, হরিতকী, আরও কি সব বাঁধিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, 'এখন ছেলেদের ডাকুন, পাঁচজনে আমাকে গায়ত্রী শুনাইবে। আমি নিজে পড়ি বা না পড়ি, আমাকে শুনাইবে।' তখন একে একে ছেলেদের ডাকিতে লাগিলাম। যে পাঁচজনকে ডাকিলাম, আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই পাঁচ জনের গলায়ই পৈতা নাই! তাহারা বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল যে ইহাদের গলায় পৈতা নাই জানিয়াই আমি এই কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছি। যাক্, পরে অখণ্ডানন্দ স্বামীজি ও আরও কয়েকজন মিলিয়া আমাকে গায়ত্রী শুনাইল।" পরদিন আমি বলিলাম, "আমার ত সব ব্যাপারই অল্প সময়ের জন্য হইয়া যায়, আমি এতটা সময় কায়স্থের মুখ দেখিব না', তাই করিলাম। পরে সেখানে সকলের গলায় পৈতা দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবেই প্রথম পৈতার খেয়াল জাগিল।"

কথায় কথায় আবার বলিতেছেন, দেখ, "একবার, আমার ডান চক্ষুটা তিন দিন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল, পরে খুলিয়া গেল।" একবার ডান হাত অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিতেই বলিলেন, "হাঁ, চার মাস অবশ ছিল। তাহারও বিশেষ কারণ আছে।" বিশেষ অনুরোধ করায় কারণ বলিতে লাগিলেন, "টাঙ্গাইল হইয়া আমরা তখন কাশীর দিকে যাইতেছিলাম। নন্দু তখন খুব মিশামিশি করিত; ছেলেমানুষের মত ভাব ছিল। সে আমাদের সঙ্গে যাইবে বলিল; কিন্তু শেষে গেল না। আমি বলিলাম, 'তুই যাবি বলিয়াছিলি, যাবি না কেন?' কিন্তু দুষ্টামি করিয়া আর গেলই না। শেষে যখন আমার শরীর কি রকম হইয়া গেল, তখন সে ভয় পাইয়া আমার ডান হাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিল, 'মা, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।' পরে যখন শরীরটা স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল এবং আমরা কাশী রওনা হইলাম, তখন নন্দু আবার যাইতে অস্বীকার করিল। শেষে যাওয়ার সময় বাস্তবিকই সে গেল না। তখন খেয়াল হইল যে ডান হাতখানি ধরিয়া নন্দু আসিবে বলিয়া কথা দিল কিন্তু তারপর আসিল না। এতে ত ওর ভয়ঙ্কর অমঙ্গল হইবে, অথচ ও ত তাহা বুঝিতেছে না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই। আমার হাতখানি তখনই অবশ হইয়া গেল, উহার অমঙ্গল কাটাইবার জন্যই এই ভাবটা হইল। চার মাস হাতটা অবশ ছিল।"

আবার কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন, 'বয়ানী পূজা বাবার কল্যাণে তোমাদের বাসায় বয়ানী পূজা হইল। বলির সময় পাঁঠার কান কাটা গেল। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'এ হইলে কি করা দরকার?' পুরোহিত বিশেষ কিছুই জবাব দিতে পারিল না। এই শরীরটা বলিল, 'পাঁঠা বলির সময় যদি কানটা

কাটা যায় তবে অঙ্গহানি বলি হইত না?' সেই পূজার সময় ৩।৪ দিনের জন্য এই শরীরটাকে তোমাদের বাসায় নিয়াছিল। আসিবার সময় তোমাদের দোতলা হইতে নামিতে আমার পায়ের পাতায় চোট লাগিয়া হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া গেল। ইহার কারণ, পাঁঠার গলা সম্পূর্ণ কাটা হওয়ার আগে না পরে কান কাটা গিয়াছে, কে বলিবে? যদি গলা সম্পূর্ণ কাটার পূর্ব্বেই কান কাটা হইয়া থাকে, তবে ত অঙ্গহানি অবস্থায় বলি হইল; তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই এ শরীরটার উপর দিয়া সেটা কাটিয়া গেল। এইরূপই হয়। আমি ত নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না কিন্তু **যে এই শরীরটার উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করে তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকিলে, কোন সময় এই শরীরটার উপর দিয়াই একটা কিছু হইয়া যায়।"** মার চরিত্রের একটা বিশিষ্ট দিক এই সব ঘটনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অল্প বিপদের সাহায্যে গভীর বিপদ কাটানো হয়।

সন্ধ্যায় আবার ছাদে বসিয়া কথা হইতেছে; আজও অনেক রাত পর্য্যন্ত আমি, মা, নরেশদাদা ও দিদিমা ছাদে কাটাইলাম। মা পরে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু এখনও শোওয়ার ভাব নাই। নরেশদাদা বলিতেছেন, "আচ্ছা মা, আমরা যে ভুল করিয়া এত কষ্ট পাই। এতে তোমার কষ্ট হয় না? এই দেখ না, একটী ছোট ছেলেকে মাটি খাইতে দেখিলে আমরা অমনি তাহাকে বাধা দিয়া সরাইয়া দেই এবং বুঝাইয়া দেই মাটি খাইতে নাই; আগুনে হাত দিতে গেলে ছুটিয়া গিয়া সরাইয়া নেই। আর তুমি মা হইয়াও আমাদের দেখ না বা দেখিয়াও বেশ চুপ করিয়া বসিয়া থাক, এ কি করিয়া হয়?" মা হাসিয়া

বলিলেন, "আবার দেখ কখনও কখনও দেখিয়াছি ছোট ছোট ছেলে-পিলে লণ্ঠনের মধ্যে হাত দিতে গেলে মা তাহার হাত ধরিয়া একটু লণ্ঠনের গায়ে লাগাইয়া ছেঁকা দিয়া দেন। ইহাতে বালকের এমনই শিক্ষা হয় যে সে আর ঐ দিকেই যায় না। অল্প দুঃখ দিয়া বেশী দুঃখের হাত হইতে মা তাহাকে বাঁচাইয়া দেয়। না জানিয়া সে হয়ত একবার হাত দিয়া হাতটা পুড়িয়াই ফেলিত কিন্তু এখন একটুখানি ছেঁকা দিয়া মা তাহাকে বিষম বিপদ হইতে রক্ষা করিল।

আজও সারারাত্রি মার শুইবার ভাব দেখা গেল না। মধ্য রাত্রিতে একটু শুইলেন বটে, কিন্তু তেমনভাবে স্থির থাকিতে পারিলেন না।

২৯শে কার্ত্তিক, সোমবার—সকালে মা উঠিয়া বসিতেই চান্দোদের টিকমজীর মন্দিরের মোহন্ত আসিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি মাকে টিকমজীর মন্দিরে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন। আমরা চান্দোদে ইহার মন্দিরেই ছিলাম। মা বলিলেন, "খেয়াল হইল, নর্ম্মদার তীরে আসিয়া এখানে কিছুদিন থাকিব, তাই আছি; আবার মেয়ের যখন ইচ্ছা হইবে, বাবার কাছে যাইবে।" মোহন্ত মহারাজ বলিতেছেন, "মা, আপনিই দেবী নর্ম্মদা, আপনার আবার নর্ম্মদা দর্শনের কি প্রয়োজন? আপনি চান্দোদে থাকিলে আমি সর্ব্বদা দেখা শুনা করিতে পারি, এখানে থাকিলে সেটা সম্ভব হয় না কারণ এ স্থান মাইল খানেক দূর, ওখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হইবে না।" কিন্তু মা আপাততঃ এইখানেই থাকিবেন এই ভাবের কথাই বলিয়া দিলেন। তিনিও, ইচ্ছা হইলেই মা যেন চান্দোদ চলিয়া যান, এই সব অনুরোধ জানাইয়া গেলেন।

কাল দুইটী লোক আসিয়া জানাইয়া গিয়াছে যে চান্দোদের

একজন পাণ্ডার কর্ণালীতে একটী বাড়ী আছে, তাহাতে থাকিবার জন্য পাণ্ডামহাশয় মাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। মার যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয় সে জন্য তিনি নিবেদন জানাইতেছেন যে তিনি সমস্ত বাড়ীটা মার সেবার জন্য ছাড়িয়া দিতে চান। মা কৃপাপূর্ব্বক সকলকে নিয়া সেখানে থাকিলে তিনি কৃতার্থ হইবেন। এই পাণ্ডা মহারাজ নাকি একদিন আসিয়া মাকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই আবেদন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম না, কারণ মার এইরূপ কাণ্ড কতই দেখিতেছি। ২।১ দিনের পরিচয়েই সকলে যেন সেবার জন্য আকুল হইয়া ওঠে। বলিয়া দেওয়া হইল, মা গৃহস্থের বাড়ীতে থাকেন না। এখন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী স্ত্রী-পুরুষ মাকে দর্শন করিয়া যাইতেছেন। কথা-বার্ত্তা বড় বোঝেন না, শুধু দর্শন করিয়া ফল-মিষ্টি দিয়া 'মা নর্ম্মদে, মা মহেশ্বরী'—বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বিদায় নিতেছেন। এখানকার গীতা-মন্দিরে সাত দিন ভাগবত পাঠ হইল। সেই উপলক্ষে এবং ওড় নদী ও নর্ম্মদার সঙ্গমস্থলে স্নান করিতে এই সময় অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। নরেশ দাদা বলিতেছেন. "মা, তুমি যে সকলকেই কথায় কথায় হাতযোড় করিয়া বল, 'তুমি আমার পিতাজী, আমি ছোটী বাচ্চি" এই মিষ্টি কথায়ই সকলের উদ্ধত, অহঙ্কারের ভাবগুলি শেষ করিয়া দাও। অনেক সাধু-সন্ন্যাসীদের উদ্ধত ভাব; ইঁহারা মনে করেন তোমারও বুঝি সেই ভাবই হইবে। তাই প্রথমে তোমার সঙ্গে বেশ একটু দম্ভের সহিত কথা-বার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করে কিন্তু শেষে তোমার ঐ "আমি ত বাচ্চি হ্যায়, আমি ত কিছুই জানি না" এসব কথা শুনিয়া ও তোমার ভাব দেখিয়া একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।" শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

আজ দুপুরে ভোলানাথ আমাকে বলিলেন, "তোমাদের মার পিতৃ-

বংশে 'নাপিত খোটা' (দোষ) আছে"—এই বলিয়া তামাসা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। পরে দাদামহাশয়, দিদিমা প্রমুখ সকলের নিকট ঘটনাটি এইরূপ শুনিলাম :—দাদামহাশয়দের বংশে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল কালীকান্ত বিশারদ। তিনি খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু একটী নাপিতের ছোট্ট কুমারী কন্যাকে পূজা করিতেন। তাহার মধ্যে তিনি নাকি ইষ্ট-মূর্ত্তি দর্শন করিতেন। এই মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়া তিনি সকল স্থানে যাইতেন। এই নিয়া সমাজে একটা নিন্দা উঠিল যে, কালীকান্ত বিশারদ একটী নাপিতের মেয়েকে কাঁধে নিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু এই কথায় তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই।

একটি ঘটনা।

একবার এক বাড়ীতে (বিদ্যাকূটে) পণ্ডিতদের সভা হয়। তাহাতে কাশীর পণ্ডিতরাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কালীকান্ত বিশারদও নিমন্ত্রিত হইয়া সেই সভায় ঐ নাপিতের কন্যাকে নিয়াই উপস্থিত হন। বিশারদ মহাশয়ের নিয়ম ছিল, তিনি কোন কথা ঐ নাপিত-কন্যাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া জবাব দিতেন না। কাশীর একজন পণ্ডিত কালীকান্ত বিশারদকে কি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাব দিবার পূর্ব্বে তিনি নাপিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেই কন্যা বলিল, "তুমি বল, উহার মুখ উচ্ছিষ্ট; উহার প্রশ্নের আবার জবাব দিব কি?" এই কথায় সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

তখন পরীক্ষার জন্য ডাবর ও জল আনা হইল এবং কাশীর পণ্ডিত মুখে জল দিয়া কুলকুচা করিয়া ডাবরে ফেলিতেই দেখা গেল ভাতের এক অংশ পড়িয়াছে। এই ঘটনায় সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং নাপিত-কন্যা সম্বন্ধে সকলেরই একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিল। তবুও সকলে সামাজিক শাসনের অধীন, তাই একদিন কালীকান্ত বিশারদের বাড়ীতে

নিমন্ত্রণ হইলে কেহই তাঁহার বাড়ীতে যাইতে রাজী হইলেন না, কারণ তিনি নাপিত-কন্যাকে পূজা করেন। শেষে অনেক কথার পর সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা হইল। সকলে যখন সেই সভায় খাইতে বসিয়াছেন তখন জল, দৈ, বা কি একটা জিনিষ নিয়া সেই নাপিত-কন্যা সভায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই কেহ কেহ তাঁহার মধ্যে কালীমূর্ত্তির প্রকাশ দেখিলেন। এর পর হইতেই কন্যাকে সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে লাগিলেন।

আজ দাদামহাশয় দ্বিপ্রহরে আসিয়া বসিলেন এবং একটা গান ধরিলেন। মাও উঠিয়া বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। গানটী এই :—

রাধা মম প্রাণ, রাধা মম জ্ঞান
রাধা মম ধ্যান, রাধা নাম সার ॥
প্রেমময়ী রাধা রাধা অদ্ধ আধা
রাধা নাম সাধা বাধা নাহি তার ॥
আমি দিবস রজনী, রাধা নাম ধ্বনি
করি মাত্র জানি রাধা মুলাধার ॥
রাধা আদ্যাশক্তি, রাধা ভক্তি মুক্তি,
রাধা অনুরক্তি, ভক্ত শ্রীরাধার ॥
শ্রীরাধিকা যন্ত্রে, দীক্ষা রাধা মন্ত্রে
করি বাঁশী যন্ত্রে, নয় রন্ধ্রে ফুৎকার ॥
সে তন্ত্রে সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সপ্তমা
আলাপ সংযমে বাজে সহস্রার ॥

গানের পর আবার কথা বার্ত্তা চলিল। নরেশদাদাই এখন নানা ভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া ঘরখানা জমাইয়া রাখেন। ভাবটা এঁর সরল, শুদ্ধ

ও সুন্দর। মা'ও এঁর কথা খুব শোনেন ও বলেন, "কোন কারণে এই ভাব থাকা সত্ত্বেও সংসারে থাকিতে পারিতেছে।" প্রতিদিনের মত আজও সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটু দুধ-সাবু খাওয়াইয়া মাকে নিয়া ছাদে বসান হইল। মা মোটেই হাঁটেন না। পায়খানায় যাওয়ার সময় যা একটু হাঁটা হয়। আজ সকালে একটু নামিয়া গিয়া মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ বসিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত মা ছাদে বসিয়া রহিলেন, পরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু নরেশদাদার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। আজও রাত্রে মার শুইবার ভাব নাই।

৩০শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার—মা সকালে উঠিলেন। পূজারীর স্ত্রী মাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিলেন। পরে মাকে হাত ও মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। ভোগের পর সারা দুপুর মা কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন; আমি ও নরেশদাদাই প্রায় সব সময় মার কাছে বসিয়া নানা কথা বার্ত্তা বলি। মধ্যে মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী, ভোলানাথ ও দাদামহাশয় আসিয়া যোগ দেন। আজও মা দাদামহাশয়ের সঙ্গে নিম্ন লিখিত গান দুইটী গাহিলেন :—

১। "আমি কি তার সঙ্গ ছাড়া হই—
যে জন কাতর প্রাণে ডাকে আমায় মা কই মা কই?
হৃদয়ে জাগায়ে আঁরে, নামে প্রাণ মাখা থাকে,
আর কিছু না দেখে চোখে, এ ব্রহ্মাণ্ডে আমা বই।
অন্য কথা কয় না মুখে, ব্যথিত হয় সে ব্যথিত দেখে।
সমান থাকে সুখে দুঃখে, লোকের নিন্দা শোনে কই?
শিশু যেমন মাকে ডাকে, মা ডাকে তার আঁখি ঝরে
পারি কি আর থাকতে দূরে, অমনি এসে কোলে লই।

মনোমোহনের মন দুরাচার, শিশুর মত স্বভাব কই তার
মা ডাকের আর নাই পারাবার, মা আমার (ঠিক)
আমি মার কই ॥"

২। "মা ডাক শোনে না দেখা দেয় না, (কথা কয় না)
মা বুঝি মোর বেঁচে নাই।
আমি করব শ্রাদ্ধ (রে), হব শুদ্ধ
যদি কৃষ্ণা একাদশী পাই ॥
আমি হয়েছি কুপুত্র অতি অপবিত্র
পিতামাতার যত্ন করি নাই।
আমি করব তিল পাত্র (রে), দিব পিণ্ড মাত্র
দেখাইব আমার কিছু নাই ॥
পিণ্ড প্রয়োজন মাত্র, জন্মিলে সুপুত্র
শাস্ত্রে আছে শুনতে পাই।
আমি মাতৃ নিরুদ্দেশে (রে) থাকি কি বিশ্বাসে
বেনাপুরে শ্রাদ্ধ করতে চাই ॥
আমার মন বৃষটী আছে বেঁধে দিব গাছে
টাকার জন্য কোন ঠেকা নাই।
আমি করব বৃষোৎসর্গ (রে), যদি পাই স্বর্গ
অপবর্গ হলেও ক্ষতি নাই ॥
থাক পুরোহিতের মন্ত্র, পুরোহিতের মুখে
মন্ত্র কইলে তন্ত্র ভুলে যাই
আমার মা মহামন্ত্র (রে), তার মন্ত্র কি স্বতন্ত্র
বাবার তন্ত্রে হেন লিখা নাই ॥

দ্বিজ ঈশান বলে মন, হেন বুদ্ধি কেন
শ্রাদ্ধ দিয়ে আর কার্য্য নাই।
আছে মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী (রে), মৃত্যু বিনাশিনী
শিবানীর নাকি মরণ নাই॥"

আজ দিদিমা এখানে কার্ত্তিক-পূজা করিলেন। ভোলানাথই পূজা করিলেন। মা ও আমরা সকলেই পূজার কাছে মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া আনন্দ করিলাম। পরে ভোলানাথের কথায় মাকে আজ সামান্য ভাত দুধ-সাবুর সহিত দেওয়া হইল। মা ও ভোলানাথ খাইতে বসিয়াছেন, দিদিমা মাকে খাওয়াইয়া দিতেছেন। মা আজ দুষ্টামি আরম্ভ করিলেন। ভোলানাথকে বলিলেন, "দেখি ত, তুমি কি দিয়া খাইয়াছ?" ভোলানাথও নিজের থালা হইতে মাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমরা দেখিতেছি মার বহুপূর্ব্বের ভাবটা আবার আরম্ভ হইয়াছে। মোটেই কিছু খাইতে চাহেন না, আজ বলিতেছেন, "দেও কি দিবে?" ভোলানাথ কয়েক গ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন, দুধ সাবুও খাইলেন, আরও খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আমরা আর দিতে সাহস পাইলাম না। শেষে বলিলেন, "মূলা আছে ত? কাঁচা মূলাই দাও, কি আর করি?" শেষে আমি ২।১ টুকরা কাঁচা মূলাই খাওয়াইয়া দিলাম। পরে আমাদের অনুরোধে ভোজনের আসন ত্যাগ করিলেন। নরেশদাদা মার এই ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া বলিতেছেন, "মা, তোমাকে আমি যতই দেখিতেছি ততই অবাক হইয়া যাইতেছি। তোমাকে কিছুই বাঁধিতে পারে না, এই শিক্ষাটাই তোমার কাছে থাকিয়া পাইতেছি। আজও জ্যোৎস্না রাত্রে আমরা বহুক্ষণ ছাদে কাটাইলাম। নরেশদাদা মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া মুগ্ধ হইয়া কত কি বলিতেছেন। আজ কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোক মাকে দর্শন করিতে

আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন নর্ম্মদা প্রদক্ষিণ করিয়াছেন ; শুনিলাম প্রদক্ষিণ করিতে চারি বৎসর লাগিয়াছে। পরিক্রমার রাস্তায় মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে এবং তাহাতে দান-ছত্রও আছে।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার—মা বেলা প্রায় ১১টায় উঠিলেন। হাত মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর ভোগ হইল। ভোগের পর নরেশদাদার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে মা নিজের বিছানায় বসিয়া আছেন, আমি ও নরেশদাদা কাছে বসিয়া আছি, দিদিমা পাশে শুইয়া আছেন। নানা কথা হইতেছে। মার ভাবের একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। নরেশদাদা হঠাৎ মার কোলে মাথা রাখিয়া পরে মাথাটা পায় লুটাইয়া দিলেন, কেমন একটা অস্থির ভাব দেখা গেল। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তিনি মার মুখে শিবের মত শুভ্র জ্যোতি দেখিয়া ঐরূপ করিতেছিলেন এবং জ্যোতিঃ তখনও পরিষ্কার প্রকাশিত রহিয়াছে বলিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

কিছুক্ষণ তাঁহার সেই ভাব ছিল ; আমি চুপ করিয়া বসিলাম। মা'ও কথা বন্ধ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "নরেশদাদা, বেশী সময় এ ভাবে থাকা ঠিক নয়, মায়ের ভাবের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন আসিতে পারে।" তখন আমরা দুজনে মাকে ডাকিতে লাগিলাম, মা সাড়া দিলেন না। ঐ ভাবেই বসিয়া আছেন, একটু পরেই মা যেন চোখ টানিয়া খুলিয়া জড়িত স্বরে বলিলেন, "আমি ত ঠিকই আছি, এমনি বসিয়া আছি, তোমাদের ডাক শুনিতেছি কিন্তু কথা বাহির হইতেছিল না।" আমি বলিলাম, "মা এখন একটু শুইয়া থাক।" মা'ও "আচ্ছা" বলিয়া শুইয়া পড়িলেন।

২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—আজও মা অনেক বেলায় উঠিয়া বসিলেন। মুখ ধোয়াইয়া দিতে চাহিলে বলিলেন, "এখন নয় ;

তোমাদের নিত্য-নিয়মিত আইন-কানুন মত শরীরটা সব সময় চলিতে পারে না। কখনও ত চলে নাই দেখিয়াছ। এই যে রোজই এক সময়ে খাওয়া, ওঠা, বসা. এই নিয়মমত সব সময় শরীরটা চলিতে পারে না, কি করিব বল?" এই বলিয়া বসিয়া রহিলেন। তখন কথায় কথায় রমণা আশ্রমের কথা ও সিদ্ধেশ্বরীর আদিকথা উঠিল। মা বলিতেছেন, আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছি। বেলা প্রায় ১টায় মা স্নান করিবেন। কাল আমি ও নরেশদাদা স্নানের কথা বলায় মা বলিয়াছিলেন, "কাল দেখা যাইবে"। মাকে স্নানাদি করাইয়া দিলাম। বেলা প্রায় ২টায় ভোগ হইল। ভোগের পর মায়ের শরীরটা আজ একটু কেমন যেন করিতে লাগিল। আমি মেরুদণ্ড ঘসিয়া ও শরীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। মা চোখ বুজিয়া রহিলেন। একটু পরেই কয়েকজন দর্শনার্থী আসায় মা চোখ খুলিয়া শুইয়াই রহিলেন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "একটা কিন্তু ভয়ানক ঝড় দেখিলাম, যেন জলাশয়ের সামনে। আবার অল্প সময়ের মধ্যেই ঝড়টা থামিয়া গেল।" আমরা বলিলাম, "মা এটা কোনদিক হইতে?" মা হাসিয়া বলিলেন, "এখন তোমরা বুঝিয়া দেখ।" আবার বলিতেছেন, "দেখ, প্রথম যখন বাবা বলিলেন, 'হরির নাম কর, হরিই সব'। তার পরে হরির নামই করিতে লাগিলাম। বাবা শাক্ত, কিন্তু হরির ভাবটা যখন প্রবল ছিল তখন আমাকে ঐরূপ বলিলেন। আমারও হরি নামে শরীরে কত রকম ক্রিয়া হইতে লাগিল। পরে ভোলানাথের কাছে আসিলে তাহাদের বংশ নাকি শৈব ও শাক্ত এই কথা বলিল। পরে এই শরীরে আবার সেই সব ক্রিয়াদিও হইয়াছিল। আর একটা তামাসা দেখ; ঘটনা-চক্রে তোমার দাদামশায় হরি নাম উপদেশ দিলেন, আর তাহাদের নারায়ণ চক্রটিও আসিয়া আশ্রমে স্থান নিল!"

একজন পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া মাকে নর্ম্মদাতীরে চান্দোদে একটী মঠে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মাকে চান্দোদ নিবার তাঁহাদের বড়ই আগ্রহ। হঠাৎ মা বলিলেন, "চল, চান্দোদ বেড়াইয়া আসি।" বেলা প্রায় ৪টার সময় আমরা সেই পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত মাকে নিয়া চান্দোদ চলিলাম। সেই মঠে গেলাম। মঠের দণ্ডী স্বামিজী মাকে তথায় রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মা বলিলেন, "খেয়াল হইলেই মেয়ে বাপের কাছে চলিয়া আসিবে।" টিকমজীর মন্দিরের মোহন্ত রাম রতনজীকে পুলিশ কর্ম্মচারীটী খবর দিতে চাহিলেন। মা নিষেধ করিলেন। কর্ম্মচারীটি বলিলেন, "তাঁহাকে খবর না দিলে, তিনি আমাকে খুব দোষারোপ করিয়া বলিবেন, মাতাজী আসিলেন তাঁহাকে কোন খবর দেওয়া হইল না।" তখন মা বলিলেন, "আমিই যাইব, তুমি খবর দিও না।"

মঠ হইতে বাহির হইলে আমি বলিলাম, "চল, টিকমজীর মন্দির হইয়া যাই।" মা বলিলেন, "চল"। আমরা মন্দিরের নিকট যাইতেই খবর পাইলাম মোহন্ত মহারাজ রাজপিপলা ষ্টেটের দেওয়ান সাহেবকে নিয়া মার দর্শনে কর্ণালী গিয়াছেন। আমরা ঘাটের কাছে আসিয়া নৌকায় উঠিলাম। ভবানীশঙ্কর পাণ্ডাজী, পুলিশ কর্ম্মচারিটী ও আরও দুই একটী লোক মার সঙ্গে আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। মাকে সুবিধামত রাখিতে সকলেই ব্যস্ত দেখিলাম, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা মাকে হয়ত একদিন মাত্র দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, এই ত পরিচয়! নৌকায় আসিতেই দেখা গেল দেওয়ান সাহেব ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি নিকটে আসিয়া মার নৌকায় উঠিলেন এবং মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, মোহন্ত মহারাজ তাঁহার এক ব্রহ্মচারীকে নিয়া হাঁটা পথে চান্দোদ

ফিরিয়া গিয়াছেন। সকলে বলিতে লাগিল মা গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া মোহন্ত মহারাজের আর ঘুম হইবে না।" মা বলিলেন "এই ত আরও ভালভাবে দেখা হইবে।" দেওয়ান সাহেব মাকে বলিলেন, "রাজপিপলার চৌদ্দ মাইল দূরে নর্ম্মদাতীরে মাটির নীচে একটী রণছোড়জীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; মানুষের সমান উঁচু হইবে। সেই মূর্ত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। আপনি যদি তাহা দর্শন করিতে যাইতে চান, তবে খবর পাইলেই আমি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" মা বলিলেন, "নর্ম্মদাতীরে আসবার কথা চলিতেছিল, এখন আসা হইয়াছে। কিছুদিন নর্ম্মদাতীরেই থাকা হইতেছে, পরে যাহা হইয়া যায়।" কিছুপরে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া সকলে বিদায় নিলেন। আমরাও কর্ণালীতে ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রিতে সকলেই খাইতে বসিয়াছেন, আমরাও সব আছি; ভোলানাথের বড় ভাই রেবতীবাবুর কথা উঠিল, মা'ও অনেক গল্প করিলেন। রাত্রিতে নরেশদাদা মাকে বলিতেছেন, "মা, আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি তোমার ভিতরটা ত একেবারে স্থির! অথচ বাহিরে এতভাবে লীলা করিতেছ। এমন চরিত্র কোথাও দেখা যায় না! আমার কেবলই মনে হয় সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষের মত তুমি সব দেখিয়া যাইতেছ। তুমি যখন গল্প কর, আমি অবাক হইয়া কেবলই তোমায় দেখি আর ভাবি কি করিয়া এমন দুইটা অবস্থা একজনের ভিতর একই সময়ে সম্ভব হয়? যতই তোমায় দেখিতেছি আর বুঝিতেছি, অবাক হইয়া যাইতেছি।" এই বলিয়া মার পায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। আজও অনেক রাত্রি অবধি কথা বার্ত্তা হইল।

৩রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—আজ ৩টায় নরেশদাদা, দাদা-মহাশয় ও দিদিমা কলিকাতা চলিয়া যাইতেছেন। রাত্রিতে মা নিজের

দীক্ষার কথা বলিতেছেন, "দেখ, বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমি তখন পর্য্যন্ত কোন সাধুমহাপুরুষের জীবনের ঘটনা শুনা দূরে থাক, ছবিই দেখি নাই। কাজেই বাহিরের দিক হইতে কোন সংস্কার এই শরীরে তোমাদের দৃষ্টিতে আসিতে পারে নাই। দেব দেবীর ছবিও খুব কমই দেখিয়াছি। বাপের বাড়ীতে পূজা ও ব্রত নিয়মাদি দেখিয়াছি মাত্র, ভোলানাথদের বাড়ীতে সে সব বিশেষ ছিল না। কাজেই পূজাদি বা দেবদেবীর ছবি বিশেষ দেখি নাই বলিলেই হয়। দীক্ষার দিন কি হইল? আমি ঐ ভাবে বসিয়া আছি, কানে যে কোন নাম শুনিলাম তা' নয়; শিশুর যেমন কথা ফোটে তেমনি ভিতর হইতে মন্ত্র ফুটিল। তারপর দেখ, নিজের ইচ্ছাশক্তির কোন ক্রিয়াই ছিল না। দেখিলাম হাতের আঙ্গুলগুলি চঞ্চলভাবে নড়িতে নড়িতে জপের ভঙ্গী নিল, পরে জপ হইতে লাগিল। এই সব চমৎকার দৃশ্য দেখিতাম। সে এক সময় গিয়াছে। আসনগুলিও ঐ রকম, ধর, প্রথম শ্বাস প্রশ্বাসের গতির সঙ্গে সঙ্গে পাগুলি সোজা হইয়া পড়িল, তারপর ধীরে ধীরে নানারকম আসন হইতে লাগিল। শরীর স্থিরভাবে বসিয়া নানা আসন পড়িতে লাগিল। এই সব তামাসা দেখিতাম।" এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

নরেশদাদা বলিলেন, "মা কত মহাপুরুষের জীবনী পড়িয়াছি, দেখিয়াছি; কিন্তু এমন আর শুনি নাই। তুমি যে কি, তাহা বোঝা আমাদের সাধ্য নাই। তোমাকে কোন দেবদেবী বলিলেও ছোট করা হয়।" রমণা সিদ্ধেশ্বরীর আশ্রমের কথা বলিতে বলিতে মা বলিলেন "ভোলানাথের বাসনা পূরিয়াছে। ঐ সব স্থানে আসা হইল। সাধকের দৃষ্টিতেই যে তাহাকে সব স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া হইতেছে, সেই দৃষ্টি হইতেই প্রথমে ঢাকা রমণা আশ্রমে গিয়াই ২৪ ঘণ্টা থাকিয়া

ভোলানাথকে তথায় রাখিয়া বাহির হইয়া যাওয়া হইল। ভোলানাথ ত সাধারণ জীব নয়।" আবার কথায় কথায় বলিতেছেন, "দেখ আবার কত সময় হয়ত কাহারও সঙ্গে তাহাদের সংস্কার অনুরূপ কথা হইয়াছে, 'তুমি এই এই', তাহারা মনে করিয়াছে তাহারা তাই; কিন্তু তা'তো মোটেই নয়। অনেক সময় হয় কি জান? কাহারও স্বভাব দেখিয়া বলা হয়, 'তোমার এ রকমের সংস্কার', হয়ত কাহাকেও সেই রকম বলা হইয়াছে। আবার একটা কথা আছে; যে যে দেবতার উপাসক তাহার মধ্যে সেই দেবতার একটু প্রভাব আসিয়া পড়ে। এ শরীরের ত তোমাদের মত ভাষা নাই। আমার কথার অর্থ না বুঝিয়া তাহারা মনে করিল তাহারা পূর্ব্বে এই এই ছিল। সেইরূপ হইলে যে তাহাদের কিরূপ চরিত্র হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিল না। এইরূপই কোন কোন ক্ষেত্রে কত কথা তোমরা ভুল বুঝিয়া লও।"

বেলা প্রায় ৯টায় মা মুখের কাপড় সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন, প্রায় ১১ টায় ভোগ হইল। ভোগের পর মা নিজের বিছানায় আসিয়া বসিয়াছেন, কাছে নরেশদাদা ও ভোলানাথ বসিয়া আছেন। একটু পরে আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার খাওয়া দাওয়া হইয়াছে?' আমি বলিলাম, "এখনও হয় নাই।" মা কিছু বলিলেন না। একটু পরে আমি খাওয়াদাওয়া করিয়া উঠিলাম; শুনিলাম মা ভোলানাথের সঙ্গে একান্তে কথা বলিবার জন্য নরেশদাদাকে নীচে পাঠাইয়া দিয়াছেন। একটু পরেই ভোলানাথ নীচে আসিয়া বলিলেন, 'তোমার মা তোমাকে ডাকিতেছে।' আমি উপরে যাইতেই মা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আগে একটু হাসিয়া ত নেই, তারপর কথা।" আমার কেমন একটা ভাব হইল বলিলাম, "কি, আমাকেও এই সঙ্গে পাঠাইতেছ না কি?" মা বলিলেন, "তুমি কয়েকদিন সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে গিয়া থাক,

অখণ্ডানন্দ আমার কাছেই থাকিবে।" আমি 'এ কি ব্যবস্থা করিলে?' বলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। মা বলিলেন, "পূর্ব্বে বলিলে খাওয়া দাওয়া হইত না, মন খারাপ করিতে, তাই এখন বলিলাম।"

কি করিব, যথাসময়ে চোখের জলে সকলে বিদায় নিলাম। মা বলিলেন, "তোমরা কাঁদ কেন? যে হাসে তাহার জন্য কি কেহ কাঁদে? আমি ত হাসিতেছি, দেখিতেছ না।" মার চরণে পড়িয়া থাকিতে চাই, মা সরাইয়া দিতেছেন। আমাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মা আপন মনেই যেন আমাকে শুনাইয়া বলিতেছেন, "ভিতর-বাহিরে বড়ই ধাক্কা লাগিতেছে? কি করিবে। এখন যে এই ভাবেই চলিতে হইবে। আমি যে তোমাদের আত্মোন্নতিই চাই। স্থিরভাবে চলিয়া যাও।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। বুঝিলাম, বাহিরের কার্য্য দেখিয়া মাকে যত নিষ্ঠুর মনে হয়, যদি মা তাহাই হইতেন তবে আমরা তাঁহার জন্য কাঁদিতাম না, মার কাছে আসিতাম না। আমাদের দৃষ্টিতে যাহা কঠোর অন্যায় মনে হয় তাহারও পিছনে কত কথা রহিয়া গিয়াছে আমরা তাহা বুঝি না বলিয়াই মার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হই। কিন্তু দয়াময়ী মা তাহা বুঝিয়াও সন্তানের মঙ্গলের জন্য যথাকর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন। মা আমাদের সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিলেন। পিতা ও মাতার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। মা মন্দিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমরা পুনঃ পুনঃ সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে বিদায় হইলাম। স্বামীজি নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের উঠাইয়া বিদায় করিয়া গেলেন। আমরা নৌকায় চান্দোদ চলিলাম। সেখান হইতে ৫টার ট্রেন ধরিয়া বরোদা যাইব। আমি কাশী যাইয়া ঢাকা যাইব। নরেশদাদা, দিদিমা, দাদামহাশয় কলিকাতা চলিয়া যাইবেন।

বরোদা পৌছিয়া আমি রাত্রিতে মাণিকচাঁদের ধর্ম্মশালায়

উঠিলাম। এখানে মার সঙ্গে থাকিয়া গিয়াছি। কত স্মৃতি জাগিল। আমরা সেই সব কথাই আলোচনা করিতে লাগিলাম। নরেশদাদা খুবই কাতর হইয়াছেন। তিনি কেবলই বলিতেছেন, "মার নিকট হইতে যে অতুল বৈভব লইয়া আসিলাম তাহার তুলনা নাই, মা যে কি জিনিষ তাহা বুঝিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। মা যে পুরান সমস্যার কত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলেন, আমি কি করিয়া বুঝাইব।" চোখের জল ঝরিতেছে। ইহার ভিতরে ভিতরে অনেক রকম অনুভূতি হইত। ইনি একজন বিলাত ফেরত উচ্চশিক্ষিত লোক, নিজেও অবস্থাপন্ন। কিন্তু মার কাছে আসিয়া ভিতর ও বাহিরে যেন গভীর পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। নিজেই বলিতেন, "মা, আমি কলিকাতায় এই ভাবে থাকিতে পারি না, আমার বড় সাহেবী মেজাজ। আমার বাড়ী ঘর সবই সেই রুচির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এখানে আসিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গিয়াছি।" মাকে প্রথম দর্শনের পর হইতেই তাঁর যে সব অনুভূতি হইয়াছে তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন—"আমি এতদিন যাহা খুঁজিতেছিলাম,—তাহা যেন পাইয়াছি।" ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবের বেশ একটা প্রকাশ ছিল।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, শনিবার—ভোর ৬টায় দিল্লী রওনা হইলাম।

৫ই অগ্রহায়ণ, রবিবার—আজ ভোরে দিল্লী পৌছিলাম। মার ভক্তেরা অনেকেই দিদিমা ও দাদামহাশয়কে দেখিবার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

রাত্রি ১১টায় কাশী পৌছিলাম। নরেশদাদা প্রভৃতি সকালে কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার—আমি মার আদেশে কর্ণালী হইতে রওনা হইয়া কাশীতে আসিয়াছি। মা আমাকে একা একা থাকিতে ও চলিতে অভ্যাস করাইতেছেন। একদিনের জন্য বিন্ধ্যাচল গিয়াছিলাম। আজ বিন্ধ্যাচল হইতে এখানে আসিয়াই অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর টেলিগ্রামে জানিলাম মা আমাকে কাশীতে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না। মার চিঠি আসিতেও ৪।৫ দিন দেরী হইবে। চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত কাশীতেই থাকিতে হইবে।

স্বামীজীর চিঠিও আজ পাইলাম। তাহাতে জানিলাম আমি চলিয়া আসিবার পরই তাঁহারা বিদ্যানন্দ স্বামীর গীতা মন্দিরের ধর্ম্মশালায় গিয়াছেন। স্থানাভাবে রান্নার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। মন্দির হইতেই প্রসাদ আসিতেছে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন শীঘ্রই সব বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন "আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না, কারণ আমার আবশ্যকতা বিশেষ কিছুই নাই, তাই আমার কোনই অসুবিধা নাই। মার যদি একটু সেবা করিতে পারি তবেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।" বাস্তবিক এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কিছুরই আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার পূর্ব্ব জীবনের কোন অভ্যাস তাঁহার এই জীবনে প্রকাশ পাইত না। তিনি এই ভাবেই নীরবে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেছিলেন। আমি কাশীতে মার দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

১২ই অগ্রহায়ণ, রবিবার—কাল স্বামীজীর পত্রে জানিলাম যে মা তাঁহাকে হঠাৎ বলিয়াছেন, "খুকুনীকে কাশীতে থাকিবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া দাও" তাই তিনি টেলিগ্রাম করিয়াছেন। আরও লিখিয়াছেন, তাঁহারা গীতা মন্দিরেই খাওয়া দাওয়া করেন।

ভোলানাথই মার জন্য রান্না করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহাদের অন্যত্র যাওয়ার কথা আছে, কোথায় যাওয়া হইবে এখনও ঠিক হয় নাই।

আমি আজ গোপীবাবুর সহিত এখানে একটি ছেলেকে দেখিতে গিয়াছিলাম, ছেলেটীর অদ্ভুত অবস্থা। সে স্থূল শরীর হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধলোকে চলিয়া যায়। অনেক দেবদেবী ও ঋষি মুনিদের সহিত দেখা হয়। তাঁহারা দৃষ্টির সাহায্যেই নানারূপ শিক্ষা দিতেছেন। এখন ছেলেটীর বয়স ১৬ বৎসর, নাম কেদার নাথ দাস 'মালাকারের ছেলে। তাহার বিধবা মা আছে। অবস্থায় বুঝিলাম বালকটী বিষ্ণুলোক, শিবলোক ও ইন্দ্রলোক, ইত্যাদি উর্দ্ধলোকে যাইবার একটা প্রেরণা বোধ করে, তারপরই শুইয়া পড়ে। প্রায় ১৫।২০ মিনিট পরে উঠিয়া বসে; তখন অনেক জটিল প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেবতারা তাহাকে বলিয়াছেন, "এখন তোমাকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে; ২০ বৎসর বয়স হইতে তোমা দ্বারা জগতের কল্যাণ হইবে"—ইত্যাদি। সে বলে নারদ, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সকলের সঙ্গেই তাহার দেখা হয়। একটা ভয় পাইবার পরে এই অবস্থার সূত্রপাত হয়। দেবতারাই বালকটিকে সূক্ষ্ম শরীরে উর্দ্ধলোকে লইয়া যান। গোপীবাবু বলিলেন, "ইহার অবস্থা ভালই দেখা যাইতেছে, বেশ উন্নত হইতেছে।" দেবতারা ছেলেটিকে নানা প্রকার স্তব শিক্ষা দিতেছেন। শরীর হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া বাহির হইয়া যায়। নানা স্থানে ঘুরিয়া আবার শরীরে ফিরিয়া আসে। বেশ এক অবস্থা!

১৭ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—আজ কর্ণালী হইতে অখণ্ডানন্দজীর পত্র পাইলাম। ১১ই অগ্রহায়ণ তিনি লিখিতেছেন, "আমরা এখান হইতে নৌকায় ৪।৫ ঘণ্টার পথ তিলক-বাড়ী গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিবার

কর্ণালীতে শ্রীশ্রীমা।

পথে কাল রাজপিপলা গিয়াছিলাম, অদ্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আহমেদাবাদ হইতে তুইটি পার্শী মেয়ে (মা যাঁহাদের নাম কল্যানপ্রিয়া ও শুদ্ধপ্রিয়া রাখিয়াছিলেন) আজ ৪ দিন হইল মার কাছে আসিয়াছেন, কল্য চলিয়া যাইবেন। মার শরীর তুর্ব্বল, তুধ একেবারেই খান না বলিলেই হয়। দিনে ভাত খান, রাত্রিতে সামান্য একটু তুধ খান। ভোলানাথই খাওয়াইয়া দেন। আমরা তুইটী পাকা ঘর পাইয়াছি; একটিতে মা একান্তে থাকেন, দ্বিতীয়টীতে আমরা সকলে থাকি। তারাপীঠ যাওয়ার কথা হইতেছে; এখনও কিছু স্থির হয় নাই।"

২১শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—আজ পুনরায় স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পত্র পাইলাম। বরোদা আসিয়া (চিমনলাল মাণিকল্যালের), পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশালায় মা ছিলেন—সেই ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছেন। কতদিন সেখানে থাকা হইবে ঠিক নাই। সেখানে গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রী প্রত্যহ সকালে আসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মার কাছে থাকেন।

২২শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—সকালবেলা শঙ্করানন্দ স্বামীজী বাবার এক টেলিগ্রাম নিয়া আসিয়া জানাইলেন, আজই রাত্রি ৯টার গাড়ীতে মা মোগলসরাই আসিতেছেন। তিনি আমাকে সেই গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবেন।

সন্ধ্যায় আমরা মোগলসরাই চলিলাম। রাত্রি ৯টায় মার গাড়ী আসিয়া মোগলসরাই পৌঁছিল। কাশী হইতে অনেকে মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, বাচ্চুর মা কতরকম খাবার করিয়া নিয়া গিয়াছেন, মাকে একটু খাওয়াইবেন, এই সাধ। মাকে আদর যত্ন করিয়া যেন কাহারও তৃপ্তি হয় না।

মা ভোলানাথ, রুমাদেবী ও অখণ্ডানন্দজী তারাপীঠ চলিয়াছেন আমাকেও সঙ্গে নিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

২৩শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার—শ্রীশ্রীমা সহ আমরা বেলা ২৷৩ টায় রামপুরহাট পৌছিলাম। গরুরগাড়ীতে আমরা সন্ধ্যার পর শ্মশানেশ্বরী তারা মায়ের মন্দিরে আসিয়া পৌছিলাম। শুনিলাম এখানে বেশীদিন থাকা হইবে না; ভোলানাথের কি কাজ আছে তাই আসা হইয়াছে। তিনি যখন এখানে সাধনা করিতেন, তাঁহার বেশ সুন্দর অবস্থা হইয়াছিল, এ স্থান তাঁর বেশ ভাল লাগে! ভোলানাথ আসিয়া তারামায়ের মন্দিরের বারান্দায় শুইবার স্থান করিয়া নিলেন। তিনি আসিয়া ওখানেই থাকেন। আমাদের যজ্ঞোপবীতের সময় যে কুটীরখানা উঠান হইয়াছিল, সেই ঘরেই মার বিছানা করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীশ্রীমার তারাপীঠ আগমন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয়ের বাড়ীতেই রান্না হইল ও রাত্রি প্রায় ১১টায় মার ভোগ হইল। পাণ্ডাদের বাড়ীর অনেক স্ত্রীলোকই মাকে দর্শন করিতে ছুটিয়া আসিলেন।

এখানে এক ভৈরবীমা আসিয়াছেন; শুনিলাম মার প্রতি সকলের এতটা শ্রদ্ধা তিনি বিশেষ পছন্দ করেন নাই; তিনি মাকে কখনও দেখেন নাই তবুও মার নিন্দা করিয়াছেন। মা কিন্তু সেই কথা শুনিয়াই বলিলেন, "চল খুকুনি, আমরা গিয়া সেই ভৈরবী মাকে দেখিয়া আসি।" ভোলানাথ একটু বাধা দিয়া বলিলেন, "কাল যাইও।"

ভৈরবী মা।

এর পর সেই ভৈরবী মা'ই মন্দিরে দর্শন করিতে আসিলেন; মা'ও অমনি গিয়া তাহার কাছে হাসিমুখে দাঁড়াইতেই তিনিও মার মুখের দিকে চাহিয়া মাকে কাপড় ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন। মা অমনি তাঁহার মেয়ে সাজিয়া সেই ভাবেই কত আনন্দ করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ভৈরবী মা উঠিয়া চলিলেন, মাও তাহার পিছু পিছু যাইয়া বলিলেন, "মেয়েটা মায়ের পিছু পিছু আসিয়াছে, আর মা তাহা দেখেই না।" তিনি বলিলেন, 'আমি ত জগতের মা হইতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আনন্দময়ী মা তাহা হইতে দিলেন না; তাই আর মা হওয়ার সাধ নাই, তবে মেয়ে যদি ডাকে, তবে রাজি আছি।" এই বলিয়া সঙ্গীয় লোকদের নিয়া চলিয়া গেলেন। এই কথা কি অর্থে বলিলেন অন্তর্যামিনীই জানেন।

ভৈরবী মার বেশ মোটা সোটা চেহারা; হাতে ত্রিশূল, রক্তবস্ত্র পরিহিতা। ইনি মগরায় বাসা করিয়া থাকেন। স্বামী, কন্যা ইত্যাদি সব আছে। ইনি মগরার বাসাতেই থাকেন ও মধ্যে মধ্যে শ্রীরামপুরে যান। কালই চলিয়া যাইবেন শুনিলাম। মন্দিরে মার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "আমি খুব চমৎকার গাহিতে পারি।" মা অমনি বলিলেন, "আমাকে একটু গান শুনাও।"

২৪শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—অনেক বেলা পর্য্যন্ত মা শুইয়া রহিলেন। আমি কাল রাত্রিতে মার দরজার সামনে নাট-মন্দিরে শুইয়াছিলাম। রমাদেবী ও অখণ্ডানন্দজী সিদ্ধাশ্রমে শুইলেন। কাল রাস্তায় মার সঙ্গে কয়েকটি কথা হইয়াছিল। মা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "যে সব অবস্থা শরীরের মধ্যে হইয়া যাইত তা' বলা যায় না। কখনও বসিয়া আছি, দেখি চোখ দুইটী এমন হইয়া উঠিল যে লোকে দেখিলে ভয় পায়; মুখের ভাব সুন্দর, কেমন অন্য একরকম

হইয়া গেল। হাত নানা ভঙ্গীতে জাগিল কনুইটা এইস্থানে, মাথাটা এই ভাবে থাকিবে, এই রকম ভিতর হইতেই আসিতেছে। আর শরীরও সেই সেই রকম হইয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে। হয় কেন? শরীরের অঙ্গ ভঙ্গীর কতকগুলি দেখিলে ত ভয়ই হয়। ইহার কারণ কি জান? ষট্চক্র প্রভৃতি তোমরা কত কি বল, কিন্তু আমি বলি সমস্ত শরীরেই অনেক গ্রন্থি আছে; ঐ রকম ক্রিয়াদি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক এক স্থানের গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেছে। তোমরা বল চক্ষু দিয়া ত্রাটক করে আমি বলি সর্ব্ব শরীর দিয়াও এইভাবে ত্রাটকের ক্রিয়া হইয়া যায়। পরিষ্কার বোঝা যায়, নানা অঙ্গ সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা, হাত, পা, হাড় মাংস, আঙ্গুল প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থিগুলি খুলিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গেই শ্বাসের ক্রিয়াও সেই ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, সে এক চমৎকার অবস্থা। সবই আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে, হট্যোগ ও রাজযোগ; আরও না কি সব তোমরা বল, সে সবই এ শরীরের মধ্যে হইয়া গিয়াছে। একটা ছুঁইয়া স্তর পায়। যতক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যে আছে ততক্ষণ স্তর বা সিঁড়িও আছে।".

মায়ের সাধনার কথা, আসন-ক্রিয়া-ত্রাটক।

"এর পরের অবস্থা কি রকম জান? যেমন তোমরা লিফ্ট্ (Lift) না কি বল, তাইতে উপরে উঠা; যেমন দোতলা তেতলায় উঠিয়া তুমি লিফ্টে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ, দেখিলে দোতালায় তেতালায় উঠিয়া যাইতেছে, তখন তোমার আর কোন ক্রিয়া নাই। উপর নীচ সব তখন তাহার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে। দরকার মতই স্বভাবতঃ যাতায়াত হয়, সেজন্য তাহার আর কোন চেষ্টা করিতে হয় না। অথবা উপর নীচই তাহার কাছে আর থাকে না—ইহাও বলিতে পার।"

"আবার কত রকমের বীজও বাহির হইত। আমি বলিলাম, আচ্ছা

মা এই যে সব হইত ইহা কি শাস্ত্রের সঙ্গে সব মিলিবে? মা বলিতেন, দেখ একটা লক্ষ্য রাখিও। শাস্ত্রে যে সব লেখা আছে তাহা মিলিতেই হইবে। এক শাস্ত্রে না পাও অন্য শাস্ত্রে পাইবে। একস্থান না একস্থানে থাকিতেই হইবে। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্রে আর কতটুকু লিখিতে পারে। টাইম টেবিলের মত বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিই লেখা থাকে। তোমরা যদি সেই পথে চলিতে পার দেখিবে আরও কত কি আছে, যাহা পুস্তকাদিকে লেখা নাই বা থাকিতে পারে না। সেই রকম, শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে যাহা আছে মিলিতেই হইবে। আবার সব কিছুরই আভাষ শাস্ত্রে আছেই। না ফোটা পর্য্যন্ত বুঝিবে কি করিয়া? যদি কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখ তবে বুঝিবে ঠিক ঠিক হইতেছে না কিছু গোলমাল আছে। শাস্ত্রে যাহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া লেখা আছে তাহার সঙ্গে মিলিবে। কাজেই তোমরা শাস্ত্রে লিখিত মত সবই পাইলে।"

শাস্ত্রমত।

আমি বলিলাম, "আচ্ছা, মা বীজ বড় না নাম বড়?" মা বলিলেন, "দেখ কোনটা বড় ইহা বলা চলে না। অবশ্য যদিও বলা হয় তোমরা নাম কর তাহা হইতেই তোমাদের সংস্কারের নিবৃত্তি করিবার জন্য বীজ আপনি আসিবে। কিন্তু বীজ আগে, না গাছ আগে তাহা যেমন বলা চলে না, ইহাও তাহাই। কাজেই এটা বড় ওটা ছোট, ইহা বলা চলে না। যেমন বীজের মধ্যে গাছের সত্তা। গাছ পূর্ণ থাকে বলিয়াই বীজ হইতে গাছ হয়, আবার সেই গাছ হইতে ফল এবং কত শত শত বীজ হয়। যেমন বলে নাম নামী অভেদ।"

কথায় কথায় নিজের সমস্ত শরীর যে ক্রিয়াগুলি হইয়া যাইত

সে বিষয়ে বলিতেছেন, "বেশ দেখিতাম ক্রিয়াগুলি আরম্ভ হইল, এক একটি করিয়া হইয়া গেল, আবার মুখ দিয়া বাহির হইল "ব্যস এখন যাই" বলিয়া ক্রিয়া বন্ধ হইল, যেন ক্রিয়াগুলিই মূর্ত্তিমতী হইয়া "এখন যাই" বলিয়া ক্রিয়া বন্ধ হইয়া শরীর সাংসারিক কাজে নিযুক্ত হইতে চলিল, অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য এই জাতীয় ক্রিয়া বন্ধ আর কি। এমন সুন্দর প্রকাশ।"

মায়ের সাধনার কথা।

আবার, কথায় কথায়, নিজের শরীরে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতেন, তাহা বলিতেছেন, "দেখ কত তামাসা গিয়াছে, একদিন শাহবাগে হাঁটিতেছি হঠাৎ একস্থানে বসিয়া পড়িলাম, বসিয়া একটা কয়লা পড়িয়াছিল তাহা হাতে নিলাম। কেন নিতেছি কিছুই কিন্তু খেয়াল করা হয় নাই। হইয়া যাইতেছে। তারপর কয়লা দিয়া মাটির মধ্যে আঁকিতে লাগিলাম। শরীরের মধ্যে ষট্-চক্র আছে, তাহা কতটা দূর দূর, সব নিজের শরীরের মধ্যেই নিজে আঙ্গুল দিয়া মাপিতেছি মাপিয়া মাপিয়া আঁকিতেছি—কোন চক্রের কতটা পাঁপড়ি, কি রং, সবই ভিতর থেকে। মূলাধার হইতে সহস্রার, সব আঁকিলাম! এখন তোমাদের কাছে নাম শুনিয়া কিন্তু নাম বলিতেছি, তখন ত এসব নয়। কিন্তু কি জিনিষটা তাহা পরিষ্কার সব বুঝিতেছি, মাপিয়া মাপিয়া আঁকিলাম। আঁকিয়াই উঠিয়া গেলাম, ভোলানাথকে বলিলাম 'একটা চৌকী দিয়া ঢাকিয়া রাখ।' পরে জ্যোতিষ ও নিরঞ্জন আসিলে, ভোলানাথ তাহাদের দেখাইলেন।"

এই সব কথাই বলিতেছেন, "হৃদয় হইল সব সুখ দুঃখ অনুভবের স্থান কিনা? আবার প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভগবানের আসন। যাঁহার আসন তাঁহাকে বসাইতে না পারিলে চিরশান্তি হয় না। সেই আসনে অপর

যাহাকেই বসাও তাহাতেও অশান্তি, কারণ এই আসনের সম্মান ত তাহারা রাখিতে পারে না? তাহাদের যে আসা যাওয়া আছে। তাই যাঁহার আসন তাঁহাকে বসাইবার চেষ্টা করাই ত আমাদের বিশেষ দরকার। তিনি যে সেই আসনে নিত্য বিরাজিত, তাঁহাকে প্রকাশ করার জন্যই এই সব চেষ্টা; তাহা হইলেই আমাদের গণ্ডিবদ্ধ মূর্ত্তির সংস্কার ক্রমে কাটিয়া ভ্রূ মধ্যের চক্রে আসিলে নানা রং জ্যোতিস্বরূপ ফুটিয়া ওঠে।"

হৃদয় ভগবানের আসন।

এই বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখিতাম কি জান? যেমন জল দেওয়ার ব্যবস্থা—একটা স্থানে জল ঢালিয়া দিলেই অপর একটা ঢালু স্থান থাকিলে জল প্রথম স্থানটায় পরে আপনা আপনি দ্বিতীয় স্থানে যায়, পরে আবার তথা হইতে হয়ত একটা বড় স্থানে গিয়া আপনা আপনিই পূর্ণ হইতেছে যেমন নদীর গতি সমুদ্রের দিকেই হয়। সেই রকম মূলাধার হইতে ঊর্দ্ধদিকে যাইবারও এই নিয়ম। এক স্থানে গেলেই দ্বিতীয় স্থানে, তৃতীয় স্থানে ও ক্রমে ক্রমে সহস্রারে।"

ঘা দিলেই শক্তি জাগরিত হয়।

কোন স্থানে দেখা যায় এক একটি লোকের ভিতর দিয়া কত রকম অলৌকিক অবস্থা হইতেছে, অথচ সাধন ভজন বাহিরে কিছু করে নাই হয়ত, ছেলেমানুষ। মা উত্তরে বলিতেছেন, "দেখ ঘা দিতে পারিলেই হইল। কখনও কখনও এমন দেখা যায় হয়ত ভর পাইয়া কি অপর কোন প্রকারে একটা আঘাত পাইয়া তাহার কতগুলি দরজা খুলিয়া যায় সে অলৌকিক অনেক তত্ত্ব বলিতে পারে। তবে কখনও কখনও তাহাদের এই অবস্থাটা স্থায়ী হয়, কখনও আবার স্থায়ী হয় না। ঠিক ঠিক ভাবে যদি এ সব রক্ষা হয় তবে অনেক সময় বেশ সুফল পাওয়া যাইবার

আশা। যাহা হইবার বা যাহা দরকার, কর্ম্মের গতিতেই আসিয়া যায়।"

আবার ভাষার কথা উঠিল, তাহাতে মা বলিলেন, "দেখ ভাষা ত এক একটা শব্দ স্মরণ করিয়া শিখিতে হয় না, যখন যাহাদের মধ্যে থাকি তাহাদের ভাবটা খেয়ালে আসিলেই আপনা হইতেই তাহাদের ভাষাটাও বাহির হইয়া যায়। একটা একটা শব্দ করিয়া শিখিতেও হয় না মনেও রাখিতে হয় না। দেখিতাম কি জান। কখনও কখনও হাতের লেখাগুলি বেশ শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়া যাইত। আবার কখনও অস্পষ্ট হইতেছে। একবার আমার নামটা কি কারণে ভোলানাথ আমাকে দিয়া দস্তখত করাইয়া লইবেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—তাহার পূর্ব্বে চিঠিপত্রও ত লিখিয়াছি কিন্তু সে দিন কত কাগজ নষ্ট করিয়াও নামে দস্তখতই হইল না। তাই তিনি আর নাম দস্তখত করাইয়া লইতে পারিলেন না কাজও হইল না। এই ত অবস্থা!"

মায়ের স্তব-মন্ত্র কোথা হইতে আসে।

"এইগুলি কি রকম জান? যেমন স্তব ও মন্ত্রাদি আপনা আপনি পরিষ্কার উচ্চারণ হইয়া যাইতেছে। আবার কখনও তোমরা কত বলিতেছ, কিছুই বাহির হইতেছে না। তবুও বলিতে পার, ছেঁড়া প্রথম ভাগ কিছু এবং বাল্যশিক্ষা কিছু পড়া হইয়াছিল, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ত আর ঐ বিদ্যার আসিতে পারে না, স্তব ও মন্ত্রাদি আসে কোথা হইতে? সেই রকম আপনা আপনিই কখনও শুদ্ধ সুন্দর লেখাও হইয়া যাইত।

কর্ণালীর কথা বলিতে বলিতে বলিতেছেন, "তুমি চলিয়া আসিলে পর একটী ঘরে আমি একাই থাকিতাম, একদিন দেখিতেছি শরীরটা কেমন হইয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ খেয়াল হইল বড়মা (ভ্রমর ঘোষ) একদিন কৃষ্ণলীলার কথা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কিন্তু তখন বলা

হয় নাই, পরে যাহা আসে জানাইব বলিয়াছিলাম, এখন তাহা খেয়ালে আসিতেই ভোলানাথকে বলিলাম, "দেখ, আমি যাহা বলি তুমি বড়মাকে লিখিয়া দাও। এই বলিয়া বলিতে লাগিলাম। শ্বাসের গতিও পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে। বাবা (স্বামীজী) ও ভোলানাথ হয়ত ভাবিল আমি কৃষ্ণের কথা বলিতে বলিতে ঐ রূপ ভাবাপন্ন হইতেছি কিন্তু তাহা ত মোটেই নয়, ঐরূপ ভাব আরম্ভ হইয়াছে, পরে হঠাৎ বড়মার কথা খেয়ালে পড়ায় আমি সে সব কথা বলিতেছিলাম। তোমরা বলিতে পার, পরে বলিলেই হইত, কিন্তু আমার ত বন্দোবস্ত করিয়া এসব হয় না। যখন যাহা দরকার হইয়া যাইতেছে।"

"এই ভাবেই কিছু পরে, আমি শুইয়া রহিলাম। বাবা ও ভোলানাথ কিছু সময় থাকিয়া নিজেদের ঘরে শুইতে চলিয়া গেলেন। আমি ঐ ঘরে আছি, তার পর ধীরে ধীরে শরীরের নানারকম ক্রিয়া হইতে লাগিল। অন্ধকার ঘর, রুমাদেবী একপাশে শুইয়া আছে আপনা আপনি শরীরের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। কখনও কখনও এমন ত হয় যে অপর কেহ ঘরে ঢুকিলেই ক্রিয়াগুলি বন্ধ হইয়া যায়।" আমি বলিলাম, "কেন এ রকম হয় মা? পূর্ব্বে তোমার এ'রকম হইত, এখন আবার এ রকম হইল কেন?" জ্যোতিষ দাদাও একবার ঠিক এই রকম প্রশ্নই করিয়াছিলেন— বহুদিন পরে কীর্ত্তনে মার আবার ভাবাবেশ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, প্রথম ভাগে এগুলি হইয়া গিয়াছে তারপর অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, আবার সে সব আরম্ভ হইল কেন?" মা এই কথার উত্তরে বলিলেন, "দেখ তোমরা একথা বলিতে পার। সাধকদের হয় কি জান! যেন এক একটা অবস্থা হইয়া যাইতেছে। আবার নূতন একটা আসিতেছে, এইভাবে তাহাদের ক্রমোন্নতি হয়। কিন্তু এ শরীরটার অন্য রকম। তাই ওলট পালট

দেখা যায়, এসব ধারার কিছুই ঠিক থাকে না। একবার হয়ত তোমাদের দৃষ্টিতে একটা উচ্চ স্তরের ক্রিয়া শরীরের মধ্যে খেলিয়া গেল আবার হয়ত একটা সাধারণ ভাবই শরীরের মধ্যে খেলিতেছে। উপর নীচ বলিয়া ত এ শরীরে কিছুই নাই। তোমাদের যখন যাহা দরকার তাহা এ শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া যাইতেছে।" আমার কথায়ও আজ এইরূপই জবাব দিলেন। শরীরে জ্যোতির কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বলিলেন, "অনেক সময়ই দেখিতাম কি জান? এই শরীরটাই যেন জ্যোতির্ম্ময়, সেই জ্যোতিতে যেখানে থাকিতাম সে স্থানটাও যেন আলোকিত।"

বেলা প্রায় ১০টায় মা উঠিলেন। মুখহাত ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। মা গাছের নীচে বসিয়াছেন, আমিও বসিয়াছি। অনেকেই মা আসিয়াছেন শুনিয়া মার চরণ ধূলা নিতে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি মার সঙ্গে কথা বলিতেছি কথায় কথায় উঠিল—শাস্ত্র কি? মা বলিলেন, "শাস্ত্র কি জান? স্ব-অস্ত্র, যে অস্ত্র (কর্ম্ম) দ্বারা জাগতিক সংসার-বন্ধন কাটান যায়।" আবার কথা উঠিল, শিস্য কি? মা বলিলেন, "স্ব+স্ব অর্থাৎ কিনা নিজের স্বরূপ করিয়া লওয়া। স্বরূপতঃ যে অভেদ তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া, অর্থাৎ ফুটাইয়া দেওয়া আর কি। আবার, শিস্য কি? না শস্য, মাটিতে যেমন বীজ ফেলিয়া শস্য উৎপন্ন করা হয়, এও তেমনি জমিতে বীজ বপন করা, শস্য উৎপাদনের জন্য, ফল-স্বরূপ প্রকাশ আর কি।" মার এই কথা শুনিয়া আমার সেই গানটা মনে পড়িল।—

শাস্ত্র ও শিস্য।

'মনরে তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমীন রহিল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা॥'

আজ রাত্রি প্রায় ২টার সময় আমি ও মা শয়ন করিলাম।

২৫শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—আজ কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "ভগবান ভিন্ন আর কাহারও লীলা হইতে পারে না। সাধক সাধন দ্বারা ভগবান তুল্য হইতে পারে কিন্তু ভগবান হইতে পারে না। লীলা ভগবানেরই।"

আজ ভোরেই কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ ও শচীদাদার বাড়ীর মেয়েরা ও নারায়ন বাবু আসিতেছেন। দাদামহাশয়ের খুব অসুখ। দিদিমার ও তাঁহার ইচ্ছা, শেষ সময় একবার মাকে দেখিবেন। মাকে তথায় যাইতে সকলে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভোলানাথ ও অন্যান্য সকলের কথায় স্থির হইল, যে আজই বেলা ১২ টায় রওনা হইয়া চারিটার গাড়ী ধরিয়া রাত্রি ৯৷৷০ টায় কলিকাতা পৌঁছিব। আবার আগামীকল্যই সকাল ৮টার গাড়ীতে মা ফিরিয়া আসিবেন।

আমরা তাড়াতাড়ি মাকে নিয়া রওনা হইলাম। গরুর গাড়ীতে যাইতে হইবে। একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, রামপুরহাট গিয়া গাড়ী পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এর মধ্যে দেখা গেল কয়েক জন ভদ্রলোক একখানা মোটরে করিয়া মাকে দর্শন করিতে আসিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া যাইবার সময় মাকে ও আমাদের সেই গাড়ীতে নিয়া গেলেন। আমরা ত চলিলাম, আরও ২৷৩ জন সঙ্গীয় লোক গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া রওনা হইল, কিন্তু সকলেই জানে গাড়ী পাইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় সেদিন গাড়ীর ১৷৷০ ঘণ্টা দেরী হইল। ইত্যবসরে সকলেই আসিয়া গাড়ী ধরিলেন।

রাত্রি ৯৷৷০টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিলাম, মার আগমন সংবাদ অনেকেই পান নাই, তাই যথাসাধ্য মার আগমন সংবাদ দিতে ২৷১ জন বাহির হইয়া গেল। আমরা ২৷৪ বাসায় ঘুরিয়া বিরলার মন্দিরে ফিরিয়া দেখিলাম ভক্তেরা কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, মা

এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকিবেন তাই কেহই উঠিতেছেন না ; যাঁহাদের কখনও ঠাণ্ডা সহ্য হয় না তাঁহারাও বসিয়া আছেন। রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রাণকুমার বাবু, শচীকান্ত ঘোষ সকলেই বসিয়া আছেন। রাত্রি ৩টার কেহ কেহ বিদায় নিলেন। মা ও আমরা রাত্রি প্রায় ৪টায় শয়ন করিলাম।

২৬শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—আজ প্রাতে ৮টার গাড়ীতে আমরা সকলে রওনা হইব ; সকলেই মাকে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মা মিষ্ট কথায় সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে এবার মার থাকা হইবে না। কালই ষ্টেসন্ হইতে আসিবার সময় দাদামহাশয়কে দেখিয়া আসা হইয়াছে, আজও একবার যাইবেন। যথাসময়ে সকলকে নিয়া মা রওনা হইলেন। বাপের ও মায়ের নিকট বিদায় নিয়া ও মায়ের চরণ-ধুলি নিয়া মা ষ্টেসনের দিকে চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ভক্তরাও গেল। সকলকে কাঁদাইয়া মার গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দাদামহাশয়ের মৃত্যুশয্যায় মা।

ভোলানাথ ও আমিই শুধু মার সাথে গিয়াছিলাম, অন্যান্য সকলে তারাপীঠেই আছেন। রাস্তায় কথা হইতেছিল, কি কথায় মা বলিলেন, "এই যে জগতের লোক নিজেদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধে কত কথা বলে, সবই হইল প্রলাপ। প্রলাপ কি, না যাহা প্রলয় কালে লয় হয় দেখা যায়।"

আমরা বেলা ২॥০টার সময় রামপুরহাট পৌছিয়া, গরুর গাড়ীতে তারাপীঠ রওনা হইলাম। গাড়োয়ানদের মুখে শুনিলাম কাল ৪।৫ জন মার ভক্ত তারাপীঠ গিয়াছেন। অনুমান করিলাম জামসেদপুর কি বহরমপুরের ভক্তরা হইবেন। মা, আমি ও ভোলানাথ এক গাড়ীতে রওনা হইলাম।

তারাপীঠে মার বিচিত্র দর্শন।

পথে কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ তারাপীঠে সেদিন রাত্রিতে শুইয়া আছি. দেখিতেছি কি জান? যেন অনেকগুলি লোক একটা রাস্তা দিয়া গাহিয়া চলিয়াছে ; কতগুলি লোক তাহা বলা যায় না তাহারা বহুলোক। কি রকম রাস্তা—মস্ত বড় জঙ্গল, একপাশে নদীর মত জলাশয় আছে ; নদীর ধার হইতে জঙ্গলের ভিতরে গাছের আড়ালে আড়ালে চলিয়াছে, আর মধ্য দিয়া—(নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এই শরীরটা সেই দলের আগে আগে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গাছের আড়ালে লুকাইয়া যাইতেছে। কতকটা লুকোচুরী খেলার মত। একবার বাহির হইতেছে, আর একবার লুকাইতেছে, আর পিছনের লোকগুলি ছুটিয়া ছুটিয়া কি এক ভাবে বিভোর হইয়া আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়া আসিতেছে ও নামরস ধ্বনিতে গগন ভেদ করিয়া গাহিয়া চলিয়াছে,—

"কৃষ্ণ কাহ্নইয়া বংশী বাজাইয়া
গউ চরাইয়া হারে, রে, রে, রে, রে; এ, এ"

সেইখানে চারিদিক যেন ঝম ঝম করিতেছে।—"

"শোন সুরটা কি রকম করিতেছিল", এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিলেন :—

"কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া, বংশী বাজাইয়া, গউ চরাইয়া হা রে, রে, এ, এ, এ।" আবার হাসিয়া বলিলেন, আসিলাম তারাপীঠ, আর দেখিতেছি কাহ্নাইয়া, এ কি রকম সুন্দর হইল ?" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।

আবার বলিতেছেন, "দেখ এমন এক একটা অবস্থা গিয়াছে; যদি দেখিতাম কোন গাছের মধ্যে কেহ আঁচড় কাটিতেছে ও তাহাতে দাগ হইতেছে, দেখিতাম কি জান? এই শরীরটার—(নিজের শরীর দেখাইয়া)—মধ্যেও ঠিক ঠিক সেই রকম দাগ হইয়া যাইতেছে এবং আঘাত বোধ হইতেছে। "এই শরীরটার এই সব ভাবের

কথা বলা ত দূরের কথা, কেহ বলিতেছে শুনিলেও শরীটা কেমন আড়ষ্ট হইয়া পড়িত। "কিছু বুঝি প্রকাশ হইল এই ভাবিতেই কেমন হইয়া যাইত; তাই গোপনে কত কি হইয়া গিয়াছে, কেহ জানে নাই। আবার এখন দেখিতেছি কোন কোন সময় এসব ভাবের কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে, আড়ষ্ট ভাব দেখিতে পাও না। যে সত্য, শরীরের মধ্যে ভাবের মধ্যে খেলিয়া গিয়াছে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আমি কিছু জানি না কি বল? 'জানি না' কথাও তোমাদের মত কিন্তু ঠিক নয়। সব রকমটাই ত ঐখানে কিনা। যাহা হইবার হইয়া যাইতেছে। তোমরা তোমাদের দরকার মত যেমন করাইয়া নিতেছ তাহাই হইতেছে।"

আবার কথায় কথায় বলিতেছেন "দেখ, অনেক সময় হয় কি? হয়ত কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছি খেয়ালটা আছে সেইদিকেই, এর মধ্যে কেহ আসিয়া বলিল—'মা এই কাজটা করি?' সেই ভাবেই তখন উত্তর হইল—'কর'—'কর'। সে করিল। ইহা কিন্তু মায়ের কথা নেওয়া হইল না, নিজের ইচ্ছাই সে কার্য্যে প্রবল রহিল। যদি কেহ লক্ষ্য করে তবেই বুঝিতে পারে কোন্ কথাটা মা নিজের ভাবে বলিয়াছেন আর কোন্ কথাটা তোমাদের ভাবে ভাবান্বিত করিয়া বলাইয়া নিয়াছ!"

মায়ের আপন খেয়াল ও আমাদের ভাবে ভাবান্বিত খেয়াল।

আমরা সন্ধ্যার পর তারাপীঠ পৌঁছিয়া দেখি জামসেদপুর হইতে অতুলবাবু, অমূল্যবাবু, খেরেশ (পার্শী ছেলেটি) আসিয়াছেন, শ্রীরামপুর হইতে ত্রিগুণাবাবু ও কলিকাতা হইতে কৃষ্ণবাবু আসিয়াছেন। কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইল। সকলে বিশ্রাম করিতে গেলেন, মা'ও শুইয়া পড়িলেন।

২৭শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—আজ কলিকাতা হইতে

আরও অনেকে আসিলেন, আগামী বুধবার এখান হইতে বাহির হইবার কথা। কাল ভোলানাথ তারামায়ের পূজা করিবেন। ভক্তেরা সব আয়োজন করিতেছেন, কলিকাতা হইতে পূজার জিনিষ পত্র সব আসিয়াছে।

দুই তিন দিন আগে রাত্রিতে একদিন কথাচ্ছলে মা বলিতেছেন, "দেখ ছোটবেলায় বইগুলি যে কি ভাবে পড়া হইয়া যাইত তাহা কেহ ধরে নাই! প্রথমভাগ সুরু হইল, তোমার দিদিমা একদিন পড়াইতে বসাইলেন আর দু-এক মাসের মধ্যে কোন খবরই লইলেন না—বইও দেখা হইল না। আবার একদিন বসাইলেন এই ভাবে দুই তিন দিন বসাতেই প্রথম ভাগ শেষ হইল। তারপর ছেঁড়া একখানা বাল্যশিক্ষা, তাহাও একটু পড়াইতে না পড়াইতেই নিম্নপ্রাইমারী ক্লাশ খুলিয়া স্কুল ভাল করিল। সেই নিম্ন প্রাইমারী ক্লাশে আমাকে ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং বাল্যশিক্ষা শেষ হইতে না হইতেই শিশুপাঠ, তার পরই নিম্ন প্রাইমারীর বই দিল। স্কুলেতে যাওয়াই হয় না, বইও বড় হাতে নেওয়া হয় না। কখনও একটু খুলিয়া হয়ত দুই একটী লাইন চোখে পড়িল, আশ্চর্য্যের বিষয় ক্লাসে যাইতেই মাষ্টারেরা সেই জায়গাটুকু হইতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিত। আমিও বেশ ঠিক ঠিক বলিয়া ক্লাসের উপরেই থাকিতাম। এই সব সে কি ভাবে, কি রকম হইয়া গিয়াছে তাহা কিন্তু কেহই লক্ষ্য করে নাই।"

মায়ের পড়াশুনা—প্রথম ভাগ ও ছেঁড়া বাল্যশিক্ষা

"যেমন বাজিতপুরে গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে থাকিতে কালীপূজা হইত ও কালীর প্রসাদ নিতে অনেককেই ভোলানাথ ডাকিয়া আনিতেন, অথচ কিছুই ঠিক থাকিত না, যাহা পাক হইত তাহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবার মত প্রসাদ পাইত। ভোলানাথ বলিতেন, "কালীমায়ের কি

আশ্চর্য্য কৃপা, না-জানা ভাবে এতলোক প্রসাদ পাইল অথচ কিছুই কম হইল না।"

কথায় কথায় মা একদিন বলিতেছেন, "এই যে জাগতিক সুখদুঃখের কত কথা লোকে বলে—ইহা সবই ত প্রলাপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'প্রলাপ' অর্থ কি জান না, যাহা প্রলয়ে লয় পায় তাহাই প্রলাপ" তখন আমি বলিলাম, "মা শুনিতে পাই প্রলয়েও কিছু শেষ হয় না। সবই সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া যায়?" মা বলিলেন, "তাহা কি রকম থাকে জান? যেমন বৃক্ষ, ফল প্রসব করিয়া মরিয়া গেলেও ত এক বীজেতে যেমন অনন্ত গাছ, বীজ ইত্যাদি নিহিত থাকে, আবার তাহা হইতে গাছ, বীজ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ভাবে'ত কিছুই বিনাশ হয় না। সৃষ্টি বীজ'ত। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব সময়ই হয়।"

আবার একদিন মা উপস্থিত সকলের সঙ্গে, পূর্ব্বে মার শরীরে যে স্বাভাবিকভাবে, হাসি খেলার মত সাধনের ক্রিয়াগুলি হইয়া যাইত সেই কথা বলিতে বলিতে বলিতেছেন, "দেখ এই যে মন্ত্রাদি বা বীজাদি মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইত, তোমাদের মুখে এখন যে শুনিতেছি পুরাকালে নাকি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের মুখ হইতে মন্ত্রাদি বাহির হইয়া যাইত; বোধ হয় সেইসব ভাব তোমাদের প্রয়োগানুসারে এই শরীরটার মধ্য দিয়া খেলিয়া গিয়াছে।"

মায়ের ঋষি ভাব।

২৮শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—আজ বিশেষ কোন কথা নাই। মাকে নিয়া ভক্তরা সারাদিন আনন্দ করিলেন, ভোলানাথের জ্বর হইয়াছে।

২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—আজ ঢাকা হইতে রাধিকাবাবু আসিয়াছেন। মার সঙ্গে তিনি কথায় কথায় বলিতেছেন,

"মা, মূলে যিনি, তিনি যখন সত্য-স্বরূপ তখন মিথ্যা আসিল কোথা হইতে? আর আমার মনে হয়, ভিতরের অজ্ঞানের পরদাটা বুঝি একটু ছিঁড়িয়াছে।" মা হাসিয়া বলিলেন, "পরদা একটু ছিঁড়িলে আর জোড়া লাগে না। যেমন ডালিম যখন পাকে কাহারও বলিয়া দিতে হয় না, রং ও গন্ধেই প্রকাশ পায়, আর বাহিরের পর্দ্দাটা আপনিই ফাটিয়া যায়, একবার ফাটিলে আর জোড়া লাগে না।" রাধিকাবাবু হাসিয়া বলিলেন আমাদের জোড়া লাগে।" মা বলিলেন, "ফাটে নাই শুধু একটু কাঁপে মাত্র, তাহাতেই মনে কর ফাটিয়াছে। আর, সত্য হইতে মিথ্যা আসিল কোথা হইতে, তাহা কেমন জান? যেমন সমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌ সমুদ্রেই লয় পায়, তাঁরই এক রূপ আর কি, মিথ্যা কিছুই নাই।"

কথাবার্ত্তার পর একটু বেলা হইলে মা, নাট মন্দিরে গিয়া বসিলেন। ভক্তেরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। রাধিকাবাবু কথায় কথায় মাকে বলিতেছেন, "মা, ঢাকার লোককে কি বলিব?" মা বলিলেন, "বলিবে কি জান? বলিবে সেই দিকে চলিতে থাক দাঁড়াইও না। দাঁড়াইয়া দেখিও না যে আমি কতটুকু আসিলাম, তাহাতে কি হয় জান? যেটুকু অগ্রসর হওয়া যায় সেইটুকু আবার কমিয়া গেল। তাই অপেক্ষা করিতে নাই ক্রমাগত চলিতে হয়।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কথায় কথায় শচীদাদা বলিতেছেন মা আজ অনেক মড়া আসিতেছে। মা বলিলেন, "এখানে মড়া না আসিলে নাকি মায়ের, (তারা মায়ের) ভোগ হয় না। সত্যই ত যাহা অসত্য, অনিত্য তাহা শেষ না হইলে ত মার ভোগে সত্য জিনিষ লাগিতে পারে না। এই বলিয়াই আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন যাহা নিত্য, সত্য তাহা আবার ভোগে

লাগিবে কি? কথা বুঝাইবার জন্য এসব বলা হয় মাত্র।”

সকালে উঠিয়াই মা বলিয়াছেন—আজই যাইবেন! পূর্ব্বেই কথা ছিল আজ যাইবেন তাই ভোলানাথের অসুস্থ শরীর নিয়াও আজই রওনা হইবেন স্থির হইয়াছে। আজ ভোলানাথ ৺তারা মায়ের পূজা করিলেন। কলিকাতার, বহরমপুরের ও জামসেদপুরের অনেক ভক্তরাই উপস্থিত আছেন। খুব ধুমধামের সহিত পূজাদি হইয়া গেল। বেলা প্রায় ৪টায় মার ভোগের পর সকলে প্রসাদ নিলেন। রাত্রি ১১টার এখান হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ৩৷৷০টায় রামপুরহাটে গিয়া গাড়ী ধরিতে হইবে। ভোগের পূর্ব্বে নাট মন্দিরে বসিয়া মা গাহিতেছেন, ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে গাহিতেছে:—

তারাপীঠ ত্যাগ। মায়ের নাম কি? বাড়ী কোথা?

“কৃষ্ণ কাহ্নাইয়া, বংশী বাজাইয়া,
গউ চরাইয়া, হরে রে, রে, এ, এ।”

ভোগের পর, ছোট ঘরে মাকে একটু দরজা বন্ধ করিয়া শোয়াইয়া দেওয়া হইল। বাহিরে কে একজন আসিয়া ভক্তদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “মায়ের নাম কি, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি! ভিতর হইতে মা তাহা শুনিয়াছেন, তিনি কিছুক্ষণ পরে যখন উঠিয়া বসিলেন তখন হাসিয়া বলিলেন, বাহিরে কে ঐ রকম সব জিজ্ঞাসা করিতেছিল। আমার খেয়ালে খেয়ালে মুখ দিয়া বাহির' হইতেছিল, অব্যক্ত ধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ ঘনশ্যাম নাম।” এই বলিয়া শিশুর মত সরল হাসি হাসিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও একথা শুনিয়া আনন্দ করিতে লাগিল।

এক পাণ্ডার স্ত্রী মার জন্য একটু দুধ ও গুড়ের লাড়ু পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা চলিয়া যাইবেন বলিয়া গরীব গৃহস্থ ইহারা যে যাহা পারিতেন মার সেবার জন্য নিয়া আসিতেন। যেন নিজেদের মেয়ে

অনেক দিন পরে আসিয়াছে, অনেকটা সেইভাবে। আবার পাণ্ডারা ও স্ত্রীলোকেরা বলিতেন, "আমাদের ৺তারামা ও তুমি ত একই।

আমরা সদলবলে রাত্রি ১১টায় রওনা হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি প্রায় ১২।১৪ খানা গরুর গাড়ী চলিয়াছে। আমরা রাত্রি প্রায় ২টায় রামপুর হাট পৌছিলাম। সেখান হইতে ৩৷৹ টার গাড়ীতে সকলেই মার সঙ্গে বর্দ্ধমান আসিয়া ১২ঘন্টার জন্য তথায় থাকিলাম।

১লা পৌষ, বৃহস্পতিবার—আজ অতি ভোরেই আমরা বর্দ্ধমানে পৌছিয়া ষ্টেশনে অনেকক্ষণ থাকিয়া পরে শিখদের একটা ধর্ম্মশালায় আসিলাম। শচীদাদার পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে সকলের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাল রাত্রিতে গাড়ীতে কমল মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা স্বপ্ন কি সত্য?" মা বলিয়াছিলেন, "যেমন এজগৎ সত্য, তেমনি স্বপ্নও সত্য। তবে কখনও হয়ত গত ঘটনার বিষয় দেখ, কখনও হয়ত ভবিষ্যতের ঘটনার বিষয় দেখ, সবই সংস্কারের খেলা।"

মা ঘরের ভিতর যাইবেন না, বাহিরে দাঁড়াইলেন, দাদা মহাশয়ের চৌকী দরজার নিকট আনিয়া দেওয়া হইলে তিনি তখন একটু উঠিয়া বসিলেন। সকলে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এর মধ্যে দাদামহাশয় মার দিকে চাহিয়া 'মা, মা মা', বলিয়া তিনবার ডাকিলেন। পরে 'মা' বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। মাও তাঁহার এই ভাবটা বিশেষ লক্ষ্য করিলেন। তাহার সেই সময়কার ভাব দেখিয়া কেমন মনে হইল; মার প্রতি সেই সময়কার জন্য কন্যা ভাবটা গিয়া যেন একটা মাতৃভাব জাগিয়াছে।

এরপর আমরা যে দিন তারাপীঠ আসিয়া পৌছিয়াছিলাম সেই দিন রাত্রিতে মা শুইয়া শুইয়া দেখিয়াছিলেন, দাদা মহাশয়

বলিতেছেন, 'লও', মা জবাব দিলেন, "এখনও মেঘ আছে।" তিনি উত্তরে বলিলেন, "এই মেঘে কি হইবে?" ভাবটা কতকটা এইরূপ যেন দাদামহাশয় নিজেকে নিতে মাকে অনুরোধ করিতেছেন। মা উত্তরে বলিতেছেন—মেঘ আছে, অর্থাৎ কিনা এখনও বন্ধন বা কর্ম্ম আছে; তিনি বলিতেছেন, "ইহাতে কি হইবে?" "আমাকে লও" এই ভাবটা।

মা আমার কাছে বলিতেছেন; "দেখ, আমি দেখিতেছি পাতলা মেঘটুকু কাটিয়াও যাইতে পারে।" এই বলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তোমার দিদিমা বোধ হয় গোলমালে পড়িয়া এই শরীরটার কথা খুব ভাবিতেছে তাই তাহার প্রভাবটা অনেক সময় দেখা যাইতেছে।"

মা ধর্ম্মশালায় আসিয়া বহুক্ষণ শুইয়াই রহিলেন, কিছুই খাইলেন না। বৈকালে মা উঠিয়াছেন। গত রাত্রিতে মা বর্দ্ধমান আসিবেন বলিয়া কলিকাতা হইতে বহুলোক ফিরিয়া গিয়াছে। আজও কলিকাতা হইতে প্রাণকুমার বাবুর স্ত্রী ও কন্যা, যতীশ গুহ, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার মেয়ে ননী এরা সব মাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

সন্ধ্যা ৬॥ টার ট্রেনে যাইবার জন্য মা সকলকে নিয়া ষ্টেশনে গিয়া বসিলেন। নরেশদাদা, অমূল্যদাদা, লক্ষ্মীদাদা, যতীনদাদা প্রভৃতি ভক্তেরা মাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। মায়ের নিকটে মেয়েরাই বেশী বসিয়াছে, তাহাতে ছেলেদের মধ্যে আবার কথা উঠিল—মেয়েরাই সর্ব্বদা মার বেশী নিকটে বসিতে পারে। এইসব আনন্দ কোলাহলের মধ্যে যথাসময়ে গাড়ী আসিল, তখন অনেকেরই চক্ষে জল। সকলকে কাঁদাইয়া মা গাড়ীতে উঠিলেন। জামসেদপুরের ভক্তেরা মায়ের সঙ্গে আসানসোল পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে ইহাতেই তাহাদের আনন্দ। পার্শী

ছেলেটী (খেরেশ), মা তাহার নাম দিয়াছিলেন কেশবানন্দ, সে ছেলেটীও জামসেদপুর হইতে আসিয়াছে, মাকে আবার কবে দেখিবে এই সকলের চিন্তা।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রাত্রি ১০টার সময় জামসেদপুরের ভক্তরা আসানসোলে নামিয়া গেল। মা শুইয়া পড়িলেন। এবার আমাদের সঙ্গে অটল দাদার ভাগিনেয় কমলের একটি শ্যালক যাইতেছে। তাহার নাম ভোলা, বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে, আই, এ পড়িতেছে। ইহার ভিতর এখনহইতেই বেশ বৈরাগ্যের ভাব দেখা যায়। ছেলেটি হরিদ্বার যাইবে স্থির করিয়াছিল তাই মাকে পাইয়া মার সঙ্গে চলিয়াছে। কথা হইয়াছে মা কাশীতে নামিবেন ও তথা হইতে, হরিদ্বারের দিকে যাওয়া হইবে? হরিদ্বারে কি হৃষিকেশ অথবা দেরাদুনে থাকা হইবে এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

মায়ের সঙ্গে ভোলা—অভয়

২রা পৌষ, শুক্রবার—আজ ভোরেই মার সঙ্গে আমরা ৺কাশীধাম আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রথমে বীরেশ্বর পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় উঠিলাম, পরে ৺নির্ম্মলবাবুর স্ত্রীর অনুরোধে একটু পরেই হরির ধর্ম্মশালায় যাওয়া হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দজীকেও মা ঢাকা যাইতে বলিয়াছেন। আমার উপরও সেই আদেশ; মার সঙ্গে কাশী আসিবার অনুমতি পাইয়া আমি মার সঙ্গে কাশী আসিয়াছি, রুমাদেবী সঙ্গেই আছেন। মার খবর পাইয়া দুপুর বেলা অনেকেই মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সকলে মার কাছে বসিয়া রহিলেন।

৩রা পৌষ, শনিবার—তারাপীঠ ছাড়িবার পূর্ব্বদিনে, অর্থাৎ ২৭শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার হইতে ভোলানাথ কথা বলিতেছেন। জ্বর খুব বেশী ছিল, সেই অবস্থায় মায়ের গান করিতে লাগিলেন ও পরে কথাবার্ত্তা বলিতে

দাদামহাশয়ের দেহরক্ষা

আরম্ভ করিলেন। গতকল্য টেলিগ্রাম আসিয়াছে, দাদামহাশয়, (মায়ের পিতা) ১লা পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা যে বলিয়াছিলেন, 'একটু মেঘ আছে।' মৃত্যু খবর পাইয়া মা বলিলেন, "তিন দিন পর ত মারা গেলেন, মেঘ ত একটু ছিল, সে টুকু কাটিয়া গেল"—টেলিগ্রাম পাইয়া মা বলিলেন, "আসা হইলেই যাওয়া আছে"।"

মায়ের কথার ভাবে পূর্ব্বেই আমরা বুঝিয়াছিলাম, হয়ত দাদামহাশয় আর বাঁচিবেন না। ৭১ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করিলেন। ইনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই খবরে মার ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন না দেখিয়া বাচ্চুর মা মাকে বলিতে লাগিলেন, "মা তুমি ত জান তবে আসিবার দিন দাদামশায়কে দেখিয়া আসিলে না কেএ? এই খবর পাইয়াও একটু ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। মাগো তুমি কি কঠিন!" মা হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "আমিও সেইদিনই (যেদিন কলিকাতা যাওয়া হইয়াছিল) বাবাকে বলিয়া আসিয়াছি "বাবা আমি যাই" বাবা বলিলেন "আচ্ছা মা আস গিয়া," আমাকেই ত আগে বিদায় দিয়াছেন।" পরে আমাকে বলিলেন, "ট্রেনে যখন বৃহস্পতিবার কাশী আসিতেছিলাম তখন ঠিক এ সময়, পরিস্কার সব দেখিতেছিলাম এমন কি কোন স্থানে কি হইয়াছিল সব সেখানে গেলে দেখাইয়াও দিতে পারা যায়। ঠিক ঠিক হইবে।"

কাল রাত্রিতেই ভোলানাথ মাকে ধরিলেন, "শত হইলেও বাপ, তোমার একটু কিছু করা দরকার। ব্যবহারেও তুমি অনেকটা চালাইয়া আসিয়াছ। তুমি মেয়ে একটু কিছু বাপের কাজ করা দরকার।" মা বলিলেন "বাপ ত সকলেই। আমি ত করিব না', 'করিব' কিছু বলি না; যাহা তোমরা করাইয়া নিতে পার করাইতেছ।" তোমাদের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য দিয়া ত শরীর অনেক সময়েই চলিতেছে যখন তাহা হয় না আমি

কি করি বল ? যাহা হইয়া যায়, আমি কিছু বলিতে পারি না।" এই বলিয়া মা চুপ করিলেন। ভোলানাথ বলিলেন, "আমার কর্ত্তব্য করিব।" ভোলানাথের কিন্তু খবর পাইয়া চোখের জলও পড়িতেছিল। তাঁহার প্রাণটা এই রকমই কোমল।

যাক্, তিনি ৪ দিনের দিন কিছু ব্রাহ্মণ ভোজন ও দানের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। মা বলিলেন, "তোমাদের ব্রাহ্মণ খাওয়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে, বাচ্চুদের বাড়ী সে সব বন্দোবস্ত কর। ধর্ম্মশালায় এসব কিছু করিও না।" তাই হইবে স্থির হইল। মা এবার যখন কলিকাতা গিয়াছিলেন তখনই পিসিমাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন "ভাল করিয়া সেবা কর"।

কাশীতে অবস্থান

আজ মা সকালেই উঠিয়া বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে দুই চার জন করিয়া সকলে আসিতেছেন যাইতেছেন। একজন বলিলেন, "আচ্ছা মা, কাহারও যদি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা হয় তাহলে ঘোরা উচিৎ কিনা ?" মা বলিলেন, "কেন ঘুরবে ?" ভদ্রলোকটী বলিলেন, "কোন উদ্দেশ্য নেই, এমনি একটা ইচ্ছা হইতেছে।" মা বলিলেন, "উদ্দেশ্যবিহীন হইতেই পারে না। একটা উদ্দেশ্য ভিতরে থাকেই। এই যে উদ্দেশ্য নেই, এ'ও একটা উদ্দেশ্য। বেশ ত, যখন ঘোরাফেরার খেয়ালটা আসিয়াছে, তা'ই কর, এই করিয়া বাসনাটা নিবৃত্তি কর! এমন হইতে পারে হয়ত একটা স্থানে গিয়া, কি কিছুদিন ঘুরিবার পরে এ ভাবটির নিবৃত্তি আসিবে।"

একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "মা, তাঁর নাম করিতে বসিলেই ঘুম পায়, তৃষ্ণা পায়, নাম করিবার ইচ্ছা জাগে না।" মা বলিলেন, "বেশ ত ঘুম পায়, একটু ঘুমাইয়া নিয়া আবার নাম করিতে বস। তৃষ্ণা পাইয়াছে জল খাইয়া আবার নাম করিতে বস। 'জল খাইয়া ফেলিয়াছি,

আর কি করিয়া পূজা করিব?' এই ভাবটা রাখিও না। তোমার নাম করা চাইই, যে ভাবেই হউক, করিতে-ই হইবে—এই ভাবটা রাখিও।"

বেলা প্রায় ১২টায় অনেকেই চলিয়া গেলেন। মার সঙ্গে আমি দাদামহাশয়ের কথা উঠাইয়াছি। কথায় কথায় মা দাদামহাশয়ের ছোটবেলার কথায় বলিতেছেন, "শুনিয়াছি, বাবার অল্প বয়সেও সংসারের প্রতি আসক্তি খুবই কম ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেও একবার বাহির হইয়া গিয়াছিলেন; ধরিয়া ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল। পরে বিবাহ করান হইলে আবার বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। এর মধ্যে একবার লাল কাপড়ও পরিয়াছিলেন।

মায়ের মুখে দাদামশায়ের কথা

তারপর এক মেয়ে হইয়া কিছু দিনের পর মারা যায়। তারপরেই এই শরীরটার প্রকাশ, ও তারপর ক্রমে তিন ছেলে হইল। কিন্তু বাবা আমাদের নিয়াও যে মিশামিশি তাহা মোটেই করেন নাই। অনেক বৎসর পর বাড়ী আসিলেন। এমন কি ছেলেমেয়েরা দেখিয়া কেহ চিনিতে না পারিয়া ভয় পাইল। কে যেন আসিয়াছে। আপন ভাবে, ভগবৎভাবের গানেই তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। বিবাহ করিবার পরও শুনিয়াছি অনেক রাত্রে তিনি বাড়ী আসিতেন না গানে কাটাইতেন। ভগবৎ গানে যেন তিনি একেবারে লয় হইয়া যাইতেন। সত্য কথা বলিতে গেলে তোমার দাদামহাশয় ও দিদিমার জীবনটা একেবারেই ভিন্ন রকমের। ঠিক বাহির হইতে তাহা ধরিবার কোনই উপায় ছিল না। সন্তানগুলি যে হইয়া মরিয়াছে তাহাও জন্ম পূরণ করিবার জন্যই সব আসিয়াছিল। এর ভিতরেও কত কথা আছে। সাধারণে বুঝিবে না।"

দাদামহাশয়ের ক্রোধ ছিল। সে কথায়, মা বলিতেছেন, "একজন বলিয়াছিল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদেরও এক একটা ভাব প্রবল দেখা যায়। যেমন ক্রোধ ইত্যাদি। লক্ষ্য করিলে ধরা যায় যে কেহ রিপুর বশীভূত, আর কাহারও শরীর দিয়া শুধু এইসব ভাব বাহিরে খেলিয়া যাইতেছে। তোমরা ত দেখিয়াছ বাবা যখন রাগ করিতেন, যে বিপরীত ক্রোধ, এমন ক্রোধও দেখা যায় না, আবার তখনই জল হইয়া গেলেন। এসব ধরা বড় মুস্কিল।" এই সব বলিয়া দাদামহাশয়ের দেহত্যাগের সময়কার ও অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবের কথা বলিলেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে আমরা বাহির হইতে কিছুই ধরিতে পারি না।

দুপুর বেলা কাশ্মিরী ভক্তদের বাড়ী হইতে ও বাচ্চুদের বাড়ী হইতে, এবং আরও এক ডাক্তারের বাড়ী হইতে মার খাবার আসিবে। মা খাওয়ার পূর্ব্বেই শুইয়া পড়িলেন। মা কথায় কথায় একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ কত সময় হয়ত কথা হয়—'এই কাজ কর,' কিন্তু তোমরা দেখ, সেই কাজটা হইল না, হয়ত ভাব, মা বলিলেন তবুও এই ভাল কাজটা করা হইল না কেন? কিন্তু আমি বলি কি জান? কেহ যদি একটা ভাল কাজ করিবার ইচ্ছাও করে আর বাহিরে সে কাজটা করা না হয়, তবুও শুধু ইচ্ছার জন্যই একটা শুদ্ধ ক্রিয়া হয়। কিছুই বৃথা যায় না জানিও। যেমন বলে কাশী যাত্রা করিয়া মরিলেও কাশী প্রাপ্তির ফল হয়। সেইজন্যই সর্ব্বদা শুদ্ধ ভাব মনে রাখা দরকার।"

বৈকালে অনেক লোক আসিয়াছেন। একটী স্ত্রীলোক মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা; আপনি যেমন আনন্দে সর্ব্বদা আছেন এই আনন্দটা কি ভাবে ধরিয়া রাখা যায়?" মা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কাপড় খানা কি ভাবে ধরিয়া রাখ? শোক, দুঃখ, ঝড়,

বৃষ্টি যাহাই হউক কাপড়খানা ত ঠিকই রাখ। কাপড়টা রাখিতে হইবে এই আবশ্যকতা বোধ বিশেষ ভাবে হওয়ায় এমনি একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে একটু নড়িলেই আবার ঠিক করিয়া রাখ। সেই রকম অভ্যাস দ্বারাই এই আনন্দও ধরিয়া রাখা যায়।" স্ত্রীলোকটী খুসি হইয়া বলিলেন "ঠিকই ত, গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন, অভ্যাস যোগেই সব হইবে।" রাত্রি প্রায় ১টায় মা শুইলেন।

৪ঠা পৌষ, রবিবার—আজ সকালেই কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ আসিয়াছেন, একটী ভদ্রলোক মাকে বলিলেন, "মা, যোগ হয় কি প্রকারে?" মা অমনি হাসিয়া জবাব দিলেন, "বিয়োগ হইল কার সঙ্গে"? পরে বলিলেন, "এই যে বোধ—কই তাঁকে ত দেখি না, তার সঙ্গে ত আমার যোগ নাই—এই যে বিয়োগের মত ভাব; যাহা আছে তাহা ধরিবার জন্যই হটযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি করা হয়। গুরুস্থান, গুরুশক্তি হইতেই সব আসিবে।" ভদ্র-লোকটী বলিলেন, "মা, শুনা যায় গুরুকে পরীক্ষা করিয়া নেওয়া এবং শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া নেওয়া দরকার?" মা প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, "সে কি রকম জান না। যেমন মেয়ে বিবাহ দিবার পূর্ব্বে জামাই বাছাই করা হয়। বিবাহ হইয়া গেলে আর কোন কথা নাই। আর গুরু নিজে ধরা না দিলে শিষ্য চিনিবে কি করিয়া।" আর একটী ভদ্রলোক, 'মা, এটা কাহাকে বলে, ওটা কাহাকে বলে'—এই সব জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "দেখ, জানিবার কি শেষ আছে? সবই অনন্ত, এইসব প্রশ্ন না করিয়া কিসে চোখ খুলিবে এই প্রশ্নই ভাল নয় কি? সব কথার জবাব সব সময় আসেও না, তোমরাই বলাও না, বোধ হয় দরকার নাই।" আজ ভোলানাথ মাকে দিয়া দাদামহাশয়ের পারলৌকিক কার্য্য করাইবেন। সব স্থির করা হইয়াছে। ষোড়শ

দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সব জিনিস সাজাইয়া ভোলানাথ মাকে সেই ঘরে ডাকাইয়া নিলেন।

মা গিয়া আসনে বসিলেন। পণ্ডিত গুরুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মন্ত্র পড়াইতেছেন। মা আসনে বসিয়াই বলিলেন, "দান গ্রহন কি কারণ, যিনি দান করেন, তিনিই গ্রহণ করেনা।" তারপর আসনে বসিয়াই মার শরীর একেবারে স্থির হইয়া গেল। ভোলানাথ মাকে স্পর্শ করাইয়া ফুল-জল ছিটাইয়া দানকার্য্য করিতেছেন। মার শরীর যেন অবশভাবে ছাড়িয়া দিয়াছে। চোখের দৃষ্টি নিম্ন দিকে, অপলক। ভোলানাথ যতটুকু সম্ভব হাতে ধরিয়া ফুল-জল স্পর্শ করাইতেছেন। এই ভাবে শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ করা হইল। যাহার সমস্ত কর্ম্মই শেষ হইয়া গিয়াছে, দেহাত্মবুদ্ধিই নাই, লোকাচারের অনুরোধে তাঁহাকেও কর্ম্ম করাইতে বসান হইল! মা বলেন—"আমি ত করিব, কি করিব না, বলি না। যাহা হইবার হইয়া যাইতেছে।" বাস্তবিকই দেখিতেছি মা ত উঁচু-নিচু কোন স্তরেই দাঁড়াইয়া নাই, তাই সব কার্য্যেই তিনি সামঞ্জস্য দিয়া চলিতে পারিতেছেন।

আবার তপস্যার স্তর দেখাইবার জন্যই বোধহয় শরীর দিয়া স্তরে স্তরে এক একটা অবস্থা ঠিক ঠিক মত শেষ পর্য্যন্ত হইয়াও গিয়াছে। তখন এসব কাজে সামঞ্জস্য দিয়া চলিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন মা আবার সব কাজে সামঞ্জস্য দিয়া চলিতেছেন। তাই আমরাও যথা সম্ভব করাইয়া নিতেছি।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিতে আজ বেলা শেষ হইয়া আসিল। বেলা প্রায় ৩টায় মা খাইতে বসিয়াই বলিলেন, "আজ একবার বিন্ধ্যাচল ঘুরিয়া আসিলে হয়না? কয়টা বাজিয়াছে দেখ ত?" বহুলোক তখন মার দর্শনে আসিয়াছেন। মার খেয়াল, তখনই তাড়াতাড়ি করিয়া খাওয়া

শেষ করিয়া মা বিন্ধ্যাচল রওনা হইলেন। এলাহাবাদ হইতে জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। তাঁর সঙ্গেই মা বিন্ধ্যাচল চলিলেন, আমিও সঙ্গে গেলাম। একটু কাজ থাকায় ভোলানাথ আজ যাইতে পারিলেন না। কিন্তু মা রওনা হইয়াছেন, শুধু তাই আমরা দুইজন মার সাথে চলিলাম। সন্ধ্যার পর বিন্ধ্যাচল পৌছিলাম। হঠাৎ মাকে পাইয়া তথায় সকলেরই মহা আনন্দ হইল! মা শ্রীযুক্ত মহেশ বাবুকে দেখিতে গেলেন। পঞ্চবটি দেখিলেন। রাত্রিটা তথায় থাকিয়া ভোর ৫টায় মহেশ বাবুর মোটরে আমরা বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন আসিয়া ৬৷৷০ টায় ট্রেন ধরিলাম।

৫ই পৌষ, সোমবার—বেলা ৯৷৷টায় আমরা কাশী পৌছিলাম। মা আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া কাপড় মুড়ি দিয়া কয়েক ঘণ্টা পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। মা'ও সকলের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। মার মধুর হাসি ও কথায় সকলেই আনন্দ পাইতেছেন। কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "তাঁকে ধর। ধরিয়া থাকিলে পড়িয়া যায় না, এইরূপ কত কথাই বলিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন কথায় কথায় বলিতেছেন, "পূর্ব্বে যে শরীরের ভিতর দিয়া সাধনের ক্রিয়াগুলি হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে পূজা যজ্ঞাদি সবই ত শরীরের ভাব দিয়া হইয়া গিয়াছে। যেন যজ্ঞ করিতেছি আঙ্গুল দিয়া মাটির মধ্যে মণ্ডল আঁকা হইয়া যাইতেছে, সামনে আর কোন জিনিষ পত্র নাই ত। শুধু ভাব দিয়াই শরীরের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। একবার যেই মনে হইল, এইভাবেও তখন হইয়াছিল এখনও করি, এই ইচ্ছা হওয়ামাত্রই আঙ্গুলগুলি এলোমেলো হইয়া

মায়ের সাধনার কথা

যাইত। আবার খানিকক্ষণ হাতটা একেবারে স্থির হইয়া থাকিত। আমিও সেইভাবে যখন ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিতাম তখন আবার ধীরে ধীরে হাতটা ঠিক ঠিক যায়গায় গিয়া আঙ্গুলগুলি চলিতে লাগিল। মণ্ডলাকার হইয়া যাইতে লাগিল এই সব চমৎকার দৃশ্য দেখিতাম। কোন রকম সংস্কার নিয়া কাজ হইত না।"

"আবার দেখ, কেহ কোন সাধুর জীবনী বা ভাগবত ইত্যাদি শুনাইতে আসিলে একটু শুনিতে না শুনিতেই ভাবটা এমন পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত যে শুনিবার মত অবস্থা থাকিত না। ইহার মধ্যে কোনরূপ অবজ্ঞার ভাব বিন্দুমাত্র ত নাই। শরীরেই এইরূপ একটা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত।" আমি বলিলাম, "কোনরূপ অনুকরণ বা সংস্কারের ভাবটী যে তোমার মধ্যে কাজ করিতে পারিবে না। তাই এরূপ শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়া বাহিরের কিছুই শুনিতে পাইতে না।"

অনেকদিন পূর্ব্বে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন। ঋষিকেশে পূর্ণানন্দ স্বামীর আশ্রম আছে। মা যখন জ্যোতিশ দাদাকে নিয়া কিছুদিন ঋষিকেশে ছিলেন তখন পূর্ণানন্দ স্বামী লোকের মুখে মার কথা শুনিয়াও প্রথম মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন না। স্ত্রীলোক বলিয়া সাধু সমাজ প্রথম প্রথম মার কাছে আসা যাওয়া করা বিশেষ পছন্দ করিতেন না; পরে অবশ্য মাকে অনেকেই খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন। পূর্ণানন্দ স্বামী নিজে না আসিয়া এক শিষ্য দ্বারা মাকে গোপনে একটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন এবং উত্তর নিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি মাকে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন, "আপনার স্বপ্ন কি রকম হয়?" মা উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মূল এই যে, "অজ্ঞান অবস্থায় নিদ্রা হয়। সেই নিদ্রাতেই স্বপ্ন হয়। যাহার অজ্ঞানতা

নাই তাহার নিদ্রাও নাই। স্বপ্ন আসিবে কোথা হইতে? আর যদি বল, যা কিছু দেখিতেছ সবই স্বপ্ন, তাহারও রকমারি আছে।" মার মুখে এই ভাবের জবাব শুনিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পরে তিনি মাকে নিয়া খুব আদর যত্ন করিতেন। মা তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন। তিনি নিজের হাতে মাকে অনেক সময় রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছেন।

আজ কথায় কথায়, কোন কোন স্থানে মার ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে, সে কথা উঠিলে মা বলিলেন, "দেখ এই ইচ্ছা যে দেখিতেছ, ইহাও তোমাদের ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে, বাস্তবিক এই শরীরের ইচ্ছা অনিচ্ছা বলিয়া কিছুই নাই। বীজের কি ইচ্ছা গাছ হইব? গাছের কি ইচ্ছা জাগে যে, লোক আসুক আমি ছায়া দিব? তা যেমন নয়, স্বাভাবিক ভাবেই এই সব হইয়া যাইতেছে, তেমনি এই শরীর দিয়া যাহা ইচ্ছার মত প্রকাশ পাইতেছে তাহাও স্বাভাবিক। তোমাদের দরকারের জন্য বাহির করিয়া দিতেছে।"

দাদামহাশয়ের মৃত্যুকালীন সন্ন্যাস মন্ত্র দেওয়ার কথা আমি উঠাইলাম। মা বলিলেন, "তোমরা বল মন্ত্র বা দীক্ষা, আমি ত বলি বাবার সঙ্গে ত কত কথা বলিয়াছি এও একটা রকমের কথা বাহির হইয়া গিয়াছে।" "ইচ্ছার কথায় আবার বলিতেছেন, "দেখ, এই শরীরটা দিয়া তোমরা যাহাই করাইয়া নিতেছ, তাহাই হইয়া যাইতেছে।

"তোমরা কীর্ত্তনের যোগাড় করিয়া কীর্ত্তনাদি কর। কীর্ত্তনে যে ভাব তাহা শরীটা দিয়া হইয়া গিয়াছে। আবার তোমরা কালীপূজার যোগাড় করিয়া শরীরের সামনে আনিয়াছ, পূজার যে ভাব তাহা এ শরীরটা দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আবার তোমরা সন্ন্যাস নিয়া কাছে আসিয়াছ, (মানস সরোবরের কথা.), সন্ন্যাসের মন্ত্র এই মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।

আমি ত কিছুই বলি নাই, তোমরা যে যেই ভাব নিয়া উপস্থিত হইয়াছ সে সেই ভাবে এই শরীরটাকে ভাবান্বিত করিয়া নিয়াছ। সেই সেই ভাবের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া নিয়াছ। এর মধ্যে আমার ত কোনই ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই।" আজও অনেক রাত্রি অবধি সকলে বসিয়া রহিলেন। আজ আসিবার সময় গোদাবরীকে নিয়া আসা হইয়াছে। সে মার সঙ্গে হরিদ্বার যাইবে।

৬ই পৌষ, মঙ্গলবার—আজ মা ভোরেই উঠিয়াছেন। আজ অনেকেই দর্শনার্থে আসিয়াছেন। কথা বার্ত্তা হইতেছে, কথায় কথায় রামতারণ বাবুর কথা উঠিল। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক। কিন্তু রসিকও খুব। এক একটা কথা যাহা বলেন তাহার দাম আছে। মাকে তিনি তিনটি নাম দিয়াছেন:— ১। জ্ঞানপাপী, (২) কেউটে সাপ, (৩) বিশ্রী মিষ্টি হাসি। অর্থ করিলেন কেউটে সাপ একবার ছোবল মারলেই তাহার বিষ আর নামে না।

জ্ঞানপাপী, কেউটে সাপ, ও বিশ্রী মিষ্টিহাসি

মাকেও যে একবার চিনিতে পারিয়াছে তাহার আর ছাড়িবার উপায় নাই। দ্বিতীয় জ্ঞানপাপী কিনা, আপনার সব শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিছু দিতেছেন না। তৃতীয়, বিশ্রি মিষ্টি হাসি—কিনা, বিশেষ শ্রীযুক্ত মিষ্টি হাসিটুকু।" এই ভদ্রলোকের কথা এই ভাবেরই ছিল। মাকে দেখিলেই ইহার চোখ জলে ভরিয়া ওঠে।

আজ মার হাতের লেখা কৃষ্ণের শতনামের কতকটা প্রাতেই বাহির করিয়া আমি পড়িয়া সকলকে শুনাইতেছি। লেখার কত ভুল কিন্তু অক্ষরগুলি সুন্দর। তাহা নিয়া খুব আনন্দ করা হইতেছে। মার একটা চমৎকার এই যে কখনও হয়ত বেশ লেখা হইয়া

যাইতেছে। আবার হয়ত একটা নাম দস্তখত করিতেই মহা মুস্কিল! যখন যাহা দরকার হইয়া যাইত। লেখার মধ্যেও দেখা যাইত একস্থানে যেটা ঠিক লিখিয়াছেন, আবার অন্য স্থানে তাহাই লিখিতে ভুল করিয়াছেন। এইসব কথা হইতেছে। মা বলিতেছেন, "আমি ত তোমাদের মত ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না যখন যাহা হইয়া যায়।"

বৈকালে ভক্তদের সঙ্গে কথা হইতেছে। বহু লোক বসিয়া আছে। কুমুদ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন, শান্তির কথা উঠিল, শান্তি কিসে হয়? মা অমনি উত্তর দিলেন, "দূর অন্ত হইলেই শান্ত হয়"। যতক্ষন তিনি দূরে আছেন এই বোধ আছে, ততক্ষনই অশান্তি বোধ। একজন বলিল, "মা সবই ত বুঝিতে পারি, কিন্তু কিছু করিতে পারি না।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, আমাদের বাঝা হয় না, বুঝলে কর্ম্মেই প্রকাশ পাইত।" কিসে বোঝা যায়? এই কথার উত্তরে বলিলেন, "অন্ধ বিশ্বাস। গুরুর আদেশমত কাজ করিয়া যাও। গুরুশক্তিতেই সব পাইবে। বিশ্বাস বলিতেই অন্ধ। বিশ্বাসের চক্ষু নাই।"

কৃষ্ণতত্ত্ব।

নানালোকের নানা ভাব মার নিকট আসিয়া প্রকাশ পায় মাও যাহার যে ভাব সেই ভাবেই তাহাকে কথা বলিয়া শান্ত করিতেছেন। সকলেই মার কথায় আনন্দ পাইতেছেন। অনেকে খাওয়া দাওয়া প্রায় ভুলিয়া মার নিকট বসিয়াই আছেন। রাত্রি প্রায় ১০ টায় সকলে উঠিলেন। আগামীকল্য ১০ টায় মার হরিদ্বার রওনা হইবার কথা স্থির হইয়াছে। আমি মার আদেশমত কালই কলিকাতা রওনা হইব। ভোলানাথও দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে কলিকাতায় যাইতেছেন।

মা তারাপীঠ যাইবার সময় গরুর গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে-

ছিলেন—একটি গরু দেখিয়া বলিতেছিলেন, "দেখ ত' গরু ত পশু, পশু কি—না পশুর বৃত্তি, সেই বৃত্তিগুলির রক্ষক রাখাল কি করে? না গরুগুলিকে রক্ষা করিয়া যাহাতে তাহাদের নিকট হইতে দুধ পাওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করে। দুধ হইল শুভ্রবর্ণ, শুভ্রবর্ণ হইল কি—না সত্ত্ব গুণ।"

"বৃত্তিগুলিকে সেইরকম ভাবে রক্ষা করিতে হয় যাহাতে তাহা হইতে সত্ত্বগুণ বাহির হয়। তাহার পর মন্থন করিয়া সত্ত্বের সার বস্তু মাখন উঠিল। সেই মাখনের পরিণতি কোথায়? না পরমাত্মায়; তাই মাখন-চোর কৃষ্ণ। এখন পরমাত্মাকে "তুমি তুমিই" বল কি, "আমি আমিই বল,' একই কথা।"

"আবার দেখ গোপীনীরা ছিলেন, তাহা কি? না দশ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু এই যোল। যোলর উপর যে সত্য, স্বরূপ, সেই যে এক রস ধর না, সেই রসই 'ঋষি-নামে কথিত। ঋষিরা কি করিলেন? তোমাদের মুখে শুনা রাম অবতারে, রামের কাছে গিয়া তাঁকে পতিভাবে কামনা করিলেন। রাম বলিলেন, "এখন নয়, কৃষ্ণ অবতারে তোমাদের মনবাসনা পূর্ণ হইবে।" সেই এক রস গিয়া যখন রামের কাছে দাঁড়াইল মিলন রসের জন্য, তখন আকর্ষণ ব্যতীত সেই রসের পরিণতি হয় না বলিয়া, এই যে তোমরা বল, রামের কাছে গিয়া পতিভাবে কামনা করায়, রাম বলিলেন, "কৃষ্ণ আসিলে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।" তোমাদের মুখেই শুনি, কৃষ্ণ কি? না আকর্ষণ। রামের কাছে গেলেই আকর্ষণ আসিবেই। তাই রামকে পতিভাবে চাওয়ার কথা আসিল।"

কৃষ্ণের কথা তোমরা যাহা বলিয়া থাক। যখন কৃষ্ণ আসিলেন তখনই লীলা আরম্ভ হইল; কারণ সেই রসই লীলার অধিকারী কিনা! তাই কাত্যায়নী পূজা করিয়া পূজ্য পূজকের সীমা অতিক্রম করিয়া, লীলার অধিকারী। লীলা নিত্য বলা হয়, সত্যই

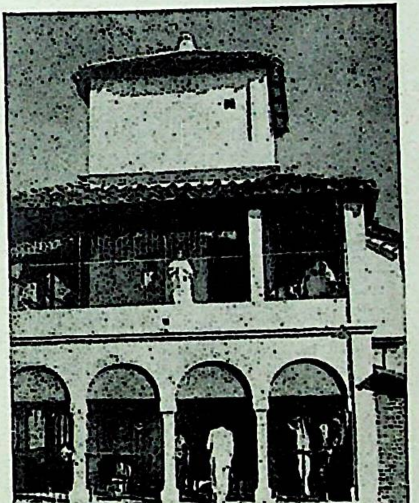

বিন্ধ্যাচল আশ্রম

লীলা কিন্তু নিত্য।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ত আবোল তাবোল বলি!" আবার বলিতেছেন, "সেই লীলায় যোগ দিল কাহারা? না গোপিনীরা। গোপিনী কি, না, সেই এক রস। ঋষিরাই গোপিনী হইয়াছিল তোমাদের মুখে শুনা যায়। তাহা অতীন্দ্রিয়ের বিষয়, তাই জাগতিকভাবে তাহা ধরিতে পারা যায় না। এই প্রাকৃতিক বিষয়-ভাব হইতে সেই অপ্রাকৃত খেলা, লীলা-রস গোপন কিনা, তাই, তাহাই গোপিনী নামে কথিত ও সেই অধিকারী।"

এই বলিয়া আবার হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "আচ্ছা দেখত, বাহিরের দিক হইতে দেখিলেও গরু রক্ষা করে গোপেরা। গোপ নাম হইল কেন? না, দুধের মধ্যে মাখন গুপ্তভাবে থাকে তাহা ত সাধারণ ভাবে দেখিতে পাও না। এই মাখন অর্থাৎ গুপ্ত জিনিষ বাহির করে বলিয়াই তাহারা গোপ।" এই বলিয়া শিশুর মত হাসিতে লাগিলেন "এই এক দিকের এলোমেলো কথা খেয়ালে এল বল্লাম।"

৭ই পৌষ, বুধবার—আজ ১০টায় মা রওনা হইবেন। ভোর বেলা হইতেই সকলে মার কাছে আসিতেছেন। একটী স্ত্রীলোক মাকে বলিলেন, "মা সর্ব্বদা এত ভীড়, আপনি একটু বিশ্রাম পর্য্যন্ত করিতে সময় পান না, অথচ একটু ক্লান্তি বা বিরক্তি-বোধ নাই। আনন্দে যেন ডুবিয়া আছেন। কি করিয়া এই ভাবটা পাওয়া যায়?" মা, উত্তরে বলিলেন, "আচ্ছা মা, একঘরে ত কত লোক থাকে তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বা তাহাদের সঙ্গে বসিয়া থাকিতে কি ক্লান্তি বোধ হয় বা বিরক্তি হয়? আবার দেখ, একটা শরীরের ভিতরেই হাত, পা ইত্যাদি নানা অঙ্গ আছে, অঙ্গগুলি দরকার মত নড়াচড়া করে, তা বলিয়া কি বিরক্ত হয়?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সকলে মার এতবড় ভাবের

ভীড়ে মায়ের বিরক্তি নাই।

১৬

কথার অর্থ বুঝিলেন কিনা জানি না। কিন্তু যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি উত্তর বুঝিয়া খুব আনন্দ পাইলেন। যাহা হউক সকলের নিকট বিদায় নিয়া বেলা ১১টায় মা কাশী ছাড়িলেন। বেলা ৪টায় আমি ও ভোলানাথ কলিকাতা রওনা হইলাম।

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার—আজ বেলা ৯টায় আমরা কলিকাতা পৌঁছিয়াছি। যতীশ দাদাদের বাসায় গেলাম। তথায় খাওয়া দাওয়া করিয়া দিদিমার সহিত দেখা করিয়া বিড়লার মন্দিরে গেলাম। স্বামী অখণ্ডানন্দজী মার আদেশে বিড়লার মন্দিরে আছেন। আগামী রবিবার দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধ। দিদিমার মুখে শুনিলাম, কলিকাতার নাম করিতে করিতে সজ্ঞানেই দাদামহাশয় বসা অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। সকলের মুখে শুনিলাম, দিদিমা উচ্চৈস্বরে নাম শুনাইয়াছেন।

১৭ই পৌষ, শনিবার—মায়ের আর কোন বিশেষ খবর নাই। দাদামহাশয়ের শ্রাদ্ধাদি ১১ই পৌষ রবিবার ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ভোলানাথ ও ভক্তেরা সকলে মিলিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। দিদিমা যেমন স্থিরা, ধীরা, তেমনই আছেন। বাহিরে যথাসাধ্য কার্য্যে যোগদান করিতেছেন।

মার খবর পাইয়াছি। মা অল্প সময়ের জন্য একবার দেরাদুন গিয়াছিলেন, তারপর আবার হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বড়দিনের বন্ধে, ভ্রমর, নবতরু দাদা, মার নিকট গিয়াছে। মায়ের আদেশে যোগেশ দাদা কিছুদিন হয় উত্তর কাশী হইতে আসিয়া, কলিকাতায় তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাদের সঙ্গে দেখা করিয়া পুনরায় দেরাদুন গিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনিও মার সঙ্গে হরিদ্বার আছেন। আর কোন খবর নাই।

আমরা কলিকাতায় আছি। সংজ্ঞা দেবী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে একটী কথা শুনিলাম, তিনি বলিতেছিলেন, মা নাকি একদিন সংজ্ঞা দেবীর মুখে তাঁহাকে কোনও মাতাজী, কোনও কারণে একটু অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, একথা শুনিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "দেখ অভিসম্পাত করিব কাহাকে? আমার হাতের আঙ্গুলগুলি দিয়া যদি শরীরের কোন স্থান চুলকাইতে গিয়া সেখানকার রক্ত বাহির হইয়া যায় তবে কি আঙ্গুলগুলিকে অভিসম্পাত করা চলে? চারিদিকে যাহা দেখি সবই যে তাই। এক ছাড়া যে কিছুই নাই, অভিসম্পাত কে কাহাকে করিবে?" মার মুখ হইতে অনেক সময় এইরূপ ভাবের কথা বাহির হইয়া পড়ে; এ ভাবের তুলনা কোথায় মিলিবে? আমি এ ভাবের কথা মার মুখে আরও শুনিয়াছি কিন্তু তবুও আজ আবার শুনিয়া যেন স্তম্ভিত হইলাম। একথা যেন পুরান হয় না। আমরা মাকে নিয়া শুধু খেলাই করিতেছি। কিছুই যেন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা হইল না। ভাবিয়া মনটা মধ্যে মধ্যে বড় খারাপ হয়—আজও হইল। অসীম সমুদ্র নিকটে, অথচ একবিন্দু জলও যে নিবার ক্ষমতা হইতেছে না। তাই মা বলেন, "কৃপা ত তাঁর ঝরিয়া পড়িতেছে, নেয় কে!"

৩রা পৌষ মা একটি ঘটনা বলিয়াছিলেন তাহা লিখিতেছি। দাদা-মহাশয়ের কথা বলিতেছিলেন। আমি ও স্বামী অখণ্ডানন্দজী অনেক সময়ই মার সঙ্গে থাকি, কিন্তু তারাপীঠ হইতে কাশী যাওয়ার সময় মা স্বামীজীকে কলিকাতা থাকিতে আদেশ দিলেন। তারাপীঠ হইতেই ইহা স্থির হইল। সন্ধ্যাবেলা মা যখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বসিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, তখনও গাড়ী আসিবার কিছু বিলম্ব ছিল।

মা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ একটু অস্বাভাবিকভাবে উঠিয়া গিয়া অখণ্ডানন্দজীকে কয়েকটী কথা বলিলেন। কথাগুলি এইভাবে হইল যেমন মা

সব সময় বুঝাইতেন, এক যায়গায় যাওয়ার অনেক রাস্তাই আছে, সেই রকম নানাভাবে কথাটা বলিলেন, "দেখ, কাশীযাত্রা করিয়া মরিলেও যেমন কাশী প্রাপ্তি হয় বলিয়া তোমরা বল, সেই রকম শুভকার্য্য করিব বলিয়া যাত্রা করিয়া যদি সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বাহিরে প্রকাশ না'ও পায় তবুও সেইরূপ কার্য্য হয়।" মা অনেক সময় বলেন, "যদি তোমরা কোন ইচ্ছা ভিতরে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা কর, সেই কার্য্য যে কোন উপলক্ষ্য দ্বারা তিনি সম্পন্ন করাইয়া নেন, তাহা জাগতিক হিসাবে সব সময় ধরা যায় না।"

অখণ্ডানন্দজীকে মা বলিয়া দিলেন, "তুমি কলিকাতা গিয়াই তোমার দাদামহাশয়ের বাসায় চলিয়া যাইও।" হয়ত বৰ্দ্ধমান হইতে ঐ রাত্রে ফিরিয়া আর কেহই সেইদিন দাদামহাশয়ের বাসায় যাইতেন না। কিন্তু মার আদেশ অনুযায়ী অখণ্ডা- নন্দজী কলিকাতা যাইয়াই দাদামহাশয়ের বাসায় গিয়া দেখেন, একটু পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে।

মার সঙ্গে দেখা করিতে অনেকেই কলিকাতা হইতে বৰ্দ্ধমান আসিয়াছিলেন। সকলেই মার গাড়ী ছাড়িবার পর কলিকাতা ফিরিবেন স্থির করিলেন। শুধু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কন্যা ননীকে নিয়া বেশী রাত হইবে বলিয়া কিছু পূর্ব্বেই কলিকাতা রওনা হইবেন বলিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা স্বামীজীকে বলিলেন, "তুমি ইহাদের সঙ্গে যাবে।" সুরেনবাবুও বলিলেন, "চলুন না আমি আপনাকে মোটরে পৌছাইয়া দিব।" কিন্তু মার গাড়ীর আরও কিছু দেরী আছে, এই সময়টুকু মার সঙ্গ করিতে পারিবেন না বলিয়া যাইতে রাজী হইলেন না। মা'ও আর কিছু বলিলেন না, মা'ত খুলিয়া কিছু বলেন না, স্বামীজী

মার এই ইঙ্গিত ধরিতে পারিলেন না। মা অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে কথা বলিয়া আবার আসিয়া ভক্তদের কাছে বেঞ্চিতে বসিলেন। অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে মার সব কথাই গোপনে হইয়াছিল পুর্ব্বেই লেখা হইয়াছে। মা যাহার যতটুকু দরকার তাহার নিকট ততটুকুই প্রকাশ করেন। পরে মার মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম। যথা সময়ে গাড়ী আসিলে আমরা কাশী রওনা হইলাম।

কাশীতে মার মুখে শুনিলাম, "আমি যখন বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বসিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম তখন তোমাদের দাদামহাশয়ের সন্ন্যাসের ভাবটা ছবির মত মূর্ত্তি ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কি রকম জান? তোমাদের যেমন দেখি। এই শরীরের মা বলিতেন এই ভাবে শরীরের বাবা এই শরীরটা দেখার পূর্ব্বে নাকি তুবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। শরীরের ঠাকুমার মুখে শুনিয়াছি যে এমন কি লালবস্ত্রও নাকি ধারণ করিয়াছিলেন; একবার বিবাহের পূর্ব্বে, একবার বিবাহের পরে। সকলে জোর করিয়া ঘরে ফিরাইয়া নিয়া আসে তার পরই নাকি এই শরীর।" যাক, মা বলিতেছেন, "তাহার সেই সংস্কারটা আমার চোখে আসিতে লাগিল।"

তারপর ট্রেনে ১০ টার সময় যখন মাকে খাওয়াইতে গেলাম, মা হঠাৎ একটু মুখে দিয়াই শুইয়া পড়িলেন। মা বলিতেছেন, "তখন দেখিতেছিলাম কি জান? তোমাদের বায়োস্কোপের মত সব পরিষ্কার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। দেখিলাম, তোমার

দাদামহাশয়ের শেষ সময়
ময়ের সন্ধান

দাদামহাশয়ের শরীরটা আছে, আর তার উপরেই আর একটা শরীর যেন তাহাতে স্পষ্ট ভাবে যুক্ত হইয়া আছে। সেই শরীরটার রূপ কেমন জান? যেন, ধূয়া আর সাদা একটা জ্যোতিতে মাখানো"; নিজের

শরীর দেখাইয়া বলিতেছেন, "এই শরীরটা সেখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলে, আপনা হইতেই যেমন মন্ত্রাদি বাহির হইয়া যায়, সেই ভাবে তথায় সন্ন্যাস জাতীয় কি সব মন্ত্র সেই ছায়া-মূর্ত্তির কাছে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। তারপর, ঐ ধুয়ার মূর্ত্তি ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে পাতলা হইয়া যেন মিলাইয়া গেল। কেমন জান? যেমন জলে এক ফোঁটা তেল কি দুধ পড়িলে প্রথমে বড় হইয়া পরে জলেই মিলাইয়া যায়। আবার, চুরুট খাইয়া মুখ হইতে ধুয়া ছাড়িলে প্রথমে তাহা বেশ দেখা যায় পরে ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, কতকটা সেইরূপ; উপমা সর্ব্বাংশে ত হয় না।"

আমি একথা শুনিয়া বলিলাম, "মা তোমায় দেখিতেছি বাপের উপরও এইরূপ একটা ঘটনা হইয়া গেল"। মা বলিলেন, "দেখ, আমি ত কিছুই করি না, তোমরা যে যেমন করাইয়া লও, এই শরীরটা দিয়া তাহাই তোমাদের আবশ্যক মত হইয়া যাইতেছে। ইহা আর বিশেষ ঘটনা কি হইল? তোমাদের সঙ্গে যেমন কথা বলি, শরীরের বাবার সঙ্গে যেমন কথা বলিতেছি, এও তেমনি হইয়াছে। আমি ত দেখি সবই একরকম। তুমি এসব বিশেষ ঘটনা বলছ কেন?"

একথা বলিয়া হাসি হাসি মুখে ছেলে মানুষের মত আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি আর কি জবাব দিব? যাঁর কাছে সবই এক, আমাদের কাছে, এই যে বিশেষ ঘটনা হইয়া গেল তাঁকে ইহা কি করিয়া বুঝাইব। যোগী ঋষিরা কত সাধনায় যে অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন না, আমার মার কাছে যে তাহাও হাসি খেলার মত সহজ সরল। আবার বলেন, "আমি কিছুই জানি না" এই কিছুই না জানাতেও তিনি প্রকাশিত।

২০শে পৌষ, মঙ্গলবার—বড়দিনের ছুটী শেষ হওয়ায়

গতকল্য ভ্রমর মার নিকট হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছে। খবর পাইয়া আজ প্রাতে ভ্রমরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। ভ্রমরের নিকট শুনিলাম মা হরিদ্বার পৌছিবার পর দিনই দেরাদুন যান এবং তথায় একদিন থাকিয়া গোদাবরীকে তথায় রাখিয়া পুনরায় হরিদ্বার ফিরিয়া আসেন। সেই সময়তে ভ্রমরও হরিদ্বার গিয়া মার চরণ দর্শন পায়। ভ্রমর যাওয়ার পরদিনই মা, ভ্রমর, রুমাদেবী ও যোগেশ ব্রহ্মচারীকে নিয়া লছমন ঝোলা চলিয়া যান। তথায় গঙ্গার ধারে ধর্ম্মশালায় ৫।৬ দিন থাকিয়া হৃষিকেশ আসিয়া কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় রাত্রি কাটাইয়া হরিদ্বার চলিয়া আসেন এবং 'নানকীবাইয়ের' ধর্ম্মশালায় থাকার একটু অসুবিধা হওয়ায় নিশিবাবু ও মাসীমাকে অন্য এক ধর্ম্মশালায় রাখিয়া হরিদ্বার একদিন থাকিয়া মা দেরাদুন চলিয়া যান। নিশিবাবু ও মাসীমা হরিদ্বারেই থাকেন। অন্যান্য সকলে মার সঙ্গেই দেরাদুন গিয়াছেন। ভ্রমর মাকে নিয়া যেদিন দেরাদুন পৌছিয়াছিল সেইদিন রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা চলিয়া আসিয়াছে: অর্থাৎ ১৭ই পৌষ শনিবার, মা দেরাদুন পৌছিয়াছেন এবং আশ্রমেই আছেন। আর বিশেষ কোন খবর নাই।

শুনিলাম মার শরীর পূর্ব্বের মতই প্রায় আছে। একবার হৃষিকেশ একটি সাধু হঠাৎ দরজার সামনে আসিয়া মাকে বলে, "মা আমার কয়দিন যাবৎ জ্বর ছাড়িতেছে না।" সেই দিন রাত্রি হইতেই মার নাকি একটু একটু জ্বর হইয়া দুইদিন ছিল। মার কথায় ভ্রমরের মনে হইল ঐ সাধুর জ্বরই মার শরীরে আসিয়াছে। ভ্রমরকে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, "আমার জ্বরের কথা এখন কাহাকেও কিছু লিখিও না। অন্যত্র লিখিলে একটা হৈ চৈ হইবে মাত্র।" আমি ভ্রমরের মুখে এই ঘটনাটী শুনিয়া হাসিলাম।

২৪শে পৌষ, সোমবার—আজ আমরা ঢাকায় পৌছিলাম।

৩০শে পৌষ, শুক্রবার--আজ ভোলানাথ নূতন যজ্ঞমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। রাজার অর্থে এই মন্দির তৈয়ার হইয়াছে। অনেকেই প্রায় আশ্রমে আমাদের কাছে মায়ের কথা শুনিতে আসিতেছেন।

৭ই মাঘ, শুক্রবার—ভোলানাথ আজ হরিদ্বার যাইবার জন্য রওনা হইয়া গেলেন আমরাও সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে আসিলাম।

সেরাছুনে ভোলানাথের কীর্ত্তন

ভোলানাথ এবার এখানে বেশ আনন্দ দিয়া গিয়াছেন। ছেলে মানুষের মত তিনি সর্ব্বদাই প্রায় নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলকে নিয়া নাচঘরে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার সুর, তাল জ্ঞান, খুব না থাকিলেও ভাবে এমন সুন্দর কীর্ত্তন জমাইয়া তুলিতেন, অনেকেই তাহাতে খুব আনন্দ পাইতেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই তাঁহার বেশী সাথী। তাহারাই সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বেশী থাকিত। দীর্ঘ জটা, বক্ষ বিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু, পরিধানে সিল্কের গেরুয়া তাঁহাকে বেশ দেখায়। দু'চারটী গান তিনি খুব ভাবের সহিত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দিতেন :—

১। “আমি যে ভাই মায়ের ছেলে
আমি আবার ভয় করি কা'র ?
যে আমারে ভয় দেখাবে
আমি অমনি বলে দিব মায়।”

২। “নব সজল জলধর কায়
কপালে সিন্দুর কটীতে ঘুঙ্গুর
রতন নূপুর পায়, (মায়ের)
হাসিতে হাসিতে দানব নাশিছে
রুধির লেগেছে গায়, (মায়ের)...।”...

৩। "পুতুল বাজির পুতুল আমরা,
যেমনি নাচাও তেমনি নাচি,
যখন বসায় তখন বসি,
যখন উঠায় তখন উঠি" ইত্যাদি।

মায়ের খবর পাইলাম। তিনি এখনও দেরাদুন আশ্রমেই আছেন।

১৫ই মাঘ, শনিবার—ভোলানাথ দেরাদুন হইতে দিল্লী গিয়াছেন খবর পাইলাম। দেরাদুন হইতে হরিরাম যোশীর পত্রে জানিলাম। মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সোলনের রাজা ও রাণী দেরাদুন গিয়া ১০ দিন ছিলেন। তারপর ৯ই মাঘ মা রায়পুর গিয়াছেন, সঙ্গে মহারতন তার মেয়ে বিমলা, রুমা দেবী ও আলমোড়ার আরও কয়েকটী স্ত্রীলোক (মাকে দর্শন করিতে দেরাদুন গিয়াছিলেন) ইত্যাদি অনেকেই আছেন।

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার—আজ আমরা কলিকাতা রওনা হইব। মার আদেশ মত ঢাকা কয়দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা রওনা হইলাম।

১৯শে মাঘ, বুধবার—আজ সকালে কলিকাতায় পৌছিয়া খবর পাইলাম মার জ্বর হইয়াছে খবর আসিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় ভোলানাথের পত্রে মার জ্বরের বিস্তারিত খবর পাইলাম। তিনি যোগেশ ব্রহ্মচারীর চিঠি পাইয়া দিল্লী হইতে মায়ের কাছে রায়পুর চলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, হৃষিকেশ হইতে ভ্রমর মার যে জ্বর দেখিয়া আসিয়াছিল সেই জ্বরই চলিতেছে। প্রায় এক মাসের উপর জ্বর। দুই দিন অন্তর অন্তর জ্বর আসে। কাহাকেও জানাইতে নিষেধ করায় এতদিন আমাদের খবর দেওয়া হয় নাই। মার শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

রায়পুরে মায়ের জ্বর

আমাদের এখন যাইতে নিষেধ করায় আমরা মার অসুখের খবর পাইয়াও মার নিকট যাইতে পারিলাম না। কোনও কার্য্যবশতঃ কলিকাতাতেই কিছুদিন অপেক্ষা করা স্থির হইল।

২৪শে মাঘ, সোমবার— আজও ভোলানাথের এক পত্র পাইলাম, মাকে বলিয়া কহিয়া দেরাদুন আশ্রমে নিয়া আসা হইয়াছে। জ্বর দু' দিন অন্তর আসে, তবে অপেক্ষাকৃত কম দেখা যাইতেছে।

২৭শে মাঘ, বৃহস্পতিবার—আজ ভোলানাথের পত্রে জানিলাম, মার জ্বর ১০৫° ডিগ্রিই উঠিয়াছে, খুব দুর্ব্বল। তাই ডাক্তার সোমকে আনাইয়া দেখান হইয়াছে। তিনি পরীক্ষা করিতে রক্ত নিয়াছেন। পরীক্ষার পর ঔষধ দিবেন। মা চিকিৎসা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" ভোলানাথ মার এইরূপ অসুখ দেখিয়া খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ডাক্তার দেখানই স্থির হইয়াছে।

২রা ফাল্গুন, সোমবার—আমরা দুই দিনের জন্য পুরী গিয়াছিলাম। আজ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছি। ভোলানাথের পত্রে জানিলাম ডাক্তার সোম মার রক্ত পরীক্ষা করিয়া কিছু পান নাই। ঔষধ দেওয়া হয় নাই। ঔষধ দেওয়া সঙ্গত কিনা ভোলানাথ স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, জ্বর এক ভাবেই চলিতেছে। দুই দিন অন্তর জ্বর খুব আসে, ছয় সাত ঘণ্টা থাকে। মাকে জ্বর সারাইবার কথা বলায় মা বলেন, "তোমরা জ্বরকে হিংসা করিতেছ কেন? তোমরাও যেমন আস, উহারাও তেমনি আসিয়াছে, শরীরের ভিতর খেলা করিতেছে। আমাকে ত কোন কষ্ট দিতেছে না, বরং আনন্দই।" ভোলানাথ মার অবস্থা দেখিয়া খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

৪ঠা ফাল্গুন, বুধবার—আজ আমরা কাশী রওনা হইলাম।

ভক্তেরা অনেকেই মার জন্য খুব ব্যস্ত। কিন্তু কি করিবেন নিজেদের কাজ কর্ম্মের জন্য কাহারও যাইবার সুবিধা হইতেছে না। "কুম্ভস্নান" আসিয়াছে সেই উপলক্ষ্যে মার চরণ দর্শনে অনেকে যাইবেন, স্থির করিয়াছেন।

৫ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—আজ আমরা কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছি। হরির ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছি। সঙ্গে বেলু ও নিধু আসিয়াছে, তাহারাও মার কাছে চলিয়াছে।

৮ই ফাল্গুন, রবিবার—গতকল্য যতীশ দাদার এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "গতকল্য হরিদ্বার হইতে বাবার লিখিত এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'তোমাদের মার জ্বর একই অবস্থায় আসিতেছে। কোন প্রকার কম হইতেছে না। কোন ঔষধ ব্যবহার করা হয় নাই, শরীর খুবই দুর্ব্বল। তোমাদের মা গতকল্য পাঁচটায় হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিশিবাবুরা যে ধর্ম্মশালায় আছেন সেই ধর্ম্মশালায়ই আছি।'

আজ বৈকালে ভোলানাথের পত্র পাইলাম। তিনি আমাদের হরিদ্বার যাইতে লিখিয়াছেন ; আবার লিখিয়াছেন, মার অবস্থা একরকমই চলিতেছে। শরীর রক্তশূন্য ও খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পীতাম্বর পান্থ (এটোয়ার সিভিল সার্জ্জন) ছুটী নিয়া হরিদ্বার আসিয়াছেন। তিনি মাকে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আগামী ১০ই ফাল্গুন মার কাছে রওনা হইব স্থির করিয়াছি।

১১ই ফাল্গুন, বুধবার—আজ ভোরে হরিদ্বার আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এ ধর্ম্মশালাটী ভীমগোড়ারও এক মাইল উপরে হৃষিকেশের রাস্তার ধারে। আমরা আসিয়া দেখি মা খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। হার্টই খুব খারাপ। একটু শব্দ হইলেই বুক ধড়ফড়ানি

হরিদ্বার, ঠাকুরদাস বদ্রিদাস ধর্ম্মশালায়

হয় এবং হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসে। ভোলানাথের মুখে শুনিলাম, এর মধ্যে দুইদিন অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। আজ আট নয় দিন হয় মা হরিদ্বার আসিয়াছেন। জ্বরও প্রায় দুই মাস হইয়া গেল। শুনিলাম, ঔষধ আজ কয়েক দিন যাবৎ খাইতেছেন। যেদিন হইতে ঔষধ খাইয়াছেন সেইদিন হইতেই শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এর পূর্ব্বেও জ্বর আসিত, কিন্তু মা হাঁটা চলা, কথাবার্ত্তা সবই স্বাভাবিক মতই করিয়াছেন। ডাক্তার বলেন, "মা, এমন রুগী আমি আর জীবনে পাই নাই। মা, আমার ঔষধে কিছু হইবে না। আপনার শরীরের চিকিৎসা আমি কি করিব? আপনি নিজে সুস্থ হইবার ইচ্ছা করুন, এই আমার প্রার্থনা।" মাও কথায় কথায় বলিতেছেন, "ঔষধ যখন খাইয়াছি তখন রোগীর সব লক্ষণই প্রকাশ পাওয়া চাই ত? তাই ঔষধ খাওয়ার পরই শয্যা নিতে হইয়াছে।—ইহা ত হইবেই, যাহা হইবে পূর্ণ ভাবেই হওয়া চাই ত।"

ঔষধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা'র শরীরে অস্বাভাবিক যৌগিক ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কোন কোন সময়ে দেখা গিয়াছে ভয়ানক অসুখ, কিন্তু এই রকম যৌগিক ক্রিয়া আপনা আপনি আরম্ভ হইলে অসুখ আস্তে আস্তে সারিয়া গেল। এবারও জ্বর ত্যাগ ঔষধে হইল, কি ক্রিয়াতে হইল, কে বলিবে? মা'ই জানেন। ক্রিয়া যখন হয় অস্বাভাবিক, দেখিতেও ভয় হয়। ঔষধে জ্বর বন্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু জ্বর বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই মা'র খেয়াল হইয়াছে, "জ্বর ত বন্ধ হইল, আবার হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হইবে না ত?" মনে হওয়ার কিছু পরেই হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হইয়াছে। এখন তাহাই বিশেষ ভাবে চলিতেছে।

ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে বহুদিন। তারপর আর বিবাহ করেন নাই। সন্তানাদিও নাই। হরিদ্বারে গঙ্গার উপরেই

একটা প্রকাণ্ড বাড়ী আছে, তাহাতে মাকে নিবার জন্য এক বৎসর যাবৎ ডাক্তারসাহেব অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু মা'র যাওয়া হয় নাই। শুনিলাম, এখন তিনি সেই বাড়ীটা "আনন্দময়ী সেবাশ্রম" করিয়া দিয়াছেন এবং নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। এখনও তিনি মাকে সেখানে নিতে চাহিতেছেন। ইনি পেন্সন নিয়া সম্প্রতি হরিদ্বার আসিয়াছেন।

আরও একটা কথা এই যে, মা যখন বিরাজমোহিনী দিদিকে নিয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন এটোয়াতে গিয়া কিছুদিন ছিলেন। সেই সময়তে মা'র পেটটা একদিন একটু খারাপ হওয়ায় এই ডাক্তার সাহেব মাকে ঔষধ দিবার জন্য একেবারে ঔষধ-পত্র নিয়া মার কাছে হাজির হইয়াছিলেন। মা তখন বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা এখন থাক, যদি কখনও ঔষধ খাই, তবে তোমার ঔষধই প্রথম খাইব।" ঘটনাচক্রে মার দেরাদুনে জ্বর। সেখানকার ডাক্তার সোম রক্ত পরীক্ষা করিবার পর যখন ঔষধ দেওয়ার কথা হইল তখন এই পীতাম্বর পান্থের কথা মার 'খেয়াল' হইল। আর আশ্চর্য্যের বিষয়, হঠাৎ তার পরই শুনা গেল পীতাম্বর পান্থও পেন্সন নিয়া কয়েকদিন যাবৎ হরিদ্বার আসিয়াছেন। মা তখন ভোলানাথকে বলিলেন, "চল হরিদ্বার।" হরিদ্বার আসিয়া পীতাম্বর পান্থের ঔষধই মা প্রথম খাইলেন।

মায়ের প্রথম ঔষধ সেবন

ডাক্তারসাহেব বলিতেছেন "মা, তোমার ত সাধারণ মনুষ্য-শরীর নয়, এই শরীরে কি ভাবে ঔষধ দিব, আমি ঠিক পাইতেছি না। আপনি নিজের ভিতর আরোগ্য ভাব না আনিলে আমরা কিছু করিতে পারিব না।" মা বলিলেন, "এই শরীরটা কি রকম জান? ভিতরের সব গ্রন্থিই খোলা, তাই যাহা কিছু ব্যারাম হয় পূর্ণভাবে হয়। সমস্ত

লোমকূপের গোড়া পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থিই খোলা। তাই সমস্ত শরীরে ব্যারামগুলিও সাময়িক ভাবে বেড়াইবার সুযোগ পায়। আবার ঔষধ যখন খাওয়া হইয়াছে তাহাও ঐরকম সমস্ত শরীরে ব্যাপিয়া গিয়াছে। শরীরটা ত ঔষধ খায় না। তাই শরীরটাকে ঔষধের অধীন করিয়া নিতেও সময় লাগে ত?" বাস্তবিক ভোলানাথেরও ঔষধ দিবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ তিনি ত জানেন মা'র অবস্থা। কিন্তু ঐদিকের ভক্তেরা এই জন্য ভোলানাথকে খুব অনুযোগ করিতে লাগিলেন, যে বাবাজী মা'র চিকিৎসা করিতে দিতেছেন না, তাই মা এতদিন ভুগিতেছেন। এই সব নানা কথায় বাধ্য হইয়া ভোলানাথ ঔষধ দিতে রাজী হইয়াছেন। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, ভোলানাথ নাকি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে মাকে ঔষধ দেওয়া হইতেছে, তাই পরে তিনিও ঔষধ দিবার পক্ষপাতি হইয়াছিলেন।

যাক্, মা আজও কথায় কথায় বলিলেন, "দেরাদুনে এক সাধু আসিয়া ঔষধের কথা বলায় মা নাকি বলিয়াছেন, "দেখ, তোমরা বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, তোমাদের দৃষ্টি সকলের উপর সমান থাকিবে। তোমরা জ্বরের সঙ্গে হিংসা করিতেছ কেন? জ্বরকে তাড়াইয়া দিতে চাহিতেছ কেন? তোমরা থাকিলে ত তাড়াইয়া দিই না, জ্বরকে কেন তাড়াইয়া দিব? আমাকে ত উহারা কিছু কষ্ট দিতেছে না?" বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, রোগের সময় আমরা এই ভাব রাখিতে পারি না।" এখানে নিশিবাবু, মাসীমা, রুমাদেবী, মহারতন, ভোলা (অভয়), গোদাবরী, ইত্যাদি কয়েকজন আছেন। আমাদের সঙ্গে ফয়জাবাদ হইতে মনকেশ্বর রয়নার স্ত্রী ও কন্যা আসিয়াছেন।

১২ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—আজ দেরাদুন হইতে সারদা ও লছমী আসিয়াছে। ধর্ম্মশালায় অনেকগুলি ঘরই

আমরা দখল করিয়া বসিয়াছি। মা'র জন্য সকলেরই মন খারাপ।

১৩ই ফাল্গুন, শুক্রবার—আজও মা'র অবস্থা এক রকমই আছে। কাল রাত্রিতে অনেক সময়ই আমি মা'র কাছে বসিয়াছিলাম। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় মা আমাকে বলিলেন, "ভোলানাথকে একটু ডাকিয়া নিয়া আস ত?" আমি তাহাই করিলাম; দেখিলাম, মা ভোলানাথকে কি বলিলেন। ভোলানাথ তখনই কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। পরে জানিলাম, মা ভোলানাথকে ডাক্তার পীতাম্বর বাবুর বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন।

গঙ্গার ধারে পীতাম্বর বাবুর বাড়ীতে মাকে নিবার জন্য তিনি অনেকদিন যাবতই বলিতেছেন! কিন্তু মা যান নাই। কালও তিনি মাকে এই জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছেন, 'মা চলুন ঐ বাড়ীতে, ঐ বাড়ীটা একেবারে গঙ্গার উপরে। গঙ্গার হাওয়ায় আপনার শরীরও ভাল হইবে।" তখন মা বিশেষ কিছু বলেন নাই।

ভোরে মা ডাক্তার সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁর কথায় মা রাজী হইয়াছেন। যখনই তিনি সুবিধা করিতে পারেন, মা যাইবেন। ভোরে বন্দোবস্ত হইলে মা তখনি যাইতে রাজি আছেন। কিন্তু মাকে নেওয়া একটু মুস্কিল। মা'র শরীরের যে অবস্থা মোটরে নেওয়া চলিবে না। ষ্ট্রেচারে নিতে হইবে, তা'র বন্দোবস্ত করা হয় নাই তাই ডাক্তার ভোরে মাকে নিতে পারিলেন না।

দুপুর বেলা ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, মা'র হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ। মা'র তখনকার অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও মন খারাপ হইয়া গেল। শুনিলাম, ইতিপূর্ব্বে ঔষধ দেওয়ার পর দুই তিনদিন মা'র

অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ভোলানাথ এবং অন্যান্য সকলে ভয়ানক ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর লক্ষণ সবই প্রকাশ পাইয়াছিল। মা'ও বলিলেন, "সত্যই, তখন তোদের দৃষ্টিতে যেন বাতিটী শেষ হইয়া যাওয়ার ভাবটাই হইয়াছিল। আবার হয়ত তোমাদের কি দরকার আছে. নিভিতে গিয়াও বাতি জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন শরীর শেষ হওয়ার পূর্ব্বে কি কি অবস্থা হয় সবই দেখিতেছিলাম।"

যাক্, আজও অবস্থা দেখিয়া ভোলানাথ ও আমরা সকলে ভয়ানক চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারি ঔষধ আজ দুদিন যাবত বন্ধ। ভয় নাই, কিন্তু হার্ট ভয়ানক খারাপ হইয়া পড়িল। সেজন্য যে ঔষধটী দিল তাহা একদিন বেশ ক্রিয়া করিল কিন্তু দ্বিতীয় দিন হইতে আর কোন ক্রিয়া করে না। ক্রমশঃ খারাপের দিকেই চলিল। তখন মহারতন বলিল, "মা আর ঔষধ দিয়া কাজ নাই। যখন কিছু উপকারই করে না তখন ঔষধ দিয়া ফল কি ?"

তারপর হইতেই ঔষধ বন্ধ হইল। ডাক্তারও হাতযোড় করিয়া বলিলেন, "মা আমি আর ঔষধ দিব না। আপনি নিজে নিজে আরোগ্য লাভ করুন।"

মা আজ কথাই বলিতে পারিতেছেন না। এই ভাবও প্রকাশ করিলেন যে ঔষধের বিষাক্ত ক্রিয়াটাই গিয়া হার্টকে আক্রমণ করিয়াছে। মা হাসিয়া বলিতেছেন, "ভালই ত হইয়াছে, আমি ত সকলকেই বলি, 'বাহির ছাড়িয়া অন্তরে যাইতে চেষ্টা কর।' তাই ঔষধও অন্তরকে (হার্টকে) ধরিয়াছে। এ'ত ঠিকই করিয়াছে। আবার বলি, বাহির ভিতর এক কর, তাই বাহির ভিতর এখন এক করিয়াছে"—এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিন্তু বাস্তবিক, আজ দুপুরে মা'র অবস্থা দেখিয়া আমরা ভয় পাইয়া গেলাম। মা আজ ডাক্তারকে নাড়ী দেখিতেও দিতে চাহিলেন না। বলিলেন, "ঔষধও যখন খাওয়া নাই তখন তোমরা নাড়ী দেখিয়া কি করিবে? আপন ভাবেই যাহা হইবার হইবে।"

মা যাইতে রাজী হওয়ায় সন্ধ্যার সময় ষ্ট্রেচারে করিয়া মাকে নিয়া দলবল সকলে হরনাথ ঘাটে, (পীতাম্বর বাবুর পিতার নামে এই ঘাট তৈয়ার করা হইয়াছে) ডাক্তার পান্থের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ডাক্তারের প্রকাণ্ড বাড়ী, গঙ্গার উপর। মার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ষ্ট্রেচারে করিয়া আনিতেও ভয় পাইতেছিল। কিন্তু দেখা গেল, মা অনেক ভালই আছেন।

রাত্রিতে মা কয়েকটী ঘটনার কথা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘটনা শুনিয়া আমার শরীরে রোমাঞ্চ দিল। ঘটনাগুলি এই, মা বলিতেছেন—"দেখ, চমৎকার সব দেখা যায়, যেন ঠিক 'সিনেমা'

বালিকা রূপে রোগমূর্ত্তি

একদিন এ'র মধ্যেই কি দেখিতেছি জান? একটী বালিকা মূর্ত্তি, অতি সুন্দর চেহারা (হরিদ্বারেই সব দেখিতেছেন) ঘরের মধ্যে আসিয়া আমাকে ধরিবেই। আমার কিন্তু অবস্থা তখন খুব খারাপ, মেয়েটী আমাকে ধরিবেই, তখন অপর একজন ও নিশিবাবু মেয়েটীকে বাধা দিতে গিয়া হাত ধরিতেই দেখে হাতে তাহাকে ধরা যায় না, ছায়ামূর্ত্তির মত। মেয়েটী বিদ্যুৎ চমকের মত, এই আছে এই নাই। ঘরে এদিক ওদিক করিতেছে। শেষে নিশিবাবুই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু দরজা বন্ধ করিলে কি হইবে? মেয়েটী ঘরের মধ্যেই আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক বাধা দেওয়ার পর মেয়েটী হঠাৎ আসিয়া আমার

পাটা ছুঁইয়া দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। তাহার সেই স্পর্শের অনুভব অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার পরিষ্কার ভাবে ছিল।"

আবার বলিতেছেন, "আর একদিন কি দেখিতেছি জান? এক জায়গায় এক ভাবে বসিয়া আছি, আর কেহ সঙ্গে নাই। একটা উঁচু স্থানে বসিয়া আছি। যে স্থানটায় বসিয়াছি সেই স্থানটা ঘাস ও ছোট ছোট পাথরে ভরা। তাহার মধ্যেই একটা স্থান, সেই স্থানটীর নাম "কল্যাণবন"। দেখি কি জান? যত দেবতারা নিজ নিজ বাহন নিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এই শরীরটার উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছে, সকলেরই ঐ ভাব; কত মুনি-ঋষি, সাধু-সন্ন্যাসী, অবতার, সব বেশ সুন্দর, নিজ নিজ ভাবে যাঁর যাঁর স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। আর যে সব উচ্চাবস্থার সাধকদের নাম শোনা যায়, তোদের জানিত ও অজানিত, ওখানে তাঁহাদের মূর্ত্তিও পরিষ্কার দেখিতেছি। সাধকেরা আসা যাওয়া করিতেছে। কেহ কেহ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এক এক জনের এক এক ভাব! সেই ভাব নিয়া স্তরে স্তরে আছে বিরাট সমুদ্রের মত, দেখিতে অন্ত নাই-এত সব।

'কল্যাণবন'—অখণ্ডভাবঘন মা

"সকলেই, এই শরীরটা যে একটু উপরে বসিয়া আছে তাই উর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রণাম করিতেছে। এই শরীরটা, তীব্র শুভ্র, ঘন জ্যোতির গড়া। এই উপমাও কিন্তু ঠিক হইল না। কি যে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা হইতেছে না। ঐখানকার ঐ যে আলোটা তার প্রকাশটাও অন্যরকম। সেই স্থলে যাহা কিছু নিয়া,—বাস্।" বলিয়া চুপ করিলেন।

আবার বলিতেছেন "সব নিয়াই সকলের মধ্যেই—'এই'—একথাও

ঠিক হইল না। ভাষায় বলিতে হইলেই ঠিক ঠিক বলা হয় না। বাস্তবিক যে কি, তাহা অব্যক্ত। সেইখানেই মুখ দিয়া বাহির হইল 'অখণ্ডভাবঘন'। খণ্ড বাদ দিয়া নয়, সব নিয়াই ত অখণ্ড। দেবতা, সাধুরা ও ঋষিরা এমন ভাবে ছিল যে, তাহার কিন্তু শেষ দেখা যাইতেছিল না। সমুদ্রের মত যতদূর তোদের দৃষ্টিতে চলে, শেষ দেখা যায় না। সব স্থির ভাবে এই শরীরটার কাছে। এই শরীরটা ত বিছানায় শোওয়া। কোন কোন সাধু চলাফেরা করিতেছে আর ঐ শরীরটার কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইতেছে। এবং সাধুরা মনে মনে এই শরীরটার সুস্থতা প্রার্থনা করিতেছে—এই শরীরটার কাছেই।" এই সব বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া ছেলে মানুষের মত জিজ্ঞাসার ভাবে বলিতেছেন--"এই সব কি তামাসা দেখি?" এই বলিয়া হাসিমুখে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সব কথা শুনিয়া আমার ত শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছিল। আমি মার চরণে হাত দিয়া শুধু বলিলাম, "মা, তোমাকে কিছুই জানিতে পারিলাম না, হেলায় এমন সুযোগ হারাইতেছি।" মা আবার একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ঐসব কথা বলাটা এসে গেল। তোদের কাছেই রাখিস। এসব কথা যে কত সত্য, প্রত্যক্ষ ও গভীর তা' সাধারণের বোঝা মহা মুস্কিল। এই সব নিয়া হাসি ঠাট্টা ইত্যাদি হওয়াটা ত স্বাভাবিক, কারণ তাহারা ত বুঝিবে না ও জানে না। যাহার ভিতর যতটুকু শক্তি, তিনি ত সেইরূপেই প্রকাশ আছেন কিনা? বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইটাই যে স্বাভাবিক। সর্ব্বরূপে ও ভাবে এ যে সেই।" মা আবার বলিতেছেন, "তাদের কোন দোষ নাই। যা বোঝে তাইত বলবে।

"কাল কি দেখিতেছি শোন্, ধর্ম্মশালায় ত শুইয়া আছি; তোমরা

কিন্তু ভাবিও না এ'সব ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখি। এ'শরীরের বসিয়া বা চলাফেরা অবস্থায় যেমন দেখা, বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া দেখাও ঠিক তেমনই। তুমি বসিয়া আছ, রাত্রি প্রায় ২টা। তখন দেখি এক মূর্ত্তি তোমাকে আড়াল করিয়া তোমার ও আমার মাঝখানে আসিয়া আসন করিয়া বসিল। তোমার বোধ হয় তখন জপ বন্ধ হইয়া একটু ঝিমুনীর ভাব আসিয়াছিল, (আমি সত্যিই মনে মনে জপ করিতেছিলাম এবং মধ্যে জপ বন্ধ হইয়া একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছিল। আমি কিন্তু এ'কথা মাকে বলি নাই।) তখন মূর্ত্তিটী আসিয়াই পরিষ্কার ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'জায়গা কোথায় করা হইল?' আমি অমনি চাহিলাম এবং বলিলাম, "জায়গা আবার করা কি?" আ৵ার দৃষ্টিতেই সেই মূর্ত্তিটী কেমন হইয়া গেল এবং দৌড়িয়া চলিয়া গেল।

ডাক্তার পান্থের সেবাশ্রমে গমনের ঘটনা (মায়ের দর্শন)

"সেই সময় হইতেই আমার খেয়াল হইল, পীতাম্বর ডাক্তার ত তাঁহার সেবাশ্রমে থাকিবার জন্য কত বলিয়া গেল, গঙ্গার হাওয়ায় ভাল হইবে বলিয়া গেল। তাহার ব্যবস্থা মতন কয়েকদিন যখন চলিলাম, এই কথাই বা শুনিব না কেন? তাহাদের উপরই ত শরীরের ভার দেওয়া হইয়াছিল, এইরূপ একটা ভাব জাগিল। বোধ হয় দরকার, তাই এইসব হইয়া যাইতেছে। তারপর রাত্রি শেষে তোমাকে জিজ্ঞাসা হকরিলাম, কয়টা বাজিয়াছে? তুমি বলিলে, ৫।।০ টা বাজিয়াছে। তখনই ভোলানাথকে ডাকিয়া ডাক্তারের নিকট পাঠাইলাম যে, যদি সম্ভব হয়, আমাকে এখনি তাহার সেবাশ্রমে নিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে ষ্ট্রেচারের বন্দোবস্ত না থাকায় সে তখন নিতে পারিতেছে না বলিয়া দিল। আমার একটা কি ভাব জাগিল জান? 'জায়গা কোথায়

হইয়াছে'—মূর্ত্তিটী আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল, আমি তাহা খেয়াল করিয়াই এই ভাব জাগিল, তাহাকে বলিলাম, "এই ধর্ম্মশালার যে স্থানটীতে আমি ছিলাম তাহা তোমার জন্য রাখিয়া আমি চলিলাম।" এর পরই সেই স্থান ত্যাগের ভাব আসিল। ভোরেই ভোলানাথকে ডাকিয়া ডাক্তারের কাছে পাঠাইলাম।" এই ঘটনা শুনিয়া আমি আবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলাম। মার শরীরের অবস্থা যখন খুবই খারাপ, তখন এই ঘটনা হয়।

আমি আবার হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "মা তোমার ইচ্ছা না হইলে, তোমার শরীর কে রক্ষা করিতে পারে? আমাদের জন্য যে তুমি এ'ভাবে শরীরটা রক্ষা করিয়াছ ইহাতে আমাদের প্রতি তোমার অপার করুণাই প্রকাশ করিয়াছ। আমাদের ত মা, করিবার কোন ক্ষমতাই নাই। শুধু তোমার চরণে প্রার্থনা, তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া, শরীরটা এই ভাবে রক্ষা করিও।" মা বলিলেন, "হয়ত তোমাদের দরকার, তাই এ'সব হইয়া যাইতেছে।" অনেক সময় দেখিয়াছি মা অনেককে বলেন, "তোমার জন্যই বোধ হয় শরীরটা রহিল, এই যে তোমার সঙ্গে দেখা হইল।"

সপ্তম অধ্যায়

১৪ই ফাল্গুন, শনিবার—আজ বিশেষ কোন ঘটনা নাই। মা'র হার্টের জন্যই আমরা একটু চিন্তিত। মা শয্যাগতই আছেন। ডাক্তার ও অন্যান্য সকলেই বলিতেছেন, "মা, আমরা ত কিছু করিতে পারিব না, এ'বার তোমার ব্যবস্থা মা তুমিই কর।" মা মধ্যে মধ্যে ডাক্তারকে ডাকিয়া, "কি খাইব, কতটুকু খাইব"—এইসব জিজ্ঞাসা করেন, আবার নিজেও মধ্যে মধ্যে বলেন। দুপুর বেলা ৩।৪ ঘণ্টা মা'র বিশ্রামের জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মা'র ত এক একদিন শুইবার ভাবই থাকে না। আবার ডাক্তারের কথায় চুপ করিয়া শুইয়া আছেন, হয়ত একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। শরীরটা কেমন হইয়া যাইতে থাকে। এই সব অবস্থা চলিতেছে।

প্রথমদিন ডাক্তার মাকে ধর্ম্মশালা হইতে আনিবার সময় বলিয়াছিলেন, "মা এখন রোগটাকে এখানে ফেলিয়া সেবাশ্রমে চলুন। আজ সেখানে গিয়া কীর্ত্তন করিব।" এ'দিকে কিন্তু ঘরে একটু শব্দও করা হয় না; কেহ একটু জোরে হাঁটিলেও হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হয়। আর সেইদিন ৩।৪ মাইল পথ ষ্ট্রেচারে আসা, রাস্তায় এত গোলমালের মধ্য দিয়া আসা হইল। তারপর আসিয়া নানা গোলমালে যখন মা দেখিলেন, কীর্ত্তন করিবে বলিয়াছিল, কিন্তু করিল না; তখন মা আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—'কথা রক্ষার জন্য অন্ততঃ কিছু সময় কীর্ত্তন করা দরকার।' ডাক্তারের

সেবাশ্রমে কীর্ত্তন

ইচ্ছানুসারে মায়ের ঘরেই ভোলানাথ সকলকে নিয়া কিছুসময় কীর্ত্তন করিলেন। মা ইহাতে অনেকটা ভালই আছেন।

আজ আরও একটি ঘটনা শুনিলাম, এর পূর্ব্বে একদিন মার অবস্থা যখন একটু খারাপ হয় তখন কতকগুলি ক্রিয়া আপনা হইতেই মার শরীরে হইয়া যাইতে লাগিল। তারপর হইতে জ্বরটা ছাড়িয়া গেল; মা সেই কথায় বলিতেছেন, "যদি আপনা হইতেই এ'সব হয় তবে তাহার ফলও হয়। কিন্তু সব সময় হয় না। যখন যাহা দরকার, তাহা হইয়া যাইতেছে।" অনেকেই মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। 'কুম্ভ-স্নান' উপলক্ষে বহু লোক হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

১৫ই ফাল্গুন, রবিবার—কতদিন যাবৎ মার কাপড় ছাড়ান হইতেছে না। বিছানার চাদরও পরিবর্ত্তন করা হইতেছে না। কারণ মাকে নাড়াচাড়া করা যাইতেছে না। আজ মাকে কাপড় ছাড়ার কথা বলায় মা বলিতেছেন, "না, এখন ছাড়িব না। যখন দাঁড়াইয়া কাপড় ছাড়িতে পারিব তখন ছাড়িব সে জন্য চিন্তা কি? আমি ত এক কাপড় পরিয়া কতদিন কাটাইয়াছি।" বিছানাও তখনই পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন বলিলেন। এখনও উঠিয়া বসিতে পারেন না। কবে উঠিয়া দাঁড়াইবেন, তখন কাপড় ছাড়িবেন। একবার এই কথা বলিলেন, "কাল ত ভালমত হউক তারপর দেখা যাইবে।"

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার—আজ সকালে মাকে মুখ ধোয়াইয়া পথ্য দিবার কিছু পরে মা ডাক্তারকে বলিলেন, 'আজ উঠাইয়া দাঁড় করাও দেখি।' তাই হইল, মাকে ধরিয়া আজ দাঁড় করান হইল। দাঁড়াইয়া মা কাপড় ছাড়িলেন। কিছু সময় বসিয়াও কাটাইলেন। আজ সামান্য ভাত পথ্য দেওয়া হইল।

আজ শ্রীশ্রীশিবরাত্রি, সাধুরা দলে দলে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানে চলিয়াছে। বাজনা ও সকলের মুখনির্গত স্তোত্রাদিতে হরিদ্বার নগরী মুখরিত। ১২ বৎসর পর কুম্ভ স্নানের জন্য বহু লোক হরিদ্বারে একত্রিত হইয়াছেন। সাধুদের মেলাই দেখিবার জিনিষ—নাগা সন্ন্যাসীরা একদলে চলিয়াছেন, সন্ন্যাসিনীরা একদলে চলিয়াছেন, আবার সাধুদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতনামা তাঁহারা হাতীর পিঠে চলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের দল চলিয়াছে। কখনও কখনও সাধুদের সঙ্গে লাঠি খেলিতে খেলিতে তাঁহাদের শিষ্যরা চলিয়াছে। আজ ভোলানাথ সকলকে নিয়া সন্ধ্যাবেলায় একটু নাম করিলেন।

১৭ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার—আজ মা অপরের সাহায্যে একটু হাঁটিয়া বারান্দায় গিয়া বসিলেন। আজ অনেকক্ষণ বসিলেন। অবশ্য শরীরের অবস্থা দেখিয়া মা বসিতে পারিবেন বলিয়া কাহারও ভরসা হয় না

এ'বার সারদা আসিয়াছে। শুনিলাম, সারদারও কিছুদিন যাবৎ কেমন সুন্দর একটা আবিষ্টের মত অবস্থা হয়। মা এ'বার দেরাদুন আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তাহার এই অবস্থা আরম্ভ হইল।

সারদার সুন্দর অবস্থার কথা

সে যে চেষ্টা করিয়া কিছু করে তাহা নয়। সে পূজা জপাদিতে বসিতেও বেশী সময় পায় না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহার এমন অবস্থা হয় যে একটু বসিলেই কেমন হইয়া যায়। সে যে নিজে ইচ্ছা করিয়া গিয়া বসে তাহাও নয়, বসিতে বাধ্য হয়। ভিতরে এমনি একটা ভাব চলিতেছে। একদিন নাকি মাকে স্পর্শ করিতেই ঐরূপ অবস্থা হইয়া পড়ে। বাহিরের কাজে কর্ম্মে থাকিলে এই আবিষ্টের ভাবটা একটু কম থাকে। কিন্তু একটু স্থির ভাবে বসিলেই বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইয়া যায়।

শিবরাত্রির দিন, অর্থাৎ গত কল্যই, স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে মা কন্‌খলে, মঙ্গলানন্দ গিরির আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছেন, বলিলেন, "তুমি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীদের দলে একত্র হইয়া এই স্নানাদিতে গিয়া যোগ দাও।" মায়ের আদেশে তিনি তথায় চলিয়া গিয়াছেন।

একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মায়ের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, কেহ একটু জোরে কথা বলিলে, বা ঐ ঘরে হাঁটলেও বুকে লাগিত; বুক ধড়ফড় আরম্ভ হইত। এমন কি চোখ খুলিতেও এক এক সময় বুকে লাগে। এই অবস্থায় ষ্ট্রেচারে করিয়া তিন চার মাইল রাস্তার গোলমালের ভিতর দিয়া নিয়া আসা হইল; মা'র অবস্থা একই প্রকার ছিল, আসিবার সময় বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন বুঝিলেন না, বরং ভালই ছিলেন বলিলেন। তারপর গত পরশু মা বলিলেন ধরিয়া বসাইতে তাই করা হইল, একটু পরেই শুইয়া পড়িলেন। কালই সকালে উঠাইয়া দাঁড় করাইতে বলিলেন। কয়েক মিনিট ছিলেন, পরে বৈকালেই প্রায় ২॥ ঘণ্টা নিজেই বসিয়া রহিলেন। আজই কয়েক পা হাঁটিয়া গিয়া বারান্দায় বসিলেন এবং প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসিয়া রহিলেন। তারপর সারাদিনই অনেকবার উঠিয়া বসিয়াছেন। নিজেই বলেন, "শ্বাস এখনও ঊর্দ্ধদিকেই, নীচে নামান যায় না। ইহার কারণ হইল কি, জান? শ্বাসের গতি এ রকমই হইয়া গিয়াছিল। ঐ অবস্থায় গেলে সাধারণ মানুষ আর বাঁচে না। তাই শ্বাসের গতি এখনও উপর দিকেই চলিতেছে।"

শ্রদ্ধেয় নিশিকান্ত মিত্র মহাশয়ের নিকট শুনিলাম, ঔষধ খাইবার পরে পালার জ্বর একদিন হইয়াছিল। দ্বিতীয় পালার দিনই আর জ্বর হয় নাই। সেই দিন আপনা হইতেই মা'র শরীরে কতগুলি ক্রিয়া হইয়া গিয়াছিল। নিশিবাবু বলিলেন মায়ের ক্রিয়ার অবস্থাগুলি

দেখিতে দেখিতেই আমার মনে হইতেছিল, এবার জ্বরকে মা বিদায় দিতেছেন।

ডাক্তারবাবু মা'র একটু বিশ্রামের জন্য বারটার পর মা'র ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেন, চারটার পর খোলা হয়। আজও তাহাই করা হইল। অনেকেই দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা কখনও শুইয়া, কখনও বসিয়া, সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। রাত্রিতে দশটায় আলো বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

মা শুইলেন, আমি নিকটে বসিয়া আছি। ঘর অন্ধকার। মা হঠাৎ শিশুর ভাবে হাসিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "খুকুনি, সেদিন যে তোমাকে কৃষ্ণ, রাম ও অন্যান্য সব দেবতা এবং ঋষিদের দেখার কথা বলিয়াছিলাম, প্রমাণ করিয়াছে, এ'কথা কি আমি বলিয়া ফেলিয়াছি?" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "কি বলিয়াছ?" মা হাসিয়া হাসিয়া ঐ ভাবেই বলিতেছেন, "আমি উপরে এক যায়গায় বসিয়াছিলাম আমি।" বলিলাম, 'তারপর উপর দিকে এই শরীরটাকে লক্ষ্য করিয়া হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিতেছিল—এ'কথা বল নাই কি?" মা'ও একটু হাসিয়া বলিলেন, "শরীরটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি?"এই বলিয়াই শিশুর মত সরল ভাবেই নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন,—"কি জানি বাপু, আমি কখন কি বলি, তোমরা আবার সব মনে করিয়া রাখ। যাক্, যাহা দেখা তাই বলিয়া ফেলিয়াছি। যাকে দেখা তারই বলা, আবার তারই শোনা।" এই বলিয়াই বলিতেছেন, "দেখ, তোমরা যে এসব কথা বল, কেহ কেহ ইহা শুনিয়া কি ভাবিবে জান? বলিবে মা'র দুই দিন অন্তর জ্বর আসিত সেই জ্বরে মার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই এ'সব দেখিয়াছিলেন।" এই বলিয়া মা'র স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া মা'র এই অপরূপ ভাব ও

মধুর হাসিটুকু দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলাম! আমার মনে হইতেছিল মা'র ভাবের আর শেষ নাই, তাহাও যেন অনন্ত, অপার। সবই যেন সুন্দর ও মধুর।

আবার বলিতেছেন, "কি রকম দেখি জান? যেমন তোমাদের দেখি, ব্যবহারিক জগতে, জীবন্ত, প্রত্যক্ষ, তেমনই আর কি?" এই বলিয়াই মা চুপ করিলেন। আবার আপন ভাবে বলিতে লাগিলেন, "তুমিই তোমাকে দেখ, তুমিই তোমার কথা কও, তোমাকেই নিন্দ, বাদও তুমিই তোমাকে। আমি বললেও যা, তুমি বললেও তা।"

১৮ই ফাল্গুন, বুধবার—আজ সকালে একটু পথ্য করিবার পর মা গিয়া গঙ্গার উপর ছোট বারান্দায় বসিলেন। সকালে নিজেই একটু পায়চারী করিলেন। দুপুর বেলায়ও খাওয়ার পর মা নিজে নিজে একটু হাঁটলেন। তারপর ১২ টায় মাকে শোয়াইয়া রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। খণ্ড, অখণ্ডের কথায় মা বলিতেছিলেন, "দেখ, খণ্ড ছাড়িয়া অখণ্ড হইতে পারে না, খণ্ড ও অখণ্ডের মধ্যেই। আবার এই যে খণ্ড, অখণ্ড, বলিতেছি, ইহাও ভাষা মাত্র, শুধু বুঝাইবার জন্য। ঐ সব প্রশ্ন সেই জায়গায় ওঠেই না।"

বৈকাল ৪টার পর মা একটু বসিলেন। সেই সময়ে সকলেই মাকে দর্শন করিতে আসিলেন। মা সকলের সঙ্গে অল্প অল্প কথা বলিতেছিলেন। সন্ধ্যার পর মাকে আবার শোয়াইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অনেকেই মা'র কাছে বসিয়া রহিলেন। তারপর ডাক্তারের কথায় প্রতিদিনের মত সকলে উঠিয়া গেলেন। বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল। মাকে বিশ্রাম দিবার জন্যই ডাক্তার বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত মায়ের দরজা বন্ধ রাখেন। আবার রাত্রি ১০টার পর মাকে একান্তে রাখা হয়। কয়দিন যাবৎ এই নিয়মই চলিতেছে।

১৯শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—আজ বেলা প্রায় ৭টায় মা চোখ খুলিতেই মুখ ধোয়াইয়া দিলাম। পরে একটু পথ্য দেওয়া হইল। মা শুইয়া শুইয়া উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। বৈজনাথ হইতে তারানন্দ স্বামী হরিদ্বার আসিয়াছেন, তিনি আসিয়া মার কাছে কিছু সময় বসিয়া আলাপ করিলেন। আরও পরিচিত সাধুরা অনেকেই মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছেন। বেলা এগারটায় মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়, আজ রুটী ও তরকারী দেওয়া হইয়াছে। খাওয়ার পর কিছু সময় বসিলেন। হরিরাম আসিয়াছে। আজও খাওয়ার পর বেলা বারটায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আজও মা ঘরের ভিতরই একটু হাঁটিলেন। তারপর শুইয়া পড়িলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বামী আজই বিন্ধ্যাচলের আশ্রমের কার্য্যোপলক্ষে মীর্জ্জাপুর যাইতেছেন। মহারতনও বেরিলী চলিয়া গেলেন। বৈকালে চারটার সময় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল।

মাকে একটু পথ্য দিয়া ছোট একটী ইজিচেয়ারে বসাইয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার, একজন সন্ন্যাসী এবং আমরা আরও চার পাঁচ জন মার চারিদিকে বসিয়া আছি। গঙ্গার ধারের জানালা দরজা সব খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসন ইত্যাদির কথা উঠিল। মা অভয়কে (ভোলাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আসন কর ত।" অভয় বলিল, 'না মা, এখন আর কোন আসনই করি না।' মা বলিলেন, "কেন?" এই কথায়ই আসনের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "ভাব অনুযায়ী আসন হইয়া যায়। এক এক আসনে এক একটা ভাব প্রবল হয়। যেমন খাইবার সময় একরকম আসন হয়, ঘুমাইবার সময় শুইয়া থাকা হয়, তাহাও আসন। আবার বিষয়চিন্তা করিবার সময় শরীরের এক প্রকার ক্রিয়া বা আসন হয়।

মনের গতি অনুযায়ী আসন ও প্রাণায়াম স্বভাবতঃই হইয়া যায়

শ্বাসের গতিও ভিন্ন রকম হইয়া যায়, দেখিলেই বোঝা যায়, বিষয় চিন্তায় মগ্ন। সেই ভাবে বসিলে তাহার বিষয় চিন্তার স্থবিধা হয় তাই বসিবার নমুনা ঐরূপই হইয়া গিয়াছে। এই রকম আধ্যাত্মিক চিন্তার সময়ও আপনা আপনিই আসন হইয়া যায়। কুম্ভক, রেচক, পুরকও আপনা আপনিই হইয়া যায়। এই ভাবে যখন আসনাদি আপনা আপনি হইয়া যায়, তখনই বুঝিতে হইবে গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেছে।" তারপর অন্যান্য কথা উঠিল।

কথায় কথায় ডাক্তারসাহেব বলিলেন, "একজন সাহেব লিখিয়াছেন, শুদ্ধ ভাবে একান্তে বসিয়া যদি "আমি কে ?" এই চিন্তা কিছু সময় করা যায়, তবে আপনা আপনিই তাহার জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। আমি ত আজ দু'মাস যাবৎ এই চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুই ত বুঝিতেছি না।" মা বলিলেন, "সকলের জন্য ত এক ব্যবস্থা নয়।" ডাক্তার সাহেব আরও বলিলেন, 'এটোয়াতে মা একবার কথায় কথায় আমাকে নাম করিতে বলিয়াছিলেন।' *

নাম করিতে বসিয়া ডাক্তার পান্থের বিচিত্র দর্শন

আশ্চর্য্যের বিষয় যেইদিন প্রথম 'রাম রাম' করিতে বসি, সেইদিনই দেখিতেছি যেমন এখানে আটার গুলি করিয়া মাছকে খাইবার জন্য ছুড়িয়া ছুড়িয়া দেওয়া হয়, আমিও যেন তেমনি নাম ফেলিতেছি, আর, একটা হংস তাহা খাইতেছে। পরে আমি ভাবিলাম, এই সব কি দেখিলাম ? হয়ত শুদ্ধভাবে বসা হয় নাই তাই এসব দেখিয়াছি। তারপর দিনই আমি স্নান করিয়া একটা গাছের তলায় পাথরের চৌকির উপর বসিয়া 'রাম রাম' করিতেছি। সেইদিন দেখি একটা জ্যোতির মধ্যে উজ্জ্বল

* মা যেমন সকলকে বলেন, তাঁর নাম কর বা রাম রাম কর, হরি হরি বল যা ভাল লাগে, মা কাহাকেও বিশেষ কোন নাম করিতে নিজে বলেন না।

অক্ষর "র" লেখা রহিয়াছে কিন্তু "ম" অক্ষরটী আর দেখিতে পাইলাম না। তাই চোখ বুজিয়াই মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া "ম" অক্ষরটী দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। ঐ ধ্যানটী ভাঙ্গিয়া গেল। মা'র কথায় কাজ করিতে বসিয়াই এই ভাবে দর্শন হইয়াছিল।"

এইসব কথা বার্ত্তার পর মা আবার গিয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন ঘরে আমি, ভ্রমর, বেলু ও একটী মেয়ে বিলাস, মার কাছে বসিয়া আছি। মা ডাক্তারের "র" দর্শনের কথায় বলিতেছেন, "দেখ, একবার একজন লোক শুনিয়াছিল, এই ভাবে একলক্ষ জপ করিলে এতদিনের মধ্যে এইরকম অনুভব হইবেই। এই কথা শুনিয়া, সে কাজে বসিল তার কি হইল জান? সে জপ করে, আর একটা টিকটিকির শব্দ পাইলে তাহার মনে হয় এই বুঝি আমার অনুভব হইতে আরম্ভ হইল। এই ভাবে তাহার লক্ষ জপ পূর্ণ হইল। কিন্তু কিছুই অনুভব হইলনা। কারণ হইল, তাহার মন শুধু চারিদিকে শব্দের মধ্যেই ছিল। আর, এই বুঝি অনুভব হইল এই চিন্তায়ই সে ব্যস্ত ছিল, তাই ফল হইলনা। তাই বলা হয়, পথ চলিয়া যাও, ফলের দিকে চাহিও না। রাস্তায় দাঁড়াইয়া ফলের হিসাব করিতে গেলেই সেই সময়টুকুই পিছাইয়া গেলে। একলক্ষ্য ধরিয়া চলিয়া যাও।" রাত্রি দশটায় বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল।

এক লক্ষ্যে চল, হিসাব করিওনা

২০শে ফাল্গুন শুক্রবার--আজও মা প্রায় ৭৷৷০ টায় উঠিয়া বসিলেন। প্রতিদিনের মতই মা'র পথ্যাদি দেওয়া হইল। আজ বৈদ্যনাথের তারানন্দ স্বামীকে আমাদের এখানে ভিক্ষা নিতে বলা হইয়াছিল, তিনি ভিক্ষা নিলেন। ইনি শ্রীশ্রীতারা মায়ের উপাসক। আজও বেলা ১২টায় মায়ের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মা'ও ঐ সময়টা একেবারে চুপ করিয়াই থাকেন, বলেন, "যখন যাহা করা,

ঠিকমতই করা দরকার।" কেহ কথা বলিয়া ফেলিলেও মা শব্দ করেন না, চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে বলা হইয়াছে, শিশুর মত তাহাই পূর্ণ ভাবে কতকটা সময় করিয়া যাইতেছেন। আবার সবই হয়ত উল্‌টিয়া যাইবে।

বৈকালে ৪টার সময় দরজা খুলিল। ভক্তেরা মা'র জন্য একটু খাবার তৈয়ার করিয়া নিজেই তাহা মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। খাওয়ার পর ২।১ জন করিয়া লোক মাকে দর্শন করিতে আসিতে লাগিলেন। সোলনের রাজমাতা এখানে কিছুদিন যাবৎ আসিয়াছেন, তিনিও মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। তিনি ভ্রমরের কীর্ত্তন শুনিতে চাহিলেন। ভ্রমর কীর্ত্তন করিতে লাগিল। তাহাতে সকলেই যোগ দিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন চলিল।

কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বেই তারানন্দ স্বামী, তাঁর শিষ্য এক ব্রহ্মচারীকে নিয়া আসিলেন। মা এই ব্রহ্মচারীকে বৈদ্যনাথ দেখিয়াছেন। ব্রহ্মচারিটী পাঞ্জাবী যুবক। চেহারার মধ্যে সাধনের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাকে খুব শ্রদ্ধা করেন দেখিলাম। লেংটী পরা, গায়ে একটা পাট বস্ত্রের (চট রং করা) আলখাল্লা, সুন্দর দেখাইতেছিল। মা ইহার গুরুভক্তির কথা অনেক বলিলেন, "এমন গুরুভক্তি, গুরু সেবায় তৎপর, বড় দেখা যায় না।" শুনিলাম, কয়েক বৎসর অনুষ্ঠানাদি করিয়া এখন আপন ভাবেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। গুরু, অবস্থা দেখিয়া বাহির হইবার অনুমতি দিয়াছেন। ব্রহ্মচারী যুবকের চেহারা দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। বিশেষতঃ মায়ের মুখে তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া আরও মুগ্ধ হইলাম। কিছু সময় থাকিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পরে সকলেই চলিয়া গেল।

ডাক্তার সাহেব ও আমরা মার কাছে বসিয়া আছি। মায়ের হার্ট

এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। কথায় কথায় মা আমাকে বলিলেন, "দেখ, একবার একটী লোক আমাকে বলিয়াছিল—'মা আপনাকে উচ্চ দেখিয়া যদি কাহারও হিংসা হয় ইহাতে ত তাহার ক্ষতি হইল। আমি বলিলাম, "এর মধ্যেও একটা দিক ভাল আছে। এই হিংসার ভাবটাও তাহাকে ভালর দিকেই নিয়া যাইতে পারে; যেমন, তাহার এই ভাব আসিতে পারে, আমিও ভাল হইব; তবেই ঐ হিংস্র প্রবৃত্তিটা হইতে আরম্ভ হইলেও পরিণামে অনেকের ঐ ভাবে মঙ্গল হইয়া থাকে। তাই ত বলি সবটার মধ্যেই মঙ্গল আছে। আর এই শরীর ত কাহারও ক্ষতি করে না।" রাত্রিতে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রি ১০টায় বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল।

মাকে দেখিয়া কাহারও হিংসা হইলেও তাহাতে কল্যাণই হইবে

২১শে ফাল্গুন, শনিবার—মা কয়েকদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, "সকাল সন্ধ্যায় তোমরা নাম করিয়া দেখ ত হার্টটা একটু ভাল হয় কিনা।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সকলকে নাম করিবার জন্যই মা'র এই কথা। কিন্তু নিয়ম মত দুই বেলা নাম করার সুযোগ হইয়া ওঠে না। আজ ভোরে ভ্রমর আসিয়া নাম করিতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নাম করিতে লাগিলাম। মা বিছানার উপর বসিয়া শুনিতেছেন। বেলা প্রায় ৮৷৷০টা অবধি নাম চলিল। মা'র পথ্য দিবার দেরী হইল বলিয়া আমি বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম দেখিয়া, মা বলিলেন, "পথ্য পরে হইবে। এখন নাম করিতে বস।" তাই হইল; আজ অনেক বেলায় মার পথ্যাদি দিলাম। অবশ্য বেশ বুঝিলাম, বাহিরের খাদ্যাদি হইতে নামে মা'র শরীর বেশ ভাল থাকে। ইহার প্রমাণ কত পাইয়াছি, তবুও আমরা বুঝি না।

দুপুরে খাওয়ার পর, মার দরজা বন্ধ হইল। আজ বৈকালে দরজা খোলার পর অনেকে মার দর্শনের জন্য আসিলেন। সন্ধ্যার সময় কীর্ত্তন হইল। যোগেশ দাদা দেরাদুন হইতে আসিয়াছেন, তিনিও কিছু সময় নাম করিলেন। অভয় (ভোলা) খুব সুন্দর গান করে! ছেলেমানুষ, তার গানে চিত্ত আকর্ষণ করে। সেও হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' ইত্যাদি নাম করিল। ভ্রমর ও আমরা সকলেই যোগ দিলাম; ভোলানাথ ও নাম করিলেন।

কীর্ত্তনাদির পর, আবার সেই কথা উঠিল একটী লোক যে মাকে বলিয়াছিল, 'মা আপনাকে দেখিয়া ত কাহারও কাহারও হিংসা হয়, তাহাতে ত তাহার ক্ষতিই হয়।" সেই কথায় মা বলিতেছেন, "এই হিংসার ভাব হইতেও নিজে ভাল হইবার ইচ্ছা জাগিতে পারে। আবার, যে কোন প্রকারেই হউক, সত্য জিনিষ যদি হয়, তাহার চিন্তায় সত্য ভাব ফুটবেই। তবুও ত শরীরটা একটা সেবায় লাগিল এই শরীর ত কাহারও অপকার করে না।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। আজ ভ্রমর কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। ভোলানাথের ভাই রেভীরেও কামিনী বাবুর অসুখের খবর পাইয়া ভোলানাথও আজ কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রি দশটায় তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর মার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

সত্য জিনিষের চিন্তায় সত্য ভাবই ফুটে

২২শে ফাল্গুন, রবিবার—আজ সকালে উঠিয়া মা বাহিরে পায়খানায় চলিলেন। হাতমুখ ধোয়ার পর ডাক্তার আসিলে মা বলিলেন, "বাবা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, আজ আমি বাহিরেই পায়খানায় গিয়াছিলাম।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন ডাক্তার হাত যোড় করিয়া বলিলেন, "মা, আপনার ইচ্ছা হইলে আপনি সবই

পারেন। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই।" মা এইভাবে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান দেন। পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছে ডাক্তার সাহেব মা'র বিশ্রামের জন্য দরজা ৪ ঘণ্টা বন্ধ করিয়া দেন—মা'ও সেই সময়টা কাহারও সঙ্গেই কথা বলেন না, চুপ করিয়া শুইয়াই থাকেন। কোন জাগতিক ব্যবহারেও মা'র ক্রটী হয় না। তাই, সংসারী কি সন্ন্যাসী, স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই মা এত প্রিয়। সন্ন্যাসীরা ২।৪ জন রোজই আসেন, মাকে খুব শ্রদ্ধা করেন।

আজও সকালে কীর্ত্তন করা হইল। দুপুরে দেরাদুন হইতে এতদ্দেশীয় দুই জন ভদ্রলোক (মার পূর্ব্বপরিচিত) ফল, ফুল নিয়া আসিয়াছেন। বলিতেছেন, "মা আপনার অসুস্থতার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম।" মা যে সকলেরই অতি প্রিয়। ভদ্রলোক দু'টী আসিবার পরই দু'টী সাধুও আসিয়া মা'র কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ১১॥ টায় মা'র ভোগের বন্দোবস্ত হইল। সকলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলেন। ডাক্তার সাহেব রোজই কাছে দাঁড়াইয়া মা'র খাওয়া দেখেন। আজও দেখিলেন। খাওয়ার পর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

আজ প্রাতে মা কথায় কথায় বলিতেছেন, "সব সময় ত সব কথা বলার খেয়াল হয় না, সে দিন যে, 'কল্যাণবনে' রাম ও কৃষ্ণ ইত্যাদি মূর্ত্তি দেখার কথাটা বলিয়াছিলাম না? আবার কথাটা হইল কি জান—

'কল্যাণ বনের কথা'

"অখণ্ডভাবঘন"। এক একটি ভাবেরই ঐ সব মূর্ত্তি। যেমন, আকর্ষন কৃষ্ণ, রম্যরস রাম বলে থাক, সেইরূপ এই অখণ্ড ভাব হইতেই অনন্ত ভাব, বাহিরে ভিতরে ঐরূপ অনন্ত মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ—নিত্য বিরাজিত। তাই বলি সেই সব মূর্ত্তিরও ত শেষ নাই। সমুদ্রের মত অপার ও অনন্ত। এই

সব কথা কে যে বলিতেছে, কে শুনিতেছে!" এই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতেছেন—সবই এই যে প্রকাশ।" এই বলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই সব দেখা হয়, বলা হয় কেন?" শুনিয়াই বা তোমাদের লাভ কি! কত কি সব হয়।" আমি বলিলাম, "মা, অখণ্ড ভাবটা যে কি, তাহারই একটু আভাস বোধ হয় দিতেছ, ভাষায় ত তাহা প্রকাশ করা যাইবে না। তবুও আমাদের একটু বুঝাইবার জন্যই বোধ হয় তুমি এ'সব ভাবের, মূর্ত্তির কথা সব বলিতেছ।" মা বলিলেন, "কি জানি কেন, তোমরা এ'সব মুখ হইতে বাহির করিতেছ! এ'সব কখনও বাহিরে কাহারও নিকট হইতে শুনিও নাই। যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই তোমরা একটু একটু বাহির করিয়া নিতেছ। তোমরাও যে বল সিনেমা, ভাব সিনেমাই, কি আর করিব। যা হইয়া যায়।" বলিয়া গম্ভীর ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন।

এ'কথার পরই কথা উঠিল, "ব্যারামগুলি এতদিন ধরিয়া শরীরে বসিয়া আছে, তাড়াইয়া দেও না কেন?" দিল্লী হইতে বীরেন মাকে দেখিতে আসিয়াছে, সেই উপরোক্ত কথাটা বলিল। মা বলিলেন, "দেখ আমার পক্ষে সকলই যেন এই শরীরেরই বলিয়া খেয়াল হয়। তোমরা বল, আর রোগ শোকই বল, সবই যেন শরীরের মধ্যেই। হাত, পা আর কি। কাজেই তাড়াইয়া দিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না! হাত তাড়াইয়া দাও, পা তাড়াইয়া দাও, মাথা তাড়াইয়া দাও, ইহা বল কি? এই সব ছাড়া যেমন শরীর থাকে না, থাকিতে পারে না সেই রকমই আর কি! আর সংসারী লোক, তোমাদের বলি, তোমাদের কাছে যখন রোগ, শোকগুলি আসিবে, তোমরা মনে করিও—'অতিথি'। অতিথি মনে করিয়া একটু যত্ন করিও, সহ্য করিও,

রোগ অতিথিকেও সহ্য করিও—
সেবা করিও

তদ্রূপে দেখিও। সর্ব্বশক্তিই যে তাঁর শক্তি। যেমন অতিথি বাড়ী আসিলে কাজ কর্ম্ম বেশী পড়ে. আরও হয়ত কত প্রকার অসুবিধা তবুও গৃহস্থের কর্ত্তব্য আনন্দিত মনে অতিথির সেবা করা। সেইরূপ তোমরা রোগ অতিথিকেও শান্তভাবে সহ্য করিয়া যাইও।" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই মা'র এই ভাবের এই কথায় মুগ্ধ হইল। কোন অবস্থায় উপনীত হইলে যে স্বাভাবিক ভাবে এই সব কথা বাহির হয়, আমাদের ধারণারও অতীত।

কথায় কথায় আমি বলিলাম, "মা, তোমার অবস্থার কথা ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই ভুল হইয়া যায়। যেমন কোন কোন স্থানে তোমার 'ইচ্ছা'র' কথা উঠে তোমার ত কোন ইচ্ছাই নাই, সংকল্পই নাই!" মা বলিলেন, "ইচ্ছা বা সংকল্প নাই, এ'কথাও বলা চলে না। কি আছে, কি নাই– বাস্।" এই বলিয়াই এই কথা শেষ করিলেন। বুঝিলাম, ভাষায় যাহাই বলিব তাহাই ভুল হইবে। এ'সব ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে যাহা দেখিয়াছি বা মা'র মুখে শুনিয়া যেটুকু বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বেও লিখিয়াছি।

মায়ের "ইচ্ছা"—

মা বলেন, "হয়ত দেখিতেছি এ'শরীরটা উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিলাম, "আমি চলিলাম" এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যাওয়ার কোন ভাবই আসে নাই। কোথায় যাইব, তাহাও হয়ত ঠিক নাই। এই রকম করিয়া হাতে খাওয়া বন্ধ হইল।' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলিয়াই মা অনেক সময় কথা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই—"বাস্" শব্দটী করিয়া শেষ করেন। মা বলেন, "যে ভাবেই বলিব, তাহাই ভুল হইবে। ভাষায় যত কথা বলা চলে না।"

আজও দুপুরে মা শুইলেন। চট্টগ্রাম হইতে "দাসু" নামে একটী ষোল সতের বৎসরের ছেলে মার কাছে আসিয়াছে তাহাকে ঘরে রাখিতে

না পারিয়া তাহার মা ছেলেকে মা'র হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। চট্টগ্রামেই "দাসু" মাকে প্রথম দর্শন করে। পড়িবার জন্য ছেলেটীকে দিল্লী পাঠান হইবে কথা হইতেছে। যোগেশ ব্রহ্মচারী সঙ্গে নিয়া যাইবেন। দিল্লীতে ভক্তরা একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া কীর্ত্তনাদি করিতেছেন। মার আদেশে সাধন কয়েকদিন গিয়া তথায় ছিল। মার প্রেরিত বলিয়া সেখানকার ভক্তেরা সাধনকে যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। দাসুকেও তাঁহাদের কাছেই পাঠান হইবে।

কাল শ্রীযুক্ত বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লী হইতে আসিয়াছে মাকে দোলপূর্ণিমাতে দিল্লী নিয়া যাইতে, কিন্তু মার শরীর এখনও খুব দুর্ব্বল তাই যাওয়া হইবে না। এখানেই সকলকে, মা'র কাছে আসিয়া কীর্ত্তন করিবার জন্য বলিয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার সাহেবও ইহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বীরেন কাল চলিয়া যাইবে, যোগেশ ব্রহ্মচারী ও দাসু সঙ্গে যাইবে। বৈকালে সোলনের রাজমাতা আসিলেন। তিনি কীর্ত্তন খুব পছন্দ করেন। বীরেন, যোগেশদাদা ও আমরা সকলে তাহাকে বহুক্ষণ নাম শুনাইলাম সন্ধ্যার সময় সকলেই বিদায় হইলেন।

উপস্থিত সকলে মা'র ঘরে বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। মা'র অবস্থা যেদিন খুব খারাপ হয় সেদিন নাকি মাথাও এত ঠাণ্ডা হইয়াছিল যে ভোলানাথ সেঁক দেওয়াইয়া মাথা গরম করিয়াছেন। এখনও মধ্যে মধ্যে মাথা খুব ঠাণ্ডা হইয়া যায়। একটু সেঁক না দিলে শরীর ঠিক হয় না। আজও মাথা ঠাণ্ডা, একটু সেঁক দেওয়া হইল। এই ভাবে সকলে মিলিয়া আলাপ করিতে করিতে রাত্রি দশটা বাজিল। মা'র শুইবার জন্য বাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

২৩শে, ফাল্গুন, সোমবার—মা আজও প্রতিদিনের মত সাতটায়ই উঠিলেন। আজ ভোর সাড়ে পাঁচটা হইতেই শ্রীযুক্ত নিশিবাবু

আসিয়া নাম ধরিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বীরেন ও আমরা যোগ দিলাম। অনেকক্ষণ নাম চলিল। নামেই মা'র শরীর ভাল থাকে। কীর্ত্তনের পর মাকে পথ্য দেওয়া হইল বারটায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। মা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। কখনও কখনও হয়ত চোখ খুলিয়াই মা শুইয়া আছেন। কিন্তু কথা বলিবেন না। মা বলেন, "নিয়ম যখন পালন করা হয়, তখন সম্পূর্ণ ভাবে করা দরকার।"

নানা দেশীয় লোক মাকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, যাইতেছেন। আজও বৈকালে দরজা খুলিয়া দিবার পর কয়েকজন সন্ন্যাসী ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। একটী সন্ন্যাসী শাস্ত্র কথা বলিতে খুব আনন্দ পান তাই মা'ও তাঁহাকে ভাল ভাল কথা শুনাইতে বলেন। তিনিও মহা আনন্দে শাস্ত্রের কত কথাই অনবরত বলিয়া যান। অপরের বিরক্তি বোধ হইলেও মা'র বিরক্তির লেশও নাই। চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মা'র কানে কতদূর যে সব পৌঁছে মা'ই জানেন। কেহ মাকে এ'বিষয় কিছু বলিলে মা বলেন, "বলিতে দাও, ও শাস্ত্র কথা বলিতে ভালবাসে, কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই, শাস্ত্রের কথা ত ভগবানের কথা।"

একটা কথা এই যে, মা'র সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিবার পর অনেক সাধক সাধিকা মা'র ভাষার ও ভাবের অনুকরণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক স্থানে ইহা লক্ষ্য করিয়া মাকে বলিয়াছি। কিন্তু মা আমাদের বলিয়াছেন, 'বলিতে দাও, কোন বাধা দিও না, আর এখন সামনে আছে, না হয় বাধা দিলে, দূরে গিয়াও ত এই রূপই করিবে। তখন বাধা দিবে কি করিয়া? সৎ কথার সৎ ভাবের অনুকরণও ভাল।" কি কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ আম পাকিলে আম গিয়া বলে না—আমি পাকিয়াছি, তোমরা আসিয়া দেখ তাহার রং দেখিয়া ও গন্ধ পাইয়াই সকলে বুঝিতে পারে, আম পাকিয়াছে। তেমনি ভিতরে শুদ্ধ ভাব

জাগিলে, কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না তবে ব্যবহারে ও চেহারাতেই ধরা পরে। আজও বৈকালে সোলনের রাজমাতা আসিয়াছেন। ছয়টা হইতে আমরা সকলে মিলিয়া নাম করিলাম। রাত্রি দশটায় মাকে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল।

২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার—আজ বেলা প্রায় দশটায় "নানকি বাই" তাঁহার পুত্রবধূ নিয়া মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মা'র কিছু কিছু উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। মা দু' চারটী কথা বলিলেন "গুরুর উপদেশ মত চলিলেই সব হয়। একনিষ্ঠা চাই, সকলেই এক হইতেই আসিয়াছি, একের মধ্যেই আছি একেতেই যাইব। এক এক অক্ষর করিয়া আমরা লিখি, এক এক গ্রাস করিয়া খাই, এক এক পা করিয়া চলি, ইত্যাদি দু চারটী কথা বলিয়া বলিলেন এই ভাবটি রাখিবে।" খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাহারা বিদায় নিলেন। বারটা বাজিলে মা'র দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

চারটার সময় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। মা'ও কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "খেয়াল হইল এই শরীরটার সিদ্ধেশ্বরীর যে শুষ্ক চেহারার ফটো উঠিয়াছিল সেই কথা। তখন কিন্তু মোটা ছিলাম কিন্তু পূর্ব্বের সাধনের ফলে সাধকদের যে একটা শুষ্ক চেহারা হয় তাহা এই শরীরের মধ্য দিয়া ফুটিয়াছিল। সেই ভাবটা তখন খেয়াল হওয়ায় পূর্ব্বের সেই শুষ্ক চেহারাই ফটোতে উঠিল। সেই "কৃচ্ছ্র" সাধনের সময় কিন্তু খাওয়া দাওয়া ছিল না, শোওয়া ছিল না। অথচ অথিতি অভ্যাগত হইতে সকলের সেবা, সংসারের যাবতীয় কাজ, সব হইয়া গিয়াছে। শরীর শুষ্ক হইলেও ভিতরে শক্তি ছিল। বেশ ছিলাম, সেই সময়টা ত তোমরা দেখ নাই। তাই বোধ হয় সিদ্ধেশ্বরীর

কৃচ্ছ্র সাধনের অবস্থা খেয়াল হওয়ায় সেইরূপ ছবি উঠিল

ফটো উঠাইবার সময় যে কথা খেয়াল হইয়া গেল। তাই তোমরা সেই শুষ্ক মূর্ত্তিটা দেখিয়াছ।"

২৫শে ফাল্গুন, বুধবার—আজ সকালে অখণ্ডানন্দ স্বামিজী বিন্ধ্যাচল হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভোলানাথের পত্রেও জানিলাম তাঁর ভাই অনেকটা ভাল। তিনি ২।৪ দিনের মধ্যেই আসিতেছেন।

২৬শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার—আজ সকালে উঠিয়া মা হাতমুখ ধুইয়াই বলিলেন, "আজ আমি একটু হাঁটিয়া আসি চল।" এই বলিয়া ডাক্তার সাহেবের বাড়ীটা সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, 'লোকজন কেহ আসিলে যায়গা এ'সব ঘরে হইবে'—ইহাও বলিলেন।

ঘুরিয়া আসিয়া নিজের ঘরটীতে মাত্র বসিয়াছেন। তখনই এটাওয়া হইতে নিরোজ বাবু সপরিবারে, ও বেরিলি হইতে মহারতনের বড় মেয়ে ও প্রফেসার দাস গুপ্তের স্ত্রী, সব আসিয়া উপস্থিত; মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা আসিলে যায়গা হইবে কি না, আমি এই মাত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়াছি।" তাহারাও বলিল, 'মা, তুমি ত জান, তাই আমরা আর কিছু খবর দেই নাই।'

সকলে মাকে নিয়া বসিলেন। অনেক কথা বার্ত্তা হইতেছে। নিরোজ বাবুর স্ত্রী বলিতেছেন, "মা আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির আবশ্যকতা আছে কি?" মা বলিলেন, "আছে বৈ কি! শ্বাস প্রশ্বাস ত সব সময়ই চলিতেছে, কখনও কখনও বিষয়াদির চিন্তায়ও কুম্ভকাদি কি কোন প্রকার আসন হইয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, সেই ভাবে বসিয়া বিষয় চিন্তায় মন বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট হইয়া যায়। আপনা অপনি এ'সব হইয়া যায়। সেই রকম যে ভাবে বসিলে বা যে ভাবে শ্বাসের গতি হইলে আত্মচিন্তায় মন নিবিষ্ট হইতে

আসন, প্রাণায়ামের উপকারীতা

পারে, তাহা অভ্যাস করা দরকার। যাহাদের মন আপনা হইতেই ঐ মুখী থাকে তাহাদের আর আসন প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিতে হয় না। ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে তাহাদের প্রাণায়াম আসন ইত্যাদি আপনা আপনিই হইয়া যায়। এক এক আসনে এক একটা ক্রিয়ার (জাগতিক ক্রিয়ার) বৃত্তি বিশেষ ভাবে জাগ্রত হয়, সেই সেই ক্রিয়ার সময় তদনুযায়ী আসন অপনা আপনিই হইয়া যায়। জাগতিক ব্যাপারেও ইহা সব সময় দেখা যায়। তোমার বসিবার ভঙ্গি দেখিয়াও বলা যায়, তোমার মনে এখন কোন্ ভাব প্রবল। চোখের দৃষ্টি, এমনকি শব্দ শুনিয়া, বা চিঠি লিখিবার রকম দেখিয়াও পরিষ্কার বলা যায় তোমার চরিত্র কি রকম? আয়নায় মুখ দেখার মত, পরিষ্কার দেখা যায়।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন সকলে মুগ্ধ হইয়া মা'র কথা শুনিতেছেন। মা আবার বলিতেছেন—"

মন যেমন চঞ্চল, আবার তেমনি মন মহা সাধু, বাহিরের কোনটাতেই সে তৃপ্ত হয় না।" অনেক্ষণ কথা বার্ত্তার পর মার ভোগ হইল। ১২টার মা'র দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৪টায় দরজা খোলার পর আবার কি কথায় কথায় মা বলিতেছেন, "প্রথমে শুদ্ধ কর্ম্মাদির আশ্রয় নিয়া অশুদ্ধ সংস্কারগুলি নষ্ট করিতে হয়। পরে আবার শুদ্ধ কর্ম্মাদিও থাকে না; যেমন গায়ে ময়লা পড়িলে সাবান দিতে হয়, সাবানও কিন্তু ময়লা। সাবান মাখিয়া ময়লা উঠান হইল। পরে আবার জল দিয়া সাবান ও ময়লা দুইই ধুইয়া ফেলা হইল।" এই ভাবে আরও কয়েকটী কথা বার্ত্তা হইল। অসীমানন্দ স্বামী আজ অনেক স্ত্রীলোক নিয়া মা'র দর্শনে কনখল হইতে আসিয়াছেন।

২৭শে ফাল্গুন, শুক্রবার—মা আজ রাত্রি প্রায় ৪টায় উঠিয়া বসিয়াছেন। ৫টায় হাত মুখ ধুইলেন। ধীরে ধীরে প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আসিয়া মায়ের কাছে জুটিতে লাগিলেন। আমরাও আছি। কথায় কথায় পূর্ব্ব-কথা উঠিল। মা'র যে শাহবাগ থাকাকালীন এক সময়েতে আগুন ও জল জ্ঞান ছিল না। মা সেই অবস্থার কথা বলিতেছেন, "কি রকম হইত জান? জল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার ব্যবহার একেবারে গোল। যেমন, সব যায়গায় হাঁটি, চলি, সিড়ি দিয়া নামি কি উঠি; সেইরকম জলের মধ্যেও এই শরীরটা নামিয়া যাইত। তারপর যে সাঁতার দেওয়া বা উঠিবার চেষ্টা করা তাহা আর হইত না। কারণ জলের ব্যবহারই খেয়ালে নাই কিনা। কাজেই, সে ভাবই জাগিত না। যেমন মাটীতে চলা ফেরা হয়, সেইরকম আর কি। এই অবস্থায় ইহারা (আমাকে দেখাইয়া)—কতদিন উঠাইয়া নিয়া আসিয়াছে। সমাধি না তোমরা কি বল জলের মধ্যে সে রকম হইয়া গিয়াছে। আবার আগুনও এই রকমই, আগুনের তাপ বোধে আসিত না। অথচ আগুনের যে ক্রিয়া তাহা ত শরীরে হইয়াই যাইবে কিন্তু আমার খেয়ালে আসিত না। এই অবস্থায়ই পায়ে ও হাতে আগুন রাখিয়াছিলাম। এমন কি মনে হইত, যেমন হাতে ফুল নিয়া খেলা করা হয় আগুন নিয়াও তেমনই খেলা করিবার ভাব জাগিত। কোনও পার্থক্য বোধ ছিল না।"

পূর্ব্বকথা—শাহবাগ

আগুন বা জলের জ্ঞান নাই

আবার কথা উঠিল, মা যে কোন পাখীর মুখ দেওয়া ফলও খাইতে পারিতেন না, আবার সকলের মুখেরটাই খাইতে দেখিয়াছি। এমন কি একদিন একটা কুকুর কি খাইতেছিল, মা দৌড়িয়া গেলেন, আমি

পাখীর খাওয়া ফলও গ্রহণ করিতে পারেন না আবার কুকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ

উহার সঙ্গে যাইব। মা'র শরীরের যে এইরূপ কত বিপরীত ভাবের ঘটনা দেখিয়াছি তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ছোট বড় অসংখ্য ভাবের খেলা মায়ের শরীরে অনবরত হইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

তারপর কথা উঠিল, সিদ্ধেশ্বরীতে ঐ গহ্বরটা দৈর্ঘে ও প্রস্থে কত হাত ছিল। মা'র মুখে শুনিলাম উহা যজ্ঞকুণ্ডের মাপে ছিল। পূর্ণ সওয়া হাত নয়, তারও একটু কম ছিল। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমানই ছিল। তার মধ্যে মা শুইয়া থাকিতেন। মা'র শরীর কখনও বড় ও ভারি হইয়া যায়

মায়ের শরীরে পরিবর্ত্তন

কখনও আবার ছোট এবং পাতলা হইয়া যাইত। এ'কথা অনেকেই জানেন। আজও মা কথায় কথায় বলিলেন, "শরীর সঙ্কুচিত না করিয়া কি ঐ গহ্বরে ঐ ভাবে শোয়া যাইত?" আমরাও ভাবিতাম মা'র এতবড় শরীরটা কি ভাবে ঐ গহ্বরটুকুর ভিতর শোয়া অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারিত? আজ মা'র মুখ হইতেই সত্য ঘটনা বাহির হইল।

বাসন্তী পূজার সময় লাবণ্যের ভাবের কথা উঠিল। আজ মা'র মুখে শুনিলাম মা যখন অট্টহাসি হাসিতে হাসিতে বাতাসের বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন লাবণ্য ভয় পাইয়া "খুড়ীমার কি হইল?" বলিয়া মাকে গিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিল; কারণ, সে আর কখনও মা'র ভাবাবস্থা দেখে

লাবণ্যের ভাবের কথা

নাই। মাকে স্পর্শ করা মাত্রই, তাহার শরীরের একটা অবস্থা হইল, সে গড়াইতে গড়াইতে ঘর হইতে নীচে পড়িয়া গেল। মাটীর নীচু ভিটির ঘর, বিশেষতঃ কীর্ত্তনের গোলমাল; ঝড়ের প্রবল বেগে প্রতিমা পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে

সকলেই এত ব্যস্ত ছিল যে সেদিকে কেহ লক্ষ্যই করিতে পারিল না।

রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটায় মা পায়খানায় গেলেন, আসিয়া শুইয়া শুইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, "দেখ, লক্ষণ দেখিয়াই ধরা যায় কে কোন স্তরে আছে? মহান ভাবের খেলা অন্য রকমই হয়। ঐ সাধারণ ভাবে মূর্ত্তি নিয়া, তাহাকে লীলা বলে না। ভগবানের লীলা সবই, ইহা সত্য; আর সাধকদের কি হয়? না প্রথম একটা ভাব নিয়া আরম্ভ হইয়া শেষে অমূর্ত্ত ভাবেও কেহ কেহ চলিয়া যায়। ইহার মধ্যে ভাব সমাধিও আসিতে পারে।"

"আর, আগে যে বলিলাম কাহারও হয়ত আনন্দে একটা অবসন্ন ভাব মাত্র হয়, তাহাদেরও লক্ষণ দেখিয়া ধরা পড়ে। হয় ত কোন মূর্ত্তির উপর বিশেষ ভাবে আসক্ত, তাই কখনও কখনও সেই ভাবের গভীরতায়, একটা অলৌকিক ক্রিয়ার মত শরীরের উপর হইয়া যাইতেছে। কিন্তু, ঐ অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলে তাহার মধ্যে আবার সাধারণ ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে। যেমন, বিষয় চিন্তা, দেহাত্ম-বুদ্ধি ইত্যাদি,— সবই আবার ফুটিয়া উঠে। কারণ, ভোগের ভাব ত তাহার যায় না, কোন বিশেষ স্থান বা মন্দিরাদি বা উপাস্য দেবতার অনুরূপ কিছু দেখিলেই তাহার শরীরে নানারকম ক্রিয়া হইতে থাকে। তাই, দেহের পরিচর্য্যাদি অথবা বিষয়াদির কথা সে আবার সাধারণের মতই করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক যে সমাধির স্তরে যায় তাহার রংই বদলাইয়া যায়, কেন না, পাকে কিনা, এবং অবস্থানুযায়ী তত্ত্বও প্রকাশ পাইবে। যেমন আম পাকিলে আমের আর বলিতে হয় না আমি পাকিয়াছি তোমরা আস। তাহার রং ও গন্ধে সকলে জানে আম পাকিয়াছে। তাই বলিতেছি; কোন একটা মূর্ত্তি নিয়া হয়ত সে ডুবিয়া আছে। তাই

কীর্ত্তনাদিতে বা অন্য কোন কারণে তাহার মধ্যে একটী বিশেষ ভাব ফুটিয়া উঠিলেও সেই ভাব অন্তে আবার সে সাধারণ ভাবেই আসিয়া স্থিতি লাভ করে। এ'সব ভাব ধরা বড় মুস্কিল।"

"যাহার মধ্যে মহান ভাবের সব খেলা হইতেছে, তাহার কোন বিশেষ ভাব, বা মূর্ত্তি নিয়াই কেবল, সমাধির স্তরে যাইতে হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই তাহার মধ্যে যুগপৎ সব খেলাই হইয়া যাইতে পারে। যেমন, এক সময় দেখা গেল, কোন কারণে তাহার সমাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, আবার দেখা গেল, বিনা কারণেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। এইটাই স্বভাব কারণের দরকার হইল না। স্বভাবের সমাধি ত স্বভাবের খেলা কিনা।"

মায়ের ভাবের কথা—জল বা বাতাস দেখিয়া তদ্‌ভাবাপন্ন

চারু বাবুর কাছে মা নিজের অবস্থার কথা বলিতে বলিতে একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ্, এই শরীরটার কি রকম হইত জান? জল দেখিয়া, আগুন দেখিয়া বা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তদভাবাপন্ন হইয়া যাইত। যেন এই শরীরটাই নদীর ঢেউ, বা আগুনের মূর্ত্তি। অথবা, বাতাসের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। "অতি সামান্য ভাবে মাটীর সঙ্গে পায়ের স্পর্শ আছে, সেই অবস্থায় শরীরটা বাতাসের মত এদিকে ওদিকে চলিতেছে—পড়িয়া যায় না। তার কারণ, শরীরটা বাতাসের মত হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। এইরকম নদীতেও নৌকায় গেলে শরীরের গতি এমন হইয়া যাইত যে, নদীর জলের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে চাহিত। সেই ভাবেই শরীরে এমন একটা অস্বাভাবিক শক্তির প্রকাশ হইত যে ইহারা (আমাকে দেখাইয়া) ধরিয়া রাখিতে পারিত না। আপনা হইতেই সে ভাবটা আবার থামিয়া যাইত। হয়ত শরীরটা থাকিবার, তাই থামিয়া যাইত, নতুবা, কাহারও ধরিয়া রাখিবার শক্তি হইত না।"

এখনও সেই ভাবের কথায় বলিতেছেন, "মহান্ ভাবের—খেলার ভিতর সব রকমই দেখতে পার। কাল যে জল, আগুন, বায়ু বা আকাশের ভাবের সঙ্গে শরীরটার গতির কথা বলিয়াছিলাম, সেই সব কি রকম জান?—'প্রকৃতি নিয়া লীলা'। নির্ব্বিকার পুরুষ পড়িয়া আছে, প্রকৃতি তার মধ্যে খেলা করিতেছে প্রকৃতি নিয়া লীলা যেন, শক্তি ও শক্তিমান। সে কিন্তু প্রকৃতির অধীন হয় না। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়া লীলা হইয়া যাইতেছে। যেমন, স্বামী, স্ত্রী, সংসারে খেলা করিয়া যাইতেছে কখনও কখনও স্বামী হয়ত স্ত্রীর কথামত চলিতেছে কিন্তু তাহাও যেন স্বামী বা কর্ত্তার অনুগ্রহ মাত্র! স্বামী যিনি, তিনি স্বাধীন। স্বামী অর্থ কিনা স্ব+আমিসং যিনি, স্বয়ং যিনি—সেই 'আমি'। এই জন্যই সন্ন্যাসীরা হয়—স্বামীজী—'সোঽহং' আর কি? এই মহান ভাবের খেলা যাহার মধ্যে হইয়া যায়, তাহার মধ্যে যুগপৎ সব ভাব সব সময়ই খেলিয়া যাইতে পারে। তাহাদের শরীর পঞ্চভূতের দেখ বটে, আবার সবই অতীন্দ্রিয়ের লীলা হইয়া যাইতেছে। অতীন্দ্রিয় না হইলে দুইটা ভাব যুগপৎ এক আধারে প্রকাশ পাইতে পারে না।"

"রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারদের খেলা গুলিকে লীলা বলিয়া গিয়াছে। লীলা কি, না যাহা লয় হয়, তিনি যাকে লন। তিনিই তাহাতে মিশাইয়া লন। তিনি স্বয়ং বহু। তিনিই নিজেকে নিয়ে নিজে খেলেন। তাই লীলা। প্রকৃতিই লীলা করেন। প্রকৃতি পুরুষে লয় হইয়া যায়।

লীলা

এই যে প্রকৃতি, ইহা সবই সমান ভাবে গ্রহণ করেন যেমন নদী, ময়লা ও চন্দন সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে বাতাস, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ সবই বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে সূর্য্য সর্বত্রই সমান আলো দিতেছেন। এই সবই প্রকৃতির খেলা। নদী যতক্ষণ সমুদ্রে না মিলে ততক্ষণই তার নাম

নদী, যেই গিয়া সমুদ্রে পড়িল, অমনি তার নাম হইল সমুদ্র। আসলে, সবই—এক মহানের খেলা।"

তারপর, একটু চুপ থাকিয়া বলিতেছেন, "এই সব ভাব ধরা বড় মুস্কিল। এই মহান ভাবের খেলা, যাহার মধ্যে আপনা আপনি হইয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যেও কখনও কখনও লৌকিক ভাবের আভাস পাওয়া য়ায়। কারণ লৌকিক, অলৌকিক যুগপৎ দুই ভাবের খেলাই সে তার মধ্যে হইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক গতিতে এমন সুন্দর, এই যে হাত, পা সব নিয়া যেন, মহাপ্রকৃতি খেলা করিতেছেন; সামান্য একটু এই ইচ্ছাশক্তি থাকিলেও, মহান ভাবের খেলা তাহার মধ্যে হইতে পারে না।" কথায় কথায় ভোর হইয়া গেল।

ইচ্ছাশক্তি থাকিলে ভাবের খেলা হয় না

আর একটী ঘটনা শুনিলাম, সিদ্ধেশ্বরীতে, একবার ননীবাবু কি উপলক্ষে মাকে ভোগ দিতে যান। তার একটী মেয়ের উপর মার কুমারী পূজার মত সব হইয়া গেল। ফুল বেল পাতার পূজা নয়। কি ভাবে কুমারীর পূজা করিতে হয় তাহাই হয়ত মায়ের শরীরের ভিতর খেলিয়া গেল।

ননীবাবুর মেয়েকে মার কুমারী পূজা

একবার, যখন ঢাকার বিক্রমপুর পরগণায় মা ঘুরিতে গিয়াছিলেন, তখন মা 'নোয়াদ্দা' গ্রামে যান। সেখানে খুব কীর্ত্তন হয়, মার খুব ভাব হয়। এমন একটা চমৎকার অবস্থা হইয়াছিল, লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। মা বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সর্প গতিতে মাথার দিকের অংশটা আঁকিয়া বাঁকিয়া সিড়ি দিয়া উঠানের ভিতর আসিল। অথচ শরীরের অপর অংশ বারান্দায়ই রহিল। সাপ যেমন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে ঠিক সেই ভাবে মার শরীরের এক অংশ উঠানে নামিয়া গিয়াছিল

'নোয়াদ্দা' গ্রামে মায়ের চমৎকার অবস্থা

শরীর যদি দীর্ঘ করা না হইত তবে ইহা সম্ভবপর হইত না। তারপর উঠিয়া যখন ভাবাবেশে হাঁটিতে লাগিলেন তখন গায়ের প্রত্যেক লোম কূপ হইতে যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল মা পরে নিজেও বলিয়াছেন যে মা'র ঐ ভাবই হইয়াছিল। যেন প্রত্যেক লোমকূপ হইতে রক্ত বাহির হইতেছে। আর লোমগুলি এমন ভাবে খাড়া ও শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যেন ঠিক কাঁটার মত ; লোমের অগ্রভাগগুলি কাঁটার মত। আর লোম কূপগুলি যেন এক একটি গোটা বাহির হইয়াছে সমস্ত গায় যেন লাল আভা বাহির হইয়াছে এমনি হইয়া গিয়াছিল। এইরকম আরও কয়েকবার হইয়াছে।

আজ বৈকালে চারটায় দরজা খোলা হওয়ার পর একটী ব্রহ্মচারী আসিয়া বসিলেন, নীরোজ বাবু প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছেন। নীরোজ বাবু গীতার একটা শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন, "মা এই যে নিরাকার উপাসনা সাকার উপাসনা, এইসব কি ? আর গীতায় লিখেছে আজ্ঞাচক্রে মনস্থির করতে হবে ?" মা বলিতে লাগিলেন, "দেখ,

হৃদয় তাঁরই আসন

আজ্ঞাচক্রে মনস্থির করিলেও হয়, তাহা ছাড়া, হৃদয় হইল সুখ দুঃখ আনন্দ প্রভৃতি অনুভবের স্থান ; তাই কেহ হৃদয় আসনে শুধু জগৎ পতিকে বসায় যাহাকে বসাইলে আর নিরানন্দ আসিতে পারিবে না। মনকে একবার হৃদয়ে স্থির করিতে পারিলে তারপর আপনা আপনি তাহা আজ্ঞাচক্রে যায়। আবার আজ্ঞাচক্রে গেলেই তাহা স্বাভাবিক ক্রমে সহস্রারে যাইবে। যেমন একটা ঢালু যায়গায় জল ঢালিলে জল আপনা আপনি গড়াইয়া যায় সেইরকম আর কি।

"আর, 'সাকার,' 'নিরাকার' হইল, প্রথম যখন হৃদয়ে বসাইলে তখন সাকার তারপর আজ্ঞাচক্রে গেলেই নিরাকারের আভাস পাইবে।

তারপর কোন একটা দিকের কথা আর রূপের কথা থাকে না তখন অব্যক্ত গতিতে যায়। আবার দেখ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই যে পাঁচটা আছে ইহার প্রত্যেকটার মধ্যেই প্রত্যেকটা আছে।" এই সব নানা ঘটনা, কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাত্রি দশটায় মা শুইলেন। কিন্তু আজ শরীরটা আবার কেমন হইয়া গেল, মাথা খুবই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সেঁক দিতে দিতে মাথা একটু গরম হইল। তারপর মা চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

২৮শে ফাল্গুন, শনিবার—আজ ভোরেই মা উঠিয়াছেন। কাল মা'র শরীর খুবই খারাপ হইয়াছিল। তাই আজ মাকে উপরে নিয়া আসা হইয়াছে। একটু বেলা হইতেই স্ত্রী পুরুষ প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন দিল্লী হইতে কীর্ত্তন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদ্বারে দিল্লীর ভক্তদের নাম কীর্ত্তন

ডাক্তারের একটা হ'ল সাজাইয়া ১০টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন আরম্ভ হইবার সময় মা'ও নীচে নামিলেন। ভক্তরা মাকে মালায় ও চন্দনে সাজাইয়া দিলেন। পরে সকলেই মালা-চন্দনে সাজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম ধরিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।" সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল বাজিয়া উঠিল। ভক্তদের মুখে নামের প্রতিধ্বনিতে বাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। একেই ত এই বাড়ীতে গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি অনবরত শুনা যাইতেছে, তার সঙ্গে নামের ধ্বনি মিলিয়া ভক্তের প্রাণ আনন্দে ডুবাইয়া দিল। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমা উপস্থিত। আজ সেই শক্তিতেই যেন নূতন উদ্যমে ভক্তগণ গাহিতে লাগিল—"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।"

বৈকালে মা আসিয়া আবার কীর্ত্তনের ঘরের পাশের বারান্দায় বসিয়া আছেন, স্ত্রীলোকেরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। নামের ধ্বনি খুব জমিয়া উঠিয়াছে। অনেক সাধু সন্ন্যাসীও আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। সন্ধ্যার একটু পরেই মা কীর্ত্তনের ঘরে ঢুকিয়া সকলের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, এখন আর রুগ্ন চেহারার লেশমাত্রও নাই। নাম আরম্ভ হইবার পর হইতে শরীরের ভিতর একটা ক্রিয়া হইয়া যাইতেছিল, সামলাইয়া যাইতেছিলেন। এখনও, মা ঘুরিতে আরম্ভই করিতেই স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের মধ্যে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিলেন। তাহাদেরও আর কোন সঙ্কোচই নাই। কারণ মা যে মাঝখানে রহিয়াছেন। মা'র অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে না হইতেই মা সামলাইয়া গেলেন, একধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে আসিয়া আবার যথাস্থানে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়াও ভাব সামলাইতেছিলেন। মা দাঁড়াইতেই কীর্ত্তন আরও জমিয়া উঠিল এবং—'জয় মা, জয় মা, জয় মা'—বলিয়া ভক্তরা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। খানিক পরে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইল।

মাকে শুইবার ঘরে নিয়া যাওয়া হইল। ভক্তরা দাঁড়াইয়া মা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। কথায় কথায় চারুবাবু বলিলেন, "মা'র কীর্ত্তনের সময় কেমন একটু ভাব হইয়াছিল। আমরা ত মনে করিলাম আবার হয়ত সিমলার মত হইবে। সিমলায় যাহা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। আচ্ছা মা, খুব একটা আনন্দের ভাব হয় বুঝি?" মা বলিলেন, সব সময়ই এক, আনন্দ নিরানন্দের কোন প্রশ্ন নাই। কীর্ত্তন ছাড়াও শরীরটা কত রকম, হইয়া যাইত। আবার হয়ত দরকার, তাই শরীরটা নামেও ঐ রকম হইয়া যায়।" কথায় মা বলিতেছেন, "দেখ কত রকমের ভাব আছে, কাহারও হয়ত কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে নিজের

সপ্তম অধ্যায়

কীর্ত্তনে ভাব—প্রকৃত সমাধি কি?

উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির অনুরূপ শরীরে ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে। যেমন, কৃষ্ণ কি কালী-মূর্ত্তির উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা হয়ত কীর্ত্তনে ভাবাবেশে কৃষ্ণের মত কি কালীর মত হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর হয়ত একটা অবসন্ন ভাব হইল, পড়িয়া রহিল. লোকে মনে করিল—"সমাধি।" উহা কিন্তু সমাধি মোটেই নয়। কাহারও হয়ত, নাম শুনিতে শুনিতে হাত পা আনন্দে অবশ ভাবে পড়িয়া রহিল। লোকে মনে করিল —"সমাধি"। উহা কিন্তু এ' জাগতিক ভাবের একটা জড় ভাব মাত্র। এ' জড় ভাবটা সমাধি মোটেই নয়। ভিতরে এ'জগতের আনন্দ বা নিরানন্দের ভাব, সমাধি অবস্থায় থাকিতে পারে না। এই যে খণ্ড খণ্ড ভাব নিয়া শরীরের একটা ক্রিয়া হইয়া যায়, যদিও ইহা সাধারণ হইতে উচ্চ, সেই মহান ভাবের বা সমাধির কাছেও নয় কিন্তু।" এই সব কথাবার্ত্তার পর দশটা বাজিয়া যাওয়ায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

২৯শে ফাল্গুন, রবিবার—দিল্লীর ভক্তেরা আজও থাকিবেন। ডাক্তার সাহেবের এই বাড়ীটার পাশেই এক শেঠের বাড়ী। এখানকার কীর্ত্তনের খবর পাইয়া শেঠজী তাঁহার বাড়ীতে একদিন কীর্ত্তন করিবার অনুরোধ জানাইলেন। তাই আজ শেঠের বাড়ীতে কীর্ত্তন হইবে। ডাক্তার সাহেবের বাড়ীতেই বীরেন নিমাই-সন্ন্যাস গান করিল। আজ ভোরেই ভোলানাথ আসিয়া পৌছিয়াছেন। নিমাই-সন্ন্যাস শেষ হইতেই ভোলানাথ নাম ধরিলেন। তিনি নাম ধরিলে, কাহাকেও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেন না। সকলকে টানিয়া নাম করিতে আরম্ভ করান। তিনি বহুক্ষণ নাম করিতে পারেন। নাম খুব জমাইয়া দেন, নিজেও নামে মাতিয়া ওঠেন। বেলা প্রায় ১১টায় নাম উঠাইতেই মা বলিলেন, "এই নাম আর বন্ধ হওয়ার

দরকার নাই, কীর্ত্তন শেঠের বাড়ী নিয়া যাওয়া হউক”—তাই হইল। সেই বাড়ীতে নাম হইতে লাগিল।

এই বাড়ীটীও গঙ্গাগর্ভে, ঐ বাড়ীতে অখণ্ড অগ্নি রক্ষা হয়। প্রত্যহ ৪।৫ জন ব্রাহ্মণকুমার হোম করেন। আমরা দেখিতে গেলাম, গঙ্গার গর্ভেই বাড়ীর এক অংশে হোম হয়। ব্রাহ্মণ কুমারেরা নামাবলী গায়ে দিয়া হোম করিতে বসিয়াছে—বেশ দেখাইতেছিল। মা বেলা ২টায় কীর্ত্তনে গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বহু সাধু সন্ন্যাসী কীর্ত্তনে আসিলেন। অনেকে কীর্ত্তনে যোগ দিয়া কীর্ত্তনের শোভা যেন আরও বৃদ্ধি করিলেন! খুব আনন্দ চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন শেষ করা হইল। কীর্ত্তনান্তে আবার ভক্তের দল মা'র সঙ্গে মা, মা, গান করিতে করিতে ডাক্তারের বাড়ী ফিরিলেন। আজ অনেকে দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। অনেকে পূর্ণিমার স্নান ও আরও কয়েকদিন মা'র সঙ্গ লাভের জন্য রহিয়া গেলেন।

৩০শে ফাল্গুন, সোমবার—সকালে মা উঠিবার পর ভক্তেরা আসিয়া মাকে ঘিরিয়া বসিল। বেলা হইলে মা ছাতে গিয়া একটু হাঁটিতে লাগিলেন। বেলা ১১টায় মা'র ভোগের সময় কয়েকটী স্ত্রী, পুরুষ 'জসিদি' হইতে আসিলেন। ইহারা দেওঘরের বালানন্দ স্বামিজীর শিষ্য। প্রাণগোপাল বাবুর নিকট মার উচ্চ অবস্থার কথা শুনিয়া দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ভোগের পর তাঁহারা মার কাছে বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা কি করিলে, শান্তির অধিকারী হওয়া যায়?” মা বলিলেন, “অবিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়া যাও। যেমন, গাছের গোড়ায় জল দিলে, ধীরে ধীরে গাছ বড় হয়, আবার, পুরাতন পাতা ঝরিয়া গিয়া নূতন পাতা আপনিই বাহির হয়, তেমনই তোমরা কাজ করিয়া যাও, দেখিবে ধীরে ধীরে, আপনা

আপনিই যাহা চলিয়া যাইবার তাহা চলিয়া যাইতেছে, যাহা আসিবার তাহা আসিতেছে। এ'টা ছাড়িব ও'টা ছাড়িব ইহা ভাবিও না। এক নাম ধরিয়া থাক, দেখিবে সব আপনা হইতেই হইয়া যাইবে।" খানিক পরে তাহারা বিদায় লইলেন। মার দর্শন পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলে মিলিয়া খানিকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। রাত্রি ২টায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১লা চৈত্র, মঙ্গলবার—আজ মা কথায় কথায় আমাকে বলিতেছেন, "শরীরের ভিতর যখন নানারূপ ক্রিয়া হইয়া যাইত, সেই সময় দেব দেবীদের, যেরূপ বিভিন্ন রকমের আসন ছবিতে দেখ, ঐরকম সব আসন হইয়া যাইত। দেবীরা বা দেবতারা বাহনের উপর এক এক প্রকার আসনে বসিয়া আছেন দেখা যায়, এ'ও যেন ঠিক তেমনি হইত। এই রকম আসন একবার তোমাদের দিদিমা দেখিয়া ফেলিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। তোমার দাদাম'শায়কে দেখাইবার জন্য ডাকিয়া নিয়া আসিলেন, কিন্তু তিনি আসিয়া আর দেখিলেন না, হয়ত দরকার ছিল না।"

মায়ের সাধনার কথা,
দেব দেবীর আসন

২রা চৈত্র, বুধবার—আজ দোল পূর্ণিমা। দিল্লীর অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ জামসেদপুর হইতে যতীশ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। সকলে মাকে নিয়া রং খেলিতে লাগিলেন। মা'র শরীর দুর্ব্বল, কিন্তু সেঁদিকে খেয়াল নাই—সকলকে নিয়া আনন্দে নাম করাইতেছেন "জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে।" ভোলানাথ মহা আনন্দে সকলকে নিয়া নাম করিতেছেন। মাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলে নাম করিতেছেন। খুব আনন্দ চলিতেছে। খানিকক্ষণ পর মা

দোলপূর্ণিমায় দোললীলা
ভোলানাথের মাতৃভাব

সকলকে ভোলানাথের সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। রং খেলার পূর্ব্বেই গঙ্গার ধারে, মা'র ও ভোলানাথের ফটো তোলা হইল। ভোলানাথ অনেক সময়ই এখন মার দিকে চাহিয়া মা, মা, বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আজ ফটো তুলিবার সময় যখন ভক্তরা কেহ কেহ মাকে ভোলানাথকে একত্রে বসাইয়া ফটো তুলিতে চাহিল, তখন মা হঠাৎ একটু উচ্চস্থানে গিয়া বসিয়া ভোলানাথকে বলিলেন, "শুধু মা, মা বলিলে হয় না, ছেলের মত কাছে বস।" এই কথা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভোলানাথও হসিতেছেন, ভক্তবৃন্দও হাসিতেছেন। সত্যই ভোলানাথ একটু নীচে মা'র কাছে বসিলেন। আমি বলিলাম, 'বেশ এখন মা ও ছেলের ফটো তুলুন।"

ভোলানাথ ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়াও সকলকে নিয়া খুব কীর্ত্তন করিয়াছেন। কীর্ত্তন করিতে করিতেই ফিরিলেন। সকলে স্নান করিয়া আসিয়াছেন, মা সকলের কপালে শ্বেত চন্দন ও আবিরের ফোঁটা নিজ হাতে দিয়া দিয়াছেন। ভক্তরা মা'র এই অনুগ্রহে কৃতার্থ হইয়া যাইতেছেন। মা'র চরণে লুটাইয়া সকলে প্রণাম করিলেন। অনেকক্ষণ পর কীর্ত্তন শেষ হইল।

বেলা তখন ১২টা, মাকে নিয়মমত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আজ মার খাওয়া হয় নাই, কারণ কীর্ত্তনাদিতে ও স্নানাদিতে সকলেরই দেরী হইয়া গিয়াছে। মা বলিলেন, "নিয়ম যখন চলিতেছে, তখন তাহা রক্ষা করা দরকার, এখন দরজা বন্ধ করিয়া দাও, রান্না হইলে উঠাইয়া নিয়া আসিও।" তা'ই হইল। ভোগের সময়, মা আসিয়া বসিতেই ভক্তেরা চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। মা'র ভোগ হইয়া যাইতেই প্রসাদ নিবার জন্য কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। মা ভোগের পর আবার শুইবার ঘরে আসিয়া মৌন হইলেন। বলেন, "আমি মৌন না হইলে

তোমরা কথা বন্ধ করিবে না।" বাস্তবিকই মা'র সব কাজই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। লোক শিক্ষার জন্য মা কতই না করিতেছেন!

রং খেলা সুরু হইবার পূর্ব্বে যখন ভক্তেরা মা'র ও ভোলানাথের চরণে আবির দিল, তখন আবির দিবার জন্য পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে মা ও ভোলানাথকে ভক্তরা বসাইলেন। যখন ভক্তরা মাকে মালা পরাইয়া দিলেন তখন মা হাসিতে হাসিতে ভোলানাথকে দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন- "এই ছেলেটার গলায়ও একটা মালা পরাইয়া দাও।" এই বলিয়া ভোলানাথের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, 'আশীর্ব্বাদ করিব নাকি?' —এই বলিয়া ভোলানাথের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, সুমতি, সুবুদ্ধি হউক। ঘর হইতে ভালভাবে বাহির হও।" ভোলানাথও হাসিতে লাগিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ স্থির দৃষ্টিতে মার এই লীলা দেখিতেছেন। সকলের প্রাণেই কি ভাব জাগিল কে জানে! সকলেই যেন স্তম্ভিত! মা আবার হাসি হাসি মুখে সকলের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "কি, তোমরা সকলে যে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছ?" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আজও সকলে মিলিয়া মা'র কাছে কীর্ত্তন করিলেন। আজ দিল্লীর সকলেই চলিয়া গেল। শুধু পঞ্চু বাবু রহিলেন।

ভোলানাথও মায়ের সন্তান

৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার—আজ ভোরে মা চোখ খুলিবার পূর্ব্বেই আমি যাইয়া মার পায়ে একটু সরিষার তেল মালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, মা চোখ বুজিয়াই মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শোন খুকুনি, তোমাদের মতই সকলে আসিয়া আমাকে নাম শুনাইয়া গেল।" এই বলিয়া সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "জয় গুরু, জয় মা, শ্রীমধুসূদন, গোপাল গোবিন্দ

নাম, ভক্ত নারায়ণ।" আমি বলিলাম, 'কে নাম শুনাইল মা?' মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক দেখিলাম। কেহ ন্যাংটা, কাহারও জামার বোতাম খোলা, কাহারও রং ভয়ানক কালো, এইরকম সব। নিজেরা নিজেরা মিলাইয়া মিলাইয়া নাম করিতে লাগিল। কাহারও ময়লা পোষাক, কাহারও বেশ ভাল পোষাক, বেশ দুলিয়া হেলিয়া—যেমন শিশুরা আপন মনে করে—নাম করিতেছে। এখনও তাহার স্পন্দন ঘরের ভিতর আছে। (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটাকে মধ্যখানে দাঁড় করাইয়া চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম করিতেছে। কখনও হাত জোড় করিতেছে তোমরা কেহই ঘরে ছিলে না।"

এর পর আরও অনেকে ঘরের ভিতর আসিলেন। অপরাপর কথা উঠিল। কাল রাত্রিতে সেই অখণ্ড ভাবঘনর কথায় বলিতেছেন, "দেখ সূর্য্য ও তাহার রশ্মি, সেই রকমই যেন এসব মূর্ত্তি, সেই হইতেই আসিতেছে। কোন যায়গায় হয়ত আলোক কিছু বেশী পড়িতেছে কোন যায়গায় হয়ত কিছু কম পড়িতেছে। দেখ, সূর্য্য যখন আমরা দেখি না, তখনও সূর্য্য পৃথিবীর অপর দিকে নাকি থাকে, কাজেই এই যে সূর্য্য, ইহা অনাদি অনন্ত। প্রলয়েও বীজ থাকে, তাই, আবার প্রকাল হয়। এই আসা যাওয়া—অনাদি ও অনন্ত। তাই বলি, জাগতিক সবই অনাদি ও অনন্ত। সবই যে তিনি, তাই সবই অনাদি অনন্ত।"

দেরাদুন হইতে প্রফেসার সত্যবাবু আসিয়াছেন। সঙ্গে তাঁহার এক আত্মীয় যুবক, সাত বৎসর যাবৎ গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী অবস্থায় আছেন। তাহাকে মা'র কাছে দেখাইবার জন্য নিয়া আসিয়াছেন। কথায় কথায়, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "মনে করিবে যে, বাস্তবিক পক্ষে, যেন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে পারি।" ব্রহ্মচারিটী মা'র

এই গভীর ভাবের কথাটী ধরিলেন, বলিলেন, "মা পারব ত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে?" মা বলিলেন, "সেই পথই ত অবলম্বন করিয়াছ। পারিব কিনা এ' দ্বিধা আন কেন? নিজের কাজ করিয়া যাও।"

আজ সকালেই, নীরোজ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অমৃতসরে ফিরিবার পথে আবার মাকে একটু দেখিয়া যাইবেন।

বৈকাল বেলা মার দরজা খুলিবার পর সকলেই মাকে নিয়া বসিলেন। আজ দু' তিনদিন যাবতই কথা হইতেছে যে কীর্ত্তনে মার শরীর ভাল হইতেছে। মা নিজেই বলিতেছেন, "দেখ, কীর্ত্তনের পরদিন হইতেই খাওয়া হইতেছে।" সত্যি কথা, মার পেটটা ভাল থাকে না, সর্ব্বদাই ভার ভার মনে হয়, তাই অতি সামান্যই খাইতেছিলেন। ডাক্তারসাহেব একটু বেশী খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু মা খাইতে পারেন না। কীর্ত্তনের পরদিন হইতেই, অপেক্ষাকৃত বেশী খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন হার্টও ভালই আছে। বলেন, "তোমাদের কীর্ত্তনেই আমার শরীরটা ভাল করিয়া দিয়াছে।"

কীর্ত্তনে মায়ের শরীর ভাল হইল

তারপর নিজে নিজেই বলিতেছেন, "তোমরা সকলেই বল—"মন স্থির হয়না, মন স্থির হয় না;" কেন যে হয় না তা'ত বুঝিতেছ না। সর্ব্বদাই অস্থির জিনিষের চিন্তা করিতেছ অস্থির জিনিষের চিন্তায় মন স্থির হয় কি করিয়া? সঙ্গ গুণ আছে ত? সর্ব্বদাই অস্থির জিনিষের চিন্তা নিয়াই থাকিবে আর দু এক ঘণ্টা পূজার ঘরে বসিয়া বলিবে এত করিলাম, মন ত স্থির হইল না। ঔষধ ও পথ্য দুইটাই চাই তবে ত রোগ সারিবে। জাগতিক বিষয় চিন্তা শুধু অভাবই জাগাইয়া দেয়, স্বভাব যাইতে দেয় না।" তারপর, আবার কি কথায় কথা উঠিল' 'ভগবানের' দয়া। সত্য বাবু মা'র কথা শুনিবার জন্য বলিতেছেন, "মা, ভগবানের আবার দয়া মায়া

আছে নাকি? তবেত, দেখিতেছি তাঁহার কষ্টও হয়। এ'কি রকম হইল?" মা প্রথম এদিক ওদিক বলিতে লাগিলেন, "বাবা, তবে এইসব প্রার্থনা ইত্যাদির অর্থ কি বলত?" এই সব কথায়, কথার মীমাংসা হইতেছে না, তারপর মা বলিলেন, "ভগবানের দয়া মায়া আছে বৈকি? তাঁর মধ্যে সবই আছে। আবার, কিছুই নাই। যুগপৎ, দুইটাই যে তার মধ্যে খেলা করিতে পারে।" তখন, ব্রহ্মচারী যুবকটী সত্যবাবুকে বলিলেন, 'কি, এখন মীমাংসা হইল ত?' সত্যবাবুও বলিলেন, 'এইসব বলিয়া বলিয়া আমরাই ত মার কথা বাহির করি।' মা বলিলেন, "একেবারে সত্যি কথা বাবা। তোমরাই কথা বাহির কর, আমি যে তোমার মেয়ে। এই বলিয়া মা আবার স্বাভাবিক মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।" সকলেই মার মুখের হাসি ও কথায় খুব আনন্দ পাইতেছেন। খানিক পরে সত্য বাবু ও ব্রহ্মচারিটী প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রহ্মচারিটী সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া গেলেন।

ভগবানের কি দয়া আছে?

এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি কি কথায় বলিলেন, দিল্লীতে তাঁর বাড়ী আছে ইত্যাদি। নীরোজ বাবু বলিলেন, সন্ন্যাসীদের এ'সব ভাব থাকিবে কেন?—বাড়ী ঘর। সেই কথায় মা বলিলেন, "দেখ এখন যে গেরুয়া ধারী সব সন্ন্যাসীরা আছেন তাঁহারা সন্ন্যাসী হইবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। তাই সন্ন্যাসীর বৃত্তি ধারণ করিয়া আছেন। কখনও কখনও গৃহস্থদের মধ্যে এই সন্ন্যাসবৃত্তিধারীদের চেয়েও উচ্চ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এ'সব সন্ন্যাসীদের ভিতরে কাহারও কাহারও নীচ ভাবও, অনেক সময় দেখা যায়। গৃহস্থদের সেই সব উচ্চ ভাবগুলি অনেক সময় মনে উঠিয়া মনেই মিলাইয়া যায়। আবার কখনও কখনও খুবই কার্য্যকরী হইতে দেখা

যায়। যেমন, একটা অগ্নিকুণ্ড আছে, তার স্ফুলিঙ্গটুকুই আরও একটা বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে।" এইসব কথাবার্ত্তার পর সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বেই কীর্ত্তন সুরু হইল। ঘণ্টা খানেক কীর্ত্তন চলিল। পরে ধীরে ধীরে সকলে বিদায় হইতে লাগিলেন।

৪ঠা চৈত্র, শুক্রবার—আজ মা বেলায় উঠিলেন। ভক্তরা সব আসিয়া বসিলেন। বেলা প্রায় ১১টায় ভোগ হইল। মা'র কয়েকদিন যাবত খুব সর্দ্দি ও কাশি হইয়াছে। আজ কাঁচা আমের ডাল রান্না হইয়াছে, মা খাইতেছেন।

মায়ের লীলা

খানিকটা খাওয়ার পর অপর তরকারী খাইতেছেন। পঞ্চুবাবু উপস্থিত ছিলেন, মা বলিলেন, "ভোলানাথকে ডাক ত।" ভোলানাথ আসিতেই বলিলেন, "দেখ বাটিতে যে আম ডালটুকু আছে, খাইয়া ফেলিব?" ভোলানাথ বলিলেন, 'খুব বেশি টক হইয়াছে কি?' মা বলিলেন, "খাইয়া দেখ ত।" ভোলানাথ একটু ইতঃস্তত করিতেছেন দেখিয়া মা আমাকে বলিলেন, "চামচ দিয়া একটু মুখে দিয়া দেও ত?" আমি হাসিয়া তাহাই করিলাম। সকলে হাসিতেছেন। এই লীলায় সকলেই আনন্দ করিতেছেন। ভোলানাথ বলিলেন, "খাও, বেশি টক হয় নাই।" মা অমনি বলিলেন, "তুমি খাওয়াইয়া দিবে নাকি?" ভোলানাথ বলিলেন, "আমি ভাল করিয়া মাখিতে পারিব না।"—বলিয়া নিজেই ভাল করিয়া মাখিয়া মাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। মা হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তারসাহেব আসিলে বলিব, ভোলানাথ আমাকে খাইতে বলিয়াছে ও খাওয়াইয়া দিয়াছে, তাই আমি টকের ডাল খাইয়াছি।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভোলানাথও হাসিয়া বলিলেন "তাইত দোষ ত সবই আমার।"

মা পাতে কিছু রাখিতে দিলেন না। পঞ্চুবাবু, বেনু ও অভয় এই তিনজনকে নিকটে বসাইয়া ডাল, ভাত, তরকারী তাহাদের দিতে বলিতেছেন। সব তরকারী এই ভাবে শেষ করিয়া মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ ধুইয়া আসিয়া ছোট বিছানাটুকুতে বসিলেন। ডাক্তারের নির্দ্দেশ মত ১১টায় দরজা বন্ধ হইবে, আর আধঘণ্টা দেরী আছে। সকলে আছে, ১মিনিট পূর্ব্বেও কেহ মাকে ছাড়িয়া যাইবেনা। ১১টা বাজিলে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৪টায় মা উঠিয়া বসিলে অনেক স্ত্রীলোক মাকে দর্শন করিতে আসিল। মা সকলকে নাম করিতে বলিলেন। অভয় আগে বলিয়া দিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে নাম করিতেছেন। গঙ্গার ধারে ছোট ঘরটিতে মা সকলকে নিয়া বসিয়াছেন। আমের ডাল খাওয়ার পর হইতে মার আর কাশি নাই। সকলে এ'কথা নিয়া আনন্দ করিতেছেন যে, মা কাশির ভাল ঔষধই খাইয়াছেন। কাশি আর থাকে কি করিয়া। আজও প্রতিদিনের মত রাত্রি ১০টায় মায়ের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

৬ই চৈত্র, রবিবার—কাল রাত্রি হইতে মা'র শরীরটা আবার খারাপ হইয়াছে। আজ সকালেই দিল্লী হইতে জিতেনবাবু মার দর্শনে আসিয়াছেন। বরোদা হইতে গঙ্গাচরণবাবুও সপরিবারে আসিয়াছেন। মার শরীর আবার একটু খারাপ দেখিয়া সকলেরই মন খারাপ। হৃদকম্প বাড়িয়াছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মার চেহারা খারাপ দেখা যায়, আবার অল্প সময়ের মধ্যেই মুখের ভাব একটু ভাল দেখা যায়। আজ সারাদিনই মা'র শরীর খারাপ চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় মার মাথা, হাত, পা ঠাণ্ডা হইয়া গেল। সেঁক দিতে দিতে আবার একটু গরম করা হইল। মা ত নিজের ভাবে বলিতেছেন, "বেশ শরীরটার

মধ্যে একটা কীর্ত্তন চলিয়াছে।" কিন্তু সকলের প্রাণেই ভয়, মা কি করেন কে জানে ?

৭ই চৈত্র, সোমবার—কাল সারারাত্রি মা'র হৃদকম্প খুব চলিয়াছে, আজ চেহারা খারাপ দেখাইতেছে। আজ ভোরে ঢাকা হইতে ভূপতি দাদা দুই মাসের ছুটী নিয়া মা'র কাছে আসিয়াছেন। মা আজ সকালে নীচের ঘরে নামিয়া গিয়াছেন। সেখানে উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন, শরীর অসুস্থ, তাই বেশী কথা না বলিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। আবার ভয় হয়, মার ত চুপ হইলেই আবার বিপরীত চুপ হইয়া যায়, কথা বলিবার ভাবই থাকে না! তাই আপন ভাবে যে দু' একটী কথা বলিতেছেন তা'তে আমরাও যোগ দিতেছি।

জামসেদপুরের যতীশ ডাক্তার মহাশয় সপরিবারে আসিয়াছেন। তাহার ৬ মাসের শিশু মেয়েটী তাঁর মা'র কোলে বসিয়া নানারকম শব্দ করিতেছে। শুনিয়া শুনিয়া মা বলিতেছেন, "কথা বাহির হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ, নানারকম শব্দ করিতেছে, এর পর, হঠাৎ, একটা শব্দ 'বাবা', কি 'দাদা' বাহির হইয়া যাইবে। ইচ্ছা করিয়া যে এই সব করিতেছে তা কিন্তু নয়। আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। কথার গ্রন্থি খুলিয়া যাইতেছে। একটা স্পন্দন হয় শরীরটার, (নিজের শরীর দেখাইয়া), ভিতর হইতে যখন মন্ত্রাদি বাহির হইত তখন ও এই রকমই, ভিতর হইতে কোন কোন সময় আপনা আপনি শব্দ ঠেলিয়া বাহির হইত। তবে, এই শিশুদের সংস্কার আছে, বাহিরের শিক্ষা আছে, অভাবের খেলা কিনা ? যেমন ধারা "বাবা" কি "দাদা" এই শব্দ বাহিরের শিক্ষা। কিন্তু এ' শরীরটার ত তাহা কিছু নয়, আপনা আপনি স্বভাবে হইয়া যাইতেছে।"

আবার, কথায় কথায় বলিতেছেন, "সাধকদের অবস্থাগুলি কি সুন্দর। প্রথম প্রথম যখন অদ্বৈত ভাবটী আসিতে থাকে, তখন মনে হইতে থাকে ; এ' ও আমি, এ' ও আমি"; অর্থাৎ ওর উপর জোর থাকে। তারপর কি হয় না, আমি ছাড়া কিছুই নাই।" এই ভাব জাগে—একমাত্র আমি। আমি ছাড়া আর কিছুই নাই, একথাও ভুল। ভাষা ত, ভা—সাই, যা' ভাসে। ভাষায়--সে সব ভাব বলা চলে না।"

অদ্বৈত ভাবের সাধকদের অবস্থার কথা।

আবার বলিতেছেন, "সাধকেদের ভিতরও সংস্কারের ছাপ থাকে। যত উচ্চাবস্থায় তাঁহারা উঠিতে থাকুন না কেন, প্রথম সূত্রটীর, একটা আভাষ হইলেও, থাকিয়া যায়।—কারণ, সাধক কিনা, অবস্থা কিনা? অবস্থার অতীত, কি স্থিতি হইলে, ভিন্ন কথা। সাধকরা, লোক শিক্ষার জন্য অনেক কিছু করেন সত্য, লক্ষ্য করিলেই কিন্তু বোঝা যায়, ইহা লোক শিক্ষার জন্য করিতেছে, আর ইহা ভিতরের সংস্কারের জন্য করিতেছেন, কিন্তু, যাঁহাদের অবতার বলা হয় তাঁহাদের ত সংস্কারের খেলা থাকিতে পারে না। এ' জন্যই তাঁহাদের কর্ম্মাদির নাম 'খেলা' ও 'লীলা" "এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেনা।

মা আজও সকালে এক কাণ্ড করিয়াছেন। পায়খানায় গিয়াছেন। পায়খানার বাতাস চলাচলের রাস্তা খুব ছোট। হঠাৎ দরজাটার খিল পড়িয়া গিয়াছে, আর ছেলেমানুষের মত দরজার সামনে আসিয়া ভিতর হইতেই উচ্চৈস্বরে 'খুকুনি; খুকুনি' করিয়া ডাকিতেছেন ; আমরা প্রথমে বুঝি নাই। পরে আমি, বেলু দৌড়িয়া গিয়াছি। খানিক পরে, দরজা খুলিতে পারিয়াছেন। বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন, "দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল খুলিবার খেয়াল হইতে ছিল না, ডাকিতেছিলাম।" তারপর খুলিয়াও

বিপরীত ভাবে দরজায় ধাক্কা দিতেছি। অনেক সময় দেখিয়াছি, দরজা খুলিবার বা বন্ধ করিবার খেয়ালটী থাকে না, সাধারণ খিলও খুলিতে পারেন না। আবার কখনও কখনও, যাহা সাধারণে পারিতেছে না, তাহা অনায়াসেই করিতেছেন। এই জন্য ট্রেনেও অনেক সময় মা পায়খানায় গেলে আমি দরজা একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। আমি না থাকিলে নিজেই কোন সময় দরজা একটু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতেন। হয়ত, বন্ধ করিয়া বসিলেন, আর খুলিবার খেয়াল নাই, বাইরে হয়ত সকলে মনে করিল মার পায়খানা হয় নাই, অথচ, ঐ দিকে হয়ত ঐ বন্ধ ঘরে মার শরীরের গতিই অন্যরকম হইয়া গেল। এইরূপ মা কখনও অতি সাধারণ ভাবে চলিতেছেন কখনও হয়ত বিশেষ একটা অসাধারণ ভাবেই শরীরের গতি চলিতে লাগিল। একই আধারে এইরূপ নানা ভাবের লীলা আমরা দেখিতেছি।

৮ই চৈত্র, মঙ্গলবার—আজ বেলা প্রায় ৮টায় মা উঠিয়াছেন শরীরটা বিশেষ ভাল নয়। বেলা এগারটায় মা'র ভোগ হইল, বারটায় দরজা বন্ধ হইবে। মা'র কাছে আমি বসিয়া আছি। মা'র ছোট বেলার কথা উঠিয়াছে। মা'র অদ্ভুত চরিত্রের কথা যতই শুনি, বা দেখি 'নিত্যই নূতন' বলিয়া মনে হয়। মা বলিতেছেন, 'এই যে একটা স্পর্শসুখ সকলেই ভোগ করে; পিতা-মাতা ভাই-বোন, শিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া, এই শরীরটার গতি কখনও সেই রকম হয় নাই। এখন চারিদিকেই দেখি। এমন কি সন্তান মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কত আনন্দ পায়, আমি মা'র কাছে যে শুইয়া থাকিতাম মা'র দিকে পিঠ দিয়া শুইয়া থাকিতাম। তারপর কীর্ত্তনে শরীরের ওলট পালটের সময় তোমরা জড়াইয়া ধরিয়াছ। বাহির ভিতর যখন এক হইয়া গেল তখন হয়ত

মায়ের ছোটবেলার কথা
স্পর্শ সুখযোগ

শরীরের বাবার কাঁধে মাথা রাখিয়া ফটো উঠান হইল। পূর্ব্বে কিন্তু এ'সব ভাবে কখনও কেহ পায় নাই। হয়ত দরকার নাই তাই ঐ সব দিকে শরীরের গতিই হয় নাই।

ভোলানাথ নিজে যে মাকে চির ব্রহ্মচারিণী বলিয়াছেন তা'ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। যে বৃত্তির হাত হইতে জগতে কেহই নিস্তার পায় না, মা'র আমার সেই বৃত্তি কখনও জাগে নাই, মা বলেন, "হয়ত তোদের দরকার নাই। দরকার ছাড়া কিছুই ত এ শরীরটায় প্রকাশ পায় নাই শরীরেত কোনটাই অঙ্গহানি নাই।" মার ছোট বয়সে এজন্য ভোলানাথ নাকি সময় সময় বলিয়াছেন "এ'কি অদ্ভুত, এরকম শুনাই যায় না।" মা তখনই নাকি উত্তর দিয়াছেন হয়ত দরকার নাই। এমনকি, ভোলানাথের ভিতর সেই ভাব একটু জাগা মাত্রই মা'র শরীরের এমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত, যে ভোলানাথ ভয় পাইয়া যাইতেন। মাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। মা বলেন, "অঙ্গস্পর্শ করার দরকার হইত না। বিছানায় শুইয়া আছেন, ভোলানাথের কোন রূপ ভাবের পরিবর্ত্তন মাত্রই এই শরীরটায় অস্বাভাবিক অবস্থা হইত।"

মা বলেন, "এটা ভোগ, বা ওটা ত্যাগ করিব—এ'ভাব কিন্তু নয়। এই পথ দিয়া শরীরটা চলিয়াছে, বোধহয় তাহাই তোমাদের দরকার তাই শরীরের গতি এরূপ হইয়া গিয়াছে। যদি বল, কেন সব ভোগ শরীর দিয়া হইল না। এই কেনর কোন অর্থ নাই। তবে ইহাও বলিতে পার, ইংরাজিতে কথা বল না কেন? ইংরাজদের, বা অন্য কোন জাতীয় খাদ্য খাও না কেন? তাহাদের মত রং, শরীর বা ভাব হইল না কেন? সব সম্বন্ধেই এই কথা হইতে পারে। 'কেন যাইবে, কোথায়?' সবার মধ্যেই 'কেন'। এ রকম কত কথাই উঠিতে পারে, তাই বলি যাহা তোমাদের দরকার তাহাই হইয়া যাইতেছে।"

এসব কথার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত 'কল্যাণবনের' কথাগুলিও উঠিল। মা বলিতেছেন, "দেখ, কতগুলি কথা কোন কোন সময় ভিতরে জাগা মাত্রই বাহির করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত চলিতেছে না ;যেমন, বমি আসিয়া পড়িলে, না ফেলা পর্য্যন্ত সুস্থির নাই, এই সব কথা যে হইতেছে সেইরকম বমি করা আর কি ?"আবার কখনও কখনও দেখিয়াছি, রাত্রিতে শুইয়া আছেন হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "কাল আমাকে এই কথাটা খেয়াল করাইয়া দিও." এই বলিয়াই আবার চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। আজ এই কথা প্রসঙ্গে মা বলিতেছেন, "আমার ত কোন থলিয়া নাই, থলিয়া থাকিলেও তাহার নিচের সেলাইটা নাই। অথবা তোমরা পাইপ না কি বল, দুই ধারই খোলা, কিছু রাখিবার ত জায়গা নাই। তাই সব জিনিষ তোমরাই রাখ। কথাগুলিও তোমাদের কাছে ফেলিয়া দিয়াই অবসর। অবশ্য জিজ্ঞাসাও ত কর! জিনিষপত্র তোমরাই রাখ, খাওয়া দাওয়া সবই তোমাদের উপরই থাকে, কথা, বার্ত্তাগুলিও তোমাদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া হয়।" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।

আবার একটু পরে মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন. "দেখ. একটা কথা আসিয়া পড়িতেছে, তা' যদি এখন না বলি, তবে তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া যাইবে, আর আমি একা একা হাসিতে থাকিব, তাই তোমার কাছে বলিয়া নিতেছি। ছোট বেলায় তখন বোধ হয় এগার বার বৎসর হইবে। হঠাৎ একস্থান হইতে শরীরটার সম্বন্ধ আসিল। পাত্রের একটা ফটোগ্রাফ নিয়া আসিয়াছে, আমরা গ্রামের মেয়ে, তখন পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফ কখনও দেখিই নাই। সকলে দেখিল। তারপর, আমার যেমন স্বভাব, গানের কোনও লাইন ধরিয়া আপন মনে গান করিতাম, খেলিতাম, গাছ পালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতাম,

মায়ের বিবাহ সম্বন্ধ—

আজও 'ফটোগ্রাফ' এই কথাটী শুনিয়া দুপুরে একা একা গান ধরিলাম, "ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ, ফটোগ্রাফ।" এই শরীরের এক দাদামহাশয় আড়াল হইতে তাহা শুনিয়া হাসিয়া গিয়া আমার সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি হইতেছে?" আমার যে সম্বন্ধের জন্য ফটো আসিয়াছে, এসব কথা আমার কিন্তু খেয়ালই নাই। তবুও দাদামহাশয়ের হাসিতে তখন লজ্জা করিতে হইবে, তাই এমন লজ্জা হইল যে প্রায় কান্নাই আসিয়া পড়ে আর কি? এই কথা বলিতে বলিতে হাসিয়া আকুল হইতেছেন। বলিতেছেন, "কত তামাসাই হইয়া যাইতেছে।" আমিও একথায় খুব হাসিতে লাগিলাম।

বৈকালে অনেকে আসিলেন, মা উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। জীতেনবাবু আজ চলিয়া যাইবেন। দিল্লীর আশ্রম সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিলেন, "দেখ বাবাজীরা, আমি ত তোমাদের আশ্রম চাই না; কিছুই চাই না, শুধু বলি তোমরা সকলে শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাক। তোমাদের ভিতরের শুদ্ধ ভাবই শুধু বাড়ুক তাই আমি চাই।" সকলে শান্তি ও আনন্দে থাকিতে চেষ্টা কর। আর আশ্রম যদি বল, তা'ও তোমাদের জন্যই, তোমরা কর না।

মা ও আশ্রম

তারও উদ্দেশ্য হইল, সকলের ভিতরে শান্তি ও আনন্দ বাড়াইয়া তোলা। তা' না হইয়া যদি একটা দলাদলির সৃষ্টি হয় তবে আশ্রমের আবশ্যকতা কি? না হওয়াই ভাল। তোমাদের আনন্দেই ত আনন্দ। আমার আশ্রম যদি বল, জগৎ ভরাই একটা আশ্রম—অথবা, অনন্ত আশ্রম।" জীতেনবাবুও মার পায়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমরা সাধ্যমত তোমার আদেশ পালন করিবার চেষ্টা করিব। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার

আদেশ পালন করিতে পারি।" মা বলিলেন, "তাঁর আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই আছে তোমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া যাও।"

৯ই চৈত্র, বুধবার – আজও মা বেলা প্রায় ৯টায় উঠিয়াছেন। দুইদিন যাবৎ বলিয়া রাখিয়াছেন যে, "সকালে আমি নিজে না উঠিলে আমাকে ডাকিও না।" তাই করা হইতেছে। মা উঠিলে মুখ ধোয়াইয়া, একটু জল খাওয়াইয়া দিলাম। পরে যাঁহারা দর্শন করিতে আসিয়াছেন মা তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। খাওয়ার পর মা'র হাত ও পায়ের কয়েকটা ছাপ তোলা হইল। ১১টায় ভোগ হইল, প্রতিদিনের মত ১২টায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

মার শরীর আজ দুই দিন যাবৎ একটু বেশী খারাপ হইয়াছে। বৈকালে মা উঠিয়া বারান্দায় বসিলেন। অনেকে আসিয়াছেন। মা সকলের ভাবের সঙ্গেই সামঞ্জস্য দিতে পারেন, তাই সকলেই মার নিকট আসিয়া আনন্দ পাইয়া থাকেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মা ছাদে গেলেন, সেখানেই রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত রহিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর মাকে নীচে নিয়া আসা হইল। একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মা শুনিলাম আপনি একটু অসুস্থ। মা, আপনি ত ইচ্ছা করিলেই সুস্থ হইতে পারেন। এখন সুস্থ হইয়া উঠুন।" মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি সব সময়ই ত সুস্থ। তবে শরীরটায় তোমরা যাহা যাহা দেখিতেছ শরীরের এ'ও একটা খেলা!" একটু পরে কথায় কথায় হাসিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা হইলেই সুস্থ হইবার কথা যাহা বলিলে ঠিকই। যদি খেয়াল হয় নিশ্চয়ই তোমরা যাহাকে সুস্থ বল, হইতে পারা যায়, কিন্তু খেয়ালই যে হয় না, কি করি বল?"

নানা কথায় রাত্রি ১০টা বাজিল। মা'র ঘরের বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল।

১১ই চৈত্র, শুক্রবার—কাল রাত্রি প্রায় ১১টার আমরা সকলে সবে মাত্র শুইয়াছি, এর মধ্যেই মা ধীরে ধীরে উঠিয়া একা একা চলিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ জাগিয়া আমরা মাকে বিছানায় না দেখিয়া উপরে গিয়া দেখি, তথায় মা শুইয়া আছেন। বলিলেন, "শুইবার ভাবই আজ নাই, তাই পেটটা আজ খারাপ লাগিতেছে।" অভয় সেই ঘরে শুইয়াছিল, আমিও কম্বল নিয়া মা'র ঘরে চলিয়া গেলাম। সমস্ত রাত্রিতেও মা'র শরীর কিছুতেই স্থির হইল না। ভোরে, খানিক সময় দরজা বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বেলা প্রায় ৮টার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। মা বলিলেন, "শুইয়া থাকিলে কি হইবে? শরীরটা চুপ করিয়া থাকিতেছে না। তাই উঠিয়া বসিয়াছে।" মা উঠিবার পর মুখ হাত ধোয়াইয়া একটু পথ্য দেওয়া হইল। তারপরই অনেকে আসিয়াছেন। শঙ্করী মা, শিষ্যদের নিয়া মাকে দেখিতে আসিয়াছেন. মাকে অনেক ভাবে আদর করিতে লাগিলেন। মা'ও তাঁকে 'মা মা— বলিয়া কত কথাই বলিতেছেন। শঙ্করী মা বলিলেন, "আমি প্রায়ই

মাতৃদর্শনে শঙ্করী মা

তোমাকে স্বপ্ন দেখি, কত সময় দেখি তুমি আমার কোলে উঠিয়া বসিয়া আছ।" কিছু সময় বসিয়া তিনি কন্‌খল চলিয়া গেলেন, আরও একটী সাধু মা'র সঙ্গে একান্তে কথা বলিতে আসিয়াছেন. পরে শুনিলাম, তিনি নাকি বলিয়াছেন, "মা, আমি অনেক প্রশ্ন করিব বলিয়া আপনার নিকট আসি, কিন্তু লোক থাকে বলিয়া একান্তে কথা বলিতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আপনি আমার উপস্থিতির সময় সকলের সঙ্গে যে সব

কথা বলেন তাহার মধ্যেই আমার প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়। আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই।"

আজ ঢাকার যতীন কবিরাজ মহাশয় সস্ত্রীক আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া হরিদ্বার ফিরিয়াছেন। খাওয়ার পূর্ব্বে ভূপতিদাদা ঢাকার আশ্রম সম্বন্ধে কথা উঠাইয়াছেন। মা বলিলেন, "এ শরীরের ত আশ্রম সম্বন্ধে কিছুই বলার নাই. তোমরা যাহা ভাল বোঝ, তাহাই করিবে।" সর্ব্ব সাধারণের জন্য উৎসবের সময় কালীর দরজা খোলা সম্বন্ধে অনেকবার গণ্ডগোল হয়. তাই ভূপতিদাদা ঠিক মীমাংসা করিতে চাহিলেন। মীমাংসা হইল, জন্মোৎসবে. যেদিন মার শরীরের প্রকাশ-তিথি, সেইদিনই প্রাতে মন্দিরের পূজাদির পর কালী-মন্দিরের দরজা খুলিয়া প্রথমে গহ্বরের টাকা পয়সা উঠাইয়া হিসাব করিয়া রাখিবে, পরে অন্নপূর্ণার মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। তখন সর্ব্ব সাধারণের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থাকিবে। রাত্রি প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত দরজা খোলা থাকিবে। তারপর অন্নপূর্ণার দরজা বন্ধ করিয়া মন্দিরাদি পরিষ্কার করিয়া কালীপূজা করা হইবে।

ঢাকার আশ্রমে কালীর দরজা খোলার কথায় মায়ের নির্দ্দেশ

পরে, মায়ের প্রকাশ সময়ে, অর্থাৎ শেষ রাত্রিতে মায়ের পূজা হইবে। পূজা অন্তে অর্থাৎ পরদিন ভোরে কালীর দরজা বন্ধ হইবে। প্রথম বার এইরকমই হইয়াছিল। মা আরও বলিলেন, "এই কালী মূর্ত্তির যদি সামান্য কিছু অঙ্গহানি হয়. তবে তাহা যতদূর সম্ভব শুদ্ধ ভাবে ঠিক্ করিয়া রাখিবে। আর যদি কখনও দরজা খুলিয়া দেখা যায় যে মূর্ত্তির এমন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে শরীরের সেই অংশ নষ্ট হইলে মানুষ বাঁচে না, তবে তখনই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এবং দরজাটুকুও ইট দিয়া গাথিয়া সুবন্দোবস্ত করিয়া রাখা হইবে।

প্রণামীর সব টাকা এখন গহ্বরে জমা হয়। দরজা বন্ধ হইলেও কোনও একটা স্থানে প্রণামীর টাকা জমা হইবে। তার আর ঐ টাকার হিসাব করা হইবে না বা তাহা হইতে খরচ করা হইবে না। বৎসরান্তে এই টাকার হিসাব হইয়া রমনা কালীবাড়ীর মোহন্তকে উপস্থিত যে টাকা দিবার কথা আছে, সেই বাবদ এই টাকা সব দিয়া দেওয়া হইবে।

গঙ্গাচরণবাবু মাকে বলিতেছেন, "মা, আপনার শরীরটা এইরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িল কেন? আপনি ত ইচ্ছা করিলেই সুস্থ হইতে পারেন। আপনার জন্য না হউক, আমাদের জন্য আপনি সুস্থ হউন।" মা উত্তরে বলিলেন, "তোমাদের জন্যই ত শরীরটা আছে। যদি এই শরীরটা দিয়া তোমাদের কিছু সেবা হয়, তোমরা রাখিবে, না হয় যাইবে। আমার ত কিছু চিন্তা নাই।" এই বলিতে বলিতেই যেন মুখে নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার ভাব বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিল। মা'র মুখের কথা যে প্রতি বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা যে মা'র ব্যবহারে মুখের ভাবে সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিতেছে। উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ হইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাত্রিতে খাওয়ার পর তখনও ১০টা বাজিতে দেরী আছে বলিয়া সকলে মা'র ঘরে বসিয়া আছেন। গোলা ও গোদাবরী আজ বৈকালে একটু অন্যায় কাজ করিয়াছে বলিয়া মা বলিলেন, "তোমরা ১০ হাজার করিয়া জপ করিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিও।"

গোলাকে পৈতা দেওয়ার কথা

গোলা মেয়েটীর বেশ ধর্ম্মভাব, সে মৌনীই থাকে, বলে কথা বলিতে ইচ্ছাই করে না। এখানে এক ব্রহ্মচারী আসিয়াছেন। তিনি গোলাকে দেখিয়া গোলার পৈতা দিবার জন্য মাকে বলিতেছেন। মা বলিতেছেন, "বেশ তোমারা যোগাড় কর!" কিন্তু খুব বেশী জোর দিতেছেন না। গত

সপ্তম অধ্যায়

পরশু দিন মা গোলাকে সব সময় মৌনী থাকিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। আজ প্রাতে কি একটা কথায় গোলাকে বলিতেছেন, "তোমাকে এতবড় একটা কাজের ভার (পৈতার ক্রিয়াদি) দেওয়া ঠিক কিনা তাই ভাববার বিষয়" বলিয়া একটু হাসিলেন।

আমরা ভাল করিয়া কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। মেয়েটর ভাব ভাল, মা তাহার মৌন ভঙ্গ করিয়া দিলেন। আজ আবার এই কথা বলিতেছেন ইহার কারণ কি? মা ত কোন কথাই ভাঙ্গিয়া সব সময় বলেন না। মার কথা হইল, "কার্য্যে তোমরা বুঝিয়া নিও।"

আজ রাত্রিতে এই সব কথার কারণ বুঝিতে পারিলাম। মা গোলাকে যখন তাহার ক্রীয় কথা বুঝাইয়া দশ হাজার জপ করিতে বলিলেন, তখনই মেয়েটী স্থির হইয়া গেল। মা তাহাকে কাছে ডাকিয়া মিষ্টি কথায় তাহাকে আরও একটু বুঝাইলেন। মেয়েটি একটু পরেই হঠাৎ ঘর হইতে উঠিয়া গিয়া বারান্দায় যাইয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অনেকটা ফিটের মত অবস্থা। দেখিলাম মেয়েটর ভাব ভাল হইলেও মাথায় শক্তি কম। তখন বুঝিলাম মা এই জন্যই উহার মৌন ভঙ্গ করা বা উহার সম্বন্ধে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মা'র কাছে মেয়েটকে নিয়া আসা হইল। মেয়েট মাটিতে পড়িয়া আছে। ভয়ানক ভাবে কাঁদিতেছে, মা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এইরকম হইলে ত উহাকে কোন বিশেষ কাজের ভার দেওয়া যাইবে না, কি বল?" মা'র মুখে মৃদু হাসি, কিন্তু মেয়েটির কাছে তাহা গোপন করিতেছেন। মেয়েটর পৈতার কথা শুনিয়া খুবই আনন্দ হইয়াছিল। তাই মা'র এ'কথায় মেয়েটর কান্না একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। মাও আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, কান্না বন্ধ করিবার জন্যই মা ঐ ভাবে কথা বলিয়াছেন।

তারপর, মা'র কথায় গোলাকে উঠাইয়া মুখ ধোয়াইয়া আনা হইল। এবার সে বেশ শান্ত ভাবে মা'র কাছে বসিল। মা বলিলেন, "এর এরূপ ভাব তাহা জানিয়াই আমি ইহার পৈতার কথায় বেশী জোর দিতেছি না। পৈতা ত একটা খেলার কথা নয়। ক্রিয়াদি সব করিয়া ওঠা ইহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। আমাদের বলিলেন, 'তোমরা সকলে ইহার এই ভাবটা বুঝিবে না, তাই কিছু বলি নাই। এখন এই ভাবটা প্রকাশ হওয়াতে সকলেই ইহার অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছ। তাই ত আমি বলি, মুখের কথায় কিছু হয় না। কার্য্যে প্রকাশ হওয়া চাই। আর বলি, সবটাই দরকার আছে। আজ গোলা ও গোদাবরী একটু অন্যায় করিয়াছে বলিয়াই ত এ'সব ঘটনা ঘটিল। ইহারও দরকার ছিল, "এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাত্রি দশটা বাজিলে মায়ের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

অষ্টম অধ্যায়—মায়ের কথা

১২ই চৈত্র, শনিবার—আজ মা'র শরীরটা একটু ভাল আছে। আজ পুরী হইতে তুরিয়ানন্দ স্বামী, কলিকাতা হইতে রামতারণ বাবু আসিয়াছেন। সকালে একজন আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিতেছেন, "মা অমৃতের কণা পড়িয়াছিল বলিয়া এস্থানের নাম ব্রহ্মকুণ্ড হইল কেন? "অমৃত কুণ্ড" হওয়া উচিৎ ছিল।" মা বলিলেন, "অমৃত যে ব্রহ্মছাড়া থাকিতেই পারে না। ব্রহ্মকুণ্ডে সকলেরই স্নান করিতে হইবে, "অমৃত ধারা পেতে হবে" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ছাপ তোলা ২।৩ দিন যাবৎ বৈকাল বেলা রোজই চলিতেছে। কাল যখন ছাপ নেওয়া হয়, মা বেশ করিয়া দুই হাতে রং মাখিয়া ছাপ দিতেছেন। তখন মাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল মা যেন কত কাজে ব্যস্ত, অনেকগুলি কাগজে ছাপ নেওয়া হইল। বেশ ছাপ দিতেছেন, আর বলিতেছেন, "দেখি কত নিবে আর"—এই বলিয়া কেবলই ছাপ দিতেছেন।

মায়ের পায়ের ও হাতের ছাপ

আমরা জানি, যে'টা আমরা আরম্ভ করি কখনও কখনও মা তাহাতে এমন ভাবে যোগ দেন যেন মা দিন রাত্রি এই কাজেই ব্যস্ত আছেন। অন্যদিকে লক্ষ্যই নাই। খানিকটা সময় এই ভাবেই কাটিল, তারপর যখন সে কাজটা বন্ধ হইল আর হয়ত শত অনুরোধেও একবারের জন্যও সে কাজটা করান যাইতেছে না। এও বলিতেছি এই ছাপের একটা খেয়াল চলিতেছে। বাহিরের লোক দেখিলে হয়ত মনে করিতে পারে মা ছাপ দিবার জন্যই ব্যস্ত। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায় ইহার ভিতরের ভাবটা কি?

ছাপ দিতে দিতে বলিতেছেন, "দেখ, কেহ কেহ হয়ত ছাপ দিতে কত লজ্জা করে, সঙ্কোচ করে, আর এই শরীরটা এখন কি করিতেছে দেখিতেছ ত? যেন একটা খেলা পাইয়াছি। দেখ লজ্জা, সঙ্কোচ আসিবে কেন? শরীরটার ছাপ নিতেছে নেও। তোমরাও দেখ আমিও দেখিতেছি।" এই বলিয়া অনেকগুলি ছাপ দিলেন। যখন যাহাই করিতেন সমস্ত শরীরও যেন সেই ভাবে ভাবান্বিত হইয়া উঠিত। আজও তাহাই দেখিতেছি। এ'ও যেন এক অপরূপ রূপ।

খানিকক্ষণ এই খেলা চলিল। মা বলিতেছেন "সকলেরই কিন্তু একটা সময় আছে। যতটা সময় এই জন্য দেওয়ার তাহা শেষ হইয়া গেলে আর হইবে না।" আবার বলিতেছেন, "যেমন, বসিয়া থাকিয়া কথা বলি কীর্ত্তন শুনি, এ'ও তেমনি এক কীর্ত্তন চলিয়াছে। তোদের সময় ভাল ভাবে কাটানো নিয়া কথা।"

আজও খাওয়ার পর নীচে আসিলে সেই কথা চলিল। মা বলিতে-ছেন, "আচ্ছা, এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে, তোমরা মনে করনা কেন যে মার ছাপ দিবারই খুব ইচ্ছা, প্রতিষ্ঠার জন্য।" এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমরা বলিলাম, "মা, সব লক্ষণ দেখিয়া ত একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। একটা দিক দেখিয়া কিছু বলিলেই ত হইল না।"

মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, অনেক রকম ভাব আছে, ধরা বড় মুস্কিল। প্রথম প্রথম হয় কি জান? সাধকদের বিনয়ের

সাধকের স্তর

ভাব আসে যেমন, আমি কত ক্ষুদ্র আমাকে আবার লোকে সম্মান করে কেন? এই ভাবে লোকের প্রদত্ত সম্মানে জড়সড় হইয়া পড়ে। কেহ যদি তাহাকে সম্মান করিয়া কিছু করিতে যায় সে স্বভাবতঃ লজ্জায় সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ লোকের কাছে

যাইতেও পারে না। লোকে কি মনে করিবে? কেহ কেহ হয়ত লোকের সামনে প্রতিষ্ঠার জন্য কত কি করিতেছে। এ'সব সাধকদের স্তর। বেশ সুন্দর লক্ষণগুলি দেখা যায় কিন্তু এই রকম বিনয় ভাবটাও থাকা দরকার। নতুবা বন্ধন কাটে না। আবার বিশেষ কেমন একটা ভাব হয় জান? যেমন শিশু, সে নিজের গায় নিজেই রং লাগাইতেছে। হয়ত দেওয়ালে ছাপ দিতেছে, কেহ দেখিল, না দেখিল, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। নিজে নিজেই একভাবে এসব সে করিয়া যাইতেছে, হাসিতেছে। কেহ যদি আসিয়া দেখিয়াও ফেলে তাহাতেও তাহার সঙ্কোচ নাই। তাহাতেও তাহার সেই এক ভাব। ভিতরের কোন স্থানে কোনরূপ আবরণ নাই, সব খোলা। এই সব ধরা বড় মুস্কিল, যেমন কীর্ত্তনাদিতে কোনরূপ ভাবের আবেশ দেখিলেই তোমরা বল 'সমাধি'।" এই বলিয়া হাসি হাসি মুখে চাহিলেন। মা বলিতেছেন, "ভাব ধরা বড় মুস্কিল। কে কোন স্তরে আছে, তাহা ধরা সাধারণ লোকের ত কাজ নয়, তাই তাহারা ভুল করে।"

এই সব কথায় কথায় ১২টা বাজিল। মা অমনি মৌনী হইয়া শুইয়া পড়িলেন। সকলে বিদায় নিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। বাস্তবিক পক্ষে মা নিজে মৌন না হইলে এই ১২টা হইতে ৪টা ও রাত্রি ১০টায় দরজা বন্ধ করা যে কতদিন থাকিত বলা যায় না। মা বলেন, "তোমরা ডাক্তার সাহেবের কাছে স্বীকার করিয়াছ, আর এ' শরীরটা ত কখনও কখনও সকলের কথাই শোনে। কখনও কখনও আবার কাহারও কথা শোনে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত করা, ঠিক ভাবে করা দরকার।

বৈকালে আজ মা উপরের ছাতে গেলেন, সন্ধ্যার সময় উপরের ঘরেই বসিয়াছেন। একটি যুবক আসিয়া অবতার, ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মা বলিলেন, "দেখ, এইসব অনুভবের বিষয়। মুখের কথায়

বোঝান যায় না। আর বলিলেও, তুমি তাহা নিঃসংশয় ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে না কাজেই এ'সব নিজের ভিতরে অনুভব করিতে চেষ্টা কর।" কয়েকটী কথাবার্ত্তার পরে ছেলেটি চলিয়া গেল। রামতারণ বাবুকে মা বলিলেন, "দেখ, কথাটা হইল কি জান? আমি ম্যাট্রিকও পাশ করি নাই, আর জানিতে চাই এম, এ, পাশের খবর। কি করিয়া বুঝিবে? তবে আলোচনা করা ভাল, এ'সব যে আছে তাহা জানা হয়। তবে নিজে না অনুভব করা পর্য্যন্ত সংশয় থাকিয়াই যাইবে।"

তারপর কৃষ্ণতত্ত্বের কথায় মা বলিতেছেন "কৃষ্ণতত্ত্ব হইল অতীন্দ্রিয় বিষয় আর মানুষ চায় তাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়া বুঝিতে। তাহা ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় নয়, তাহা কি করিয়া বুঝিবে? তাহারা নিজেদের ক্ষমতানুযায়ী অর্থ করিয়া লইতেছে।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া চুপ করিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টায় খাওয়া দাওয়ার পর মা খানিক সময় পায়চারি করিয়া বিছানায় বসিলেন। ১০টা অবধি সকলেই মার ঘরে বসিয়া রহিলেন। তারপর মা শুইলেন; সকলে প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

১৩ই চৈত্র, রবিবার—কাল রাত্রিতেও মার শরীরটা শান্ত ভাবে বেশী সময় পড়িয়া থাকে নাই। ঘুম আর নাই, কিন্তু মা বলেন, "সাধারণের ঘুমের সময় শরীরটা যেমন ভাঁজে থাকে এই শরীরটাও যখন সেই রকম ভাঁজে ভাঁজে খানিক সময় থাকে তখনই শরীরটার বিশ্রাম দেখিস্। এই শরীর শুইয়াও যেমন থাকে, বসিয়া বা চলা-ফেরা করিয়া তেমনই থাকে।" আজও বেলা প্রায় ৮টায় মা উঠিয়াছেন। সকাল বেলায় একটু দুধ খাওয়ার পর আজও মার হাতের ও পায়ের ছাপ নিতে ছিলাম। মাও এই যেন এক খেলা পাইলেন। দিস্তা দিস্তা কাগজে অনবরত ছাপ দিয়া যাইতেছেন। "আরও কাগজ আন, আরও কালী আন", বলিতেছেন।

দর্শনার্থীরা অধৈর্য্য হইয়া পড়ায় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। সকলে আসিয়া মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে যে ভাবের একটা বাধা হইতেছে সেই বাধায় দরজা বন্ধ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলে ছাপ ভাল উঠিতেছে না। বলিতেছেন, "এখন ভাবটা ঠিক নাই, বাধা পাইয়া অন্য রকম হইয়া গিয়াছে।" খাওয়া দাওয়ার পরও কিছু সময় ছাপ নেওয়া হইল। তারপর মা গিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রতিদিনের মত দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

বৈকালে মা উঠিয়াছেন। ঢাকার একটি লোক সুন্দর কীর্ত্তন গান করেন, তিনি মাকে কীর্ত্তন শুনাইতে আসিয়াছেন। মা ছাতে বসিলেন। অনেক লোক আসিয়াছে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। প্রায় ২ঘণ্টা কীর্ত্তন হইল।

সন্ধ্যার পর রাত্রি প্রায় ৮টায় মা খাইতে বসিয়াছেন, কথায় কথায় রামতারণ বাবু প্রভৃতির সহিত ছাপ দেওয়ার কথা উঠিল, মা বলিলেন,

মা ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না—হইয়া যায়

"দেখ, এই যে বলা হইতেছে আরও "কাগজ আন" "কালী আন" দিস্তায় দিস্তায় কাগজ আনিতেছে ছাপ দিয়াই যাইতেছি, ইহা যে ইচ্ছা করিয়া করি তা' কিন্তু মোটেই নয়, এইরূপ হইয়া যায়। খুকুনী প্রথম যখন দুই দিন ছাপ নিল। খেয়াল এই রকম হয় নাই, কিন্তু তৃতীয় দিন যখন সব নিয়া আসিল তখন হইতে এই খেয়ালটা জাগিল, অনবরত কাগজ ও কালী আনিয়া কূল পাইতেছে না। এই রকমই খাওয়াটাও হইয়া যাইত। কেহ বলিয়া কহিয়া খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেও "আরও আন" "আরও খাইব" এই খেয়াল হইয়া পড়িল; যত দিতেছে খাইয়া যাইতেছি।"

রামতারণ বাবু, "এইরূপ কৃপা জাগিতে পারে না?" মা একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "হয় না, এ'কথা বলিতে পারি না। কখনও হইয়া গিয়াছে

ইহারা দেখিয়াছে। খেয়াল হইলেই হইতে পারে।” এই বলিয়া আমাদের দেখাইয়া দিলেন। রামতারণ বাবু বলিলেন, “আচ্ছা মা, তবে কৃপার ভাবটা আসুক না।” মা বলিলেন, “তোমরা যেমন করাইবে তেমনিই ত হইবে। খুকুনি ২দিন কালি কাগজ নিয়া ছাপ তুলিল। তখনও খেয়াল জাগিল না। তৃতীয় দিন যখন আবার আরম্ভ করিল তখনই ছাপ দিবার খেয়ালটা জাগিল; তোমরাও এইরূপ কার্য্যদ্বারা খেয়ালটা আনিতে পারিলে তাহাও হইয়া যাইবে। আমি ত বাবা নিজে ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না। তোমরা যেমন করাইয়া নেও, তেমনই হইয়া যাইতেছে। এ শরীরের কাছে ত সবই সমান। যখন যা’ হইয়া যায়।” মার ভাব দেখিয়া ও কথা বলার ভঙ্গিটুকু দেখিয়া উপস্থিত সকলেই মার মুখের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

মা আবার বলিতেছেন, “আরও শোন। পূর্ব্বে হইত কি জান? যখন এইরূপ একটা অস্বাভাবিক ভাব হইত, তখন মুখ চোখের একটা অন্য রকম ভাব হইয়া যাইত, সকলেই ধরিয়া ফেলিত কিন্তু এখন স্বাভাবিক ভাবেই সব হইয়া যায়, চেহারা দেখিয়া কেহ কিছু ধরিতে পারে না।”

কাল বৈকালে মাকে গঙ্গার ধারে নিয়া গিয়াছিলাম, হঠাৎ মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দেখ, আমার কিন্তু বিশ্বাস নাই; হয়ত নদীর মধ্য দিয়াই হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। ওপার দেখা যাইতেছে, এ’পারে আছি, মধ্যে যে নদী তা’ সব সময় খেয়াল থাকে না। পূর্ব্বেও এই ভাবটা ছিল, কিন্তু তখন শরীরেও একটা অস্বাভাবিক ভাব হইয়া যাইত, তাতে মুখ চোখের চেহারা দেখিয়াই সকলে সাবধান হইত, কিন্তু এখন আর তাহা হয় না সাধারণ ভাবে হাসিতেছি কথা বলিতেছি, এ’র মধ্যেই হয়ত একটা অস্বাভাবিক গতি হইয়া যায়।” এই সব নানা কথাবার্ত্তার পর মা নীচে নামিয়া আসিলেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত

সকলেই মার কাছে বসিয়া রহিলেন। তারপর সকলে মাকে প্রণাম করিয়া শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন। মার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাতি নিবাইয়া দেওয়া হইল।

১৪ই চৈত্র, সোমবার—আজ সকালেই ঢাকার সেই ভদ্রলোকটী আসিয়া মাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। বেলা প্রায় ৯টা অবধি কীর্ত্তন চলিল। তারপর, মার মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তারপর আবার সকলে মাকে ঘিরিয়া বসিলেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় প্রত্যহই মাকে ধূপ ও কর্পূরাদি দ্বারা আরতি করে; আজও করিল। বেলা ১১টায় মার ভোগ দেওয়া হইল। ভোগের পর একটু কথাবার্ত্তা হইল। বেলা ১২টায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

ছাপ দিবার খেলার সময়ের ঘটনা

হাতের ছাপ তুলিবার সময় একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে, ঘটনাটী এই, যখন তৃতীয় দিন বা শেষদিন মায়ের হাতের বা পায়ের ছাপ নিতে গিয়াছি, সেইদিন তাহাই মার একটি খেলার মত হইয়া পড়িল। আমরা বুঝিলাম, এর পর আর দিবেন না, আজ যাহা নেওয়া যায়। মা দিস্তায় দিস্তায় কাগজে ছাপ দিয়াই যাইতেছেন, আর কোন দিকে লক্ষ্যই যেন নাই। কোনটা ভাল হইল কোনটা খারাপ হইল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। অনবরত ছাপ দিয়া যাইতেছেন। যেন একটী শিশু, এই এক রং নিয়া খেলা পাইয়াছে। মহা ব্যস্তভাবে তাহাই করিয়া যাইতেছেন। মা ত কতবার পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, "তোমরা এই শরীরটার কাছে যে ভাব নিয়া উপস্থিত হও, আয়নায় মুখ দেখিবার মত সেই ভাবই এই শরীরটার ভিতর ফুটিয়া ওঠে।" ছাপ নিবার খেয়ালটা আমি আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি। ২দিন আমিই নিতেছি, তৃতীয় দিন মার খেয়াল হইল, তখন অনবরত দিয়াই যাইতেছেন যেন মহা একটা কাজ। সর্ব্ব

শরীরেই ঐ ভাব ফুটিয়া উঠিল। কাল ও লাল রং দিয়া পায়ের ও হাতের ছাপ নেওয়া হইতেছে। নিজেরই তাহা দেখিয়া মহা আনন্দ। হাতের রেখা উঠাইবার জন্য এই ছাপ নিতেছিলাম। সবটায় রেখা ভাল উঠিতে ছিল না। কিন্তু মার ত সে সব দিকে খেয়াল নাই, তাঁর সবটা দেখিয়াই মহা আনন্দ। ছাপ দিতে দিতে একটু অস্বাভাবিক ভাব শরীরের ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছিল। পায়ের লাল ও কাল রংয়ের ছাপ দেখিয়া হঠাৎ আপন ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, তোমরা ত বেশ সাজাইয়াছ। (নিজের শরীরটা লক্ষ্য করিয়া) এই শরীরটা অর্দ্ধেক কৃষ্ণ, ও অর্দ্ধেক রাধা করিয়াছ।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যেন চুপ হইয়া গেলেন।

ছাপের খেলা শেষ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। নীচে নামিয়া আমাকে কতকটা যেন ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিতেছেন, "আমি কি বলিলাম ? আমি না সেদিন গোলার ও গোদাবরীর অন্যায় কাজের জন্য দশ হাজার জপ করিতে বলিয়াছি। আজ আমারও জপ করা উচিত, কারণ আমি পায়ের ছাপের সূত্র ধরিয়াই ত রাধা কৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ত অপরাধ হইল। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জপ করা দরকার ; কিন্তু আমি তাহা করিয়া উঠিতে পারিব না, হয়ত করিতে করিতে বন্ধ হইয়া যাইবে, নয়ত সারা দিনই ঐ জপ চলিবে। অসুস্থ শরীর বলিয়া তোমরা নিয়মিত খাওয়াইতে শোওয়াইতে চাও, কিন্তু তাহা হয়ত হইবে না, হয়ত জপই চলিতে থাকিবে শুইবার ভাবই থাকিবে না। এই অবস্থায় করি কি ?" আমি বলিলাম, "মা প্রতিনিধি ত কাজ করিয়া দেয়।" মা বলিলেন, "তুমি পারিবে ? তবে তুমিই আমার হইয়া দশ হাজার বার নাম জপ কর।" আমি বলিলাম "তাই করিব"।

আমি দেখিলাম মার এও এক খেলা। লোকের শিক্ষার জন্যই এই

খেলাটা খেলিলেন। নতুবা মার যে ভাব তাহাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অপরাধ কি? কিন্তু লোক-শিক্ষার জন্য আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিলেন।

বৈকালে গোপীনাথ বাবু এবং আরও অনেকে আসিয়াছেন। কুমিল্লার মধ্যে রাহা পরিবারের একটী মেয়ে, সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা, নাম শোভা, তাহার নাকি বেশ অবস্থা শুনিলাম। আজ তাহার এক ভ্রাতা মাতৃ-দর্শনে আসিয়াছেন।

মাতৃসমীপে শিশির রাহা

নাম শিশির কুমার রাহা। তাঁর মুখে শোভার অনেক কথাই শুনিলাম। ইনিও সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য। গুরুর সঙ্গে ইনি অনেক দিন ছিলেন। ব্রহ্মচারীর বেশ সরল ভাব। মার সঙ্গে একান্তে একটু কথা বলিতে চাহিলেন। তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

রাত্রিতে সমাধি সম্বন্ধে মা আমার কাছে অনেক কথা বলিলেন। মার কথায় আমি মোটামুটি যাহা বুঝিলাম তাহা এই,—সমাধি অনেক রকমের হয়। আবার, সমাধি একই। মধ্যে মধ্যে কোন দিকের উল্লেখ মাত্র। কোনও মূর্ত্তির

সমাধি

ভাব নিয়াও একটা জড় অবস্থা আসিতে পারে, উহা কিন্তু জড় সমাধি নয়; নিজেকে ভুলিয়া যায়। আবার, সেই ভাব হইতে আসিয়া সেই মূর্ত্তির ভাব নিয়াই থাকে। এই সব একটা ভাবের অবস্থা মাত্র। সমাধি বলা চলে না। এক রকম সমাধি অবস্থা আসিতে পারে। মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম ভাব আসিয়া ফুটিতে পারে। তাহাকে এক রকম ভাব সমাধিও বলা যাইতে পারে। ইহা সবিকল্প সমাধির পূর্ব্বে। আবার কখনও কখনও কিন্তু ব্রহ্ম ভাবে স্থিত থাকিয়াও ভাব সমাধির মত প্রকাশ হইতে পারে। আরও বলিতেছেন "এক সত্তায় যখনই সাধক স্থিতি লাভ করে, তখন সবিকল্প সমাধি, না তোমরা কি বল, তাই।"

"এই শরীরটার ত নাম শোনার গোলমাল নাই, কারণ লেখা পড়া করে নাই। তবে তোমাদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া কিছু কিছু নাম বলি মাত্র। খেয়াল হইলে অবশ্য সবই আসে আসিতে পারে। কথা হইল, তোমরা যদি কাছে বসিয়া সমাধির বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে থাক, তবে এই শরীরটা সেই বিষয়ের কোন কোন কথা ধরাইয়া দিল মাত্র। জানই ত, তোমরা যে ভাব কাছে নিয়া আসিবে মাঝে মাঝে সেই ভাবেই শরীরটা বলে। আবার হয়ত কিছু বলা হইতেছে না; হয়ত দরকার নাই।" এই বলিয়া আবার বলিতেছেন, "আর, নির্ব্বিকল্প, চৈতন্য, সমাধি, মহাভাব, মহাশূন্য, কত কি নাম তোমরা বল। এ সবটার প্রকাশ কি চমৎকার!"

একদিন একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রহ্মভাবের পর লীলা, ইহা কি রকম কথা হইল?" মা বলিলেন, "এটা বুঝলে না? তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ, তিনি আত্ম-স্বরূপ, এই যদি প্রত্যক্ষ না হয়, অতীন্দ্রিয় লীলায় প্রবেশ কি করিয়া হয়? তাঁকে পাবে তবে ত। জল যেমন বরফ; বরফ যেমন জল। জলেতে বরফ আছে, বরফে জল আছে। সেইরূপ প্রত্যক্ষ নির্দ্বন্দ ভাবে তাঁহার লীলা, তাঁহারই খেলা, প্রকাশ পাবে। নিত্যধাম, নিত্যলীলা এ'সব কোথায় প্রকাশ বল দেখি? তুমি বুঝি ভেবেছ, সেই অখণ্ড অব্যক্ত ব্রহ্ম। সে ঐ দিকের কথা। সাকারে যিনি, নিরাকারেও তিনিই। তাঁহাকে সর্ব্বাকারে পেতে হবে। তিনি অখণ্ড কিনা। যেমন এক বীজেতে অনন্ত বীজ, অনন্ত বৃক্ষ। আবার অনন্তের ভিতরের সেই অন্ত, একই। তাঁকে নানা দিকে পাওয়া, নানা ভাবে পাওয়া। সর্ব্বরূপ, সর্ব্বদিক, আবার নানাত্বের বাহিরে যেতে হবে। বাহিরে ভিতরে তাঁকে সর্ব্বাঙ্গীন পাওয়া চাই। যাহা কিছু শোন, তোমাদের এই দৃষ্টি। অর্থাৎ এই চশমা দিয়া দেখ কিনা, কাজেই দেখার ভুল থাকে। লক্ষ্য ছোট করে রেখো না। সেই পরম

লীলা

পদে লক্ষ্য রেখো। সেই যে সর্ব্বাঙ্গীন, ব্যক্ত, অব্যক্ত, অখণ্ড, পূর্ণ তাঁকে পেতে হবে।"

"এইগুলি কি রকম জান? মধ্যে অনেক কথা থাকে, অনেক অবস্থা থাকে, বলিয়া শেষ করা যাইবে না। একটা সিঁড়ি হইতে অন্য সিঁড়িতে উঠিবার সময় যেমন, শূন্য ভাবটাও থাকে, আবার যে সিঁড়ি ছাড়িতেছে তাহার সঙ্গে যে সিঁড়ি ধরিতেছে, তাহারও যোগ আছে। একটা হইল, সিঁড়িতে উঠিয়া যাইতেছে, আর একটা হইল সেই স্থিতি। এর মধ্যেও অনেক অবস্থা আছে। দেখ, প্রথম যেমন মূর্ত্তভাব নিয়াই একটা শরীরের জড় ভাব আসে আবার মহাভাবেও কিন্তু একটা জড় ভাবের এবং সাময়িক চঞ্চলতার মত দেখাইতে পারে মাত্র।"

সমাধির কথা অব্যক্ত

"এ'সব বোঝাও বড় মুস্কিল। কত কথা থাকিয়া যায়। যতই বলি, বলা শেষ হইবে না, বোঝান ঠিক হইবে না। যেমন ফুলটী কেমন সুন্দর, তাহা মুখে বলিয়া বোঝান অসম্ভব, অব্যক্তই থাকিয়া যায় তেমন আর কি? আর কি জান? আমি ত তোমাদের বই পুস্তকের ভাষা জানি না, তাই সেই সব ভাষা দিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। আর বাস্তবিক ভাষায় ইহা বোঝানও যায় না, শুধু ইঙ্গিত করিয়া যাওয়া। তাই ত বলি শাস্ত্রেও ত কত লিখিয়া গিয়াছে। এই সব না তুলিয়া একটু ভাবের প্রাবল্যকেই সমাধি বলিয়া মনে করিয়া বসিও না।" এই ভাবের অনেক কথাই বলিতেছেন, আমি শুনিতেছি আর ভাবিতেছি সবই অনন্ত।

১৫ই চৈত্র, মঙ্গলবার—আজ ভোরেই আসিয়া ঢাকার সেই ভদ্রলোকটী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মা তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া বসিয়াছেন। প্রায় ২ঘন্টা কীর্ত্তন চলিল। সকলেই কীর্ত্তনাদি

করিলেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মায়ের আরতি করিল ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির গান করিল।

আজ ঢাকা হইতে গণেশবাবুর স্ত্রী, জটু প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছেন। কাল কাশী হইতে শঙ্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি আসিয়াছেন। বাড়ী খানি লোকে লোকারণ্য।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মা শুইয়াছেন, আমি কাছে বসিয়া আছি। মা ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন। মা'র পূর্ব্বের ভাবের কথা অনেক হইল। এক প্রণামের কত অবস্থার কথা বলিলেন। যদিও আমরা এসব দেখিয়াছি, কিন্তু খেয়াল করি নাই। মা'র কথায় অনেক বিষয়ে লক্ষ্য হইল। দেখিলাম এক প্রণামের ভাব নিয়াই একখানা বই লেখা যায়।

এক সময় গিয়াছে, মা সকলকে প্রণাম করিতেন—এমন কি কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত। জিনিষপত্র সবই, পায়ে লাগিলেই প্রণাম করিতেন। মা বলেন, "মা বলিয়া দিয়াছিলেন, পায়ে লাগিলেই প্রণাম করিতে হয়, তাই যাহা কিছু পায়ে লাগিত, ছোটবেলায় সবই প্রণাম করিতাম। এমন কি বিছানায় উঠিবার পূর্ব্বে বিছানাকে প্রণাম করিতাম। আবার মাটিতে নামিবার পূর্ব্বে মাটিকে প্রণাম করিতাম। তদ্‌ভ্রানে সমস্ত কিছুকেই প্রণাম আরম্ভ হইল। তারপর হইল, আমি কাহারও প্রণাম নিতাম না, কিন্তু সকলকে প্রণাম করিতাম। তারপর হইল, কাহাকেও প্রণাম করিতে পারিতাম না, কাহারও প্রণাম নিতেও পারিতাম না। কাহাকে প্রণাম করিব? কেই বা প্রণাম করিবে? তারপর, আবার সব ভাঙ্গিয়া গেল, প্রণাম করিতেছে, আমিও প্রণাম করিতেছি। তোমরা দেখিয়াছ, কত সময় বাবা মাকে কি ভোলানাথকে প্রণাম করিয়া আবার মাটিতে লুটাইয়া সকলকেই প্রণাম করিতেছি। আবার হইল, ৫ মিনিটের জন্য

মায়ের প্রণামের বিভিন্ন অবস্থা

প্রণাম দেওয়া, আর নয়। এই সবই কিন্তু সাধকদের এক একটা স্তরমাত্র। হাতজোড় তা' দেবতার মন্দিরেও হয় তোমাদের কাছেও হয়। সবই এক ভাব। কখন কখনও হয়ত দেখিয়াছ, মন্দিরে মাথা নামাইয়া প্রণাম হয় নাই। কিন্তু শরীরের পিতামাতার চরণে অথবা ভোলানাথের চরণে হইয়া গিয়াছে।"

ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, "যাহাদের প্রণাম করা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ভাবে প্রণাম পাইবার ভাব, সাময়িকভাবে আবার তাহাই হইয়া গিয়াছে। যাহাদের যে ভাব জাগিবে শরীরটা দিয়া অনেক সময়েই সেই রকম হইয়া যায়, ইহাত সর্ব্বদাই দেখিয়াছ। আবার ইহাও দেখিয়াছ সব সময় তাহাদের চরণেও মাথা নামাইয়া প্রণাম হয় নাই। মাথা নামান আর না নামান সবই যে এক কথা। আবার, পায়ে কেহ হাত দিলেই তাহার পায়ের কাছে মাথা নুইয়া পড়িত এ'সব ত তোমরাই দেখিয়াছ। এ'সবই সাধকদের স্তর, এই খেলা শরীরের মধ্য দিয়া হইয়া গিয়াছে।" কাজেই মা প্রণাম করেন না এ'কথাও কিন্তু বলা চলে না।

আবার বলিতেছেন, "হাত পা, একই—যেখানে ইচ্ছা ধর। আবার কেহ যদি এই শরীরটাকে প্রণাম করে বা লাথি মারিয়াও যায়,একই কথা।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খাওয়ার বিষয়ও যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি 'দেবভাব' 'সাধকভাব' সবই মার শরীরটার মধ্যে খেলিয়া গিয়াছে। পরান্ন গ্রহণ করিবেন না এই নিয়ম যখন ছিল,তখন অপরের কিছুই গ্রহণ নাই, এমন কি বলেন, "অপরের বাসন পত্রও ব্যবহার করিতে পারিতাম না কারণ আমার ব্যবহারে বাসন যেটুকু ক্ষয় হইবে তাহাত আমারই নেওয়া হইল।" এই ভাবে সাধকের অবস্থাগুলি একটার পর একটা চলিয়া গিয়াছে। আবার কাহারও উচ্ছিষ্ট এমন কি পাখীর মুখ দেওয়া ফলও খাইতে পারিতেন না। কাহারও

মা'র মধ্যে সাধকদের বিভিন্ন অবস্থার বিকাশ

খাওয়ার লোভ পড়িলে সেই জিনিষ পর্য্যন্ত ভোগে লাগিত না, আমরা কত ভয়ে ভয়ে মা'র খাওয়ার জিনিষ তৈয়ার করিয়াছি মা, না খাওয়া পর্য্যন্ত মা গ্রহণ করিবেন কিনা, এই আশঙ্কা থাকিয়াই যাইত। এমন শুদ্ধ-ভাবে আহার ইত্যাদি হইয়াছে; আবার, কিছুদিন পর সকলের মুখেরটাই হয়ত কখনও খাইতেছেন, এমন কি কুকুরের মুখের জিনিষ পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া খাইতে গিয়াছেন। এত বিপরীত ভাবের সমাবেশ মা'র মধ্যে দেখিয়াছি, দেখিতেছি, যে তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুপুরে বিশ্রামের পর ৪টায় দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। যে যেখানে ছিল, ভক্তেরা সকলে একে একে আসিয়া মা'র কাছে উপস্থিত। আজও সন্ধ্যায় ভোলানাথ সকলকে নিয়া কীর্ত্তন করিলেন। গঙ্গার ও'পারে কীর্ত্তন হইতেছে, ভোলানাথ সকলকে নিয়া তথায় কীর্ত্তন করিয়া আসিলেন। কীর্ত্তনে ভোলানাথের মহা আনন্দ!

রাত্রিতে মা কথায় কথায় সমাধির অবস্থার কথা অনেক বলিলেন।

ভাব সমাধি

জড় অবস্থার পর সবিকল্প সমাধির পূর্ব্বে, যে ভাব-সমাধির কথা বলা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন—"মূর্ত্ত ভাবের সাধনা করিতে করিতে একটা তন্ময়ত্ব বা জড় অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় গেলেই ব্রহ্মভাবের আভাবও কখনও কখনও পাওয়া যায়, তাহাকেও 'ভাব-সমাধি' বলা হয়। একটা হইল অবস্থায় স্থিতি, আর একটা হইল সেই অবস্থার একটা আভাস পাওয়া মাত্র। এই সব পার্থক্য ধরা বড় মুস্কিল।"

সন্তদাস বাবাজীর শিষ্য, শিশির বাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা মা, কোনও দেবতার ধ্যান করিতে করিতে কি সাধক তদ্‌স্বরূপ হইয়া যায় নাকি?" মা বলিলেন, "এ'সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অপর

এক সময় উঠাইও।" পরে মা এক সময় আমাকে বলিলেন, "দেখ, কোন কোন স্থলে হয়, সাধক কোনও রূপ চিন্তা করিতে করিতে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যায়, তখন হয়ত সাধক কখনও কালী বা কৃষ্ণের (যে দেবতার চিন্তা করা যায়) দাঁড়াইবার ভঙ্গিতে ভাবাবস্থায় দাঁড়াইতেছে, চলিতেছে, কিন্তু এই তন্ময়তাটুকু যখন চলিয়া যাইবে, তখন আর ঐরূপ হইবে না। আর এক ভাব আছে, তাহা হইল কি জান? কিছু চিন্তা করা হয় নাই, অথচ নানা দেব দেবীর ভাবগুলি শরীরে খেলিয়া যায়, এই দুইটার মধ্যে কিন্তু রাতদিন পার্থক্য। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি—একটা হইল সেই ভাবে স্থিতি, আর একটা হইল একটু আভাস মাত্র পাইতেছে। সেই আভাসটুকু চলিয়া গেলেই আবার হয়ত সেই। তদ্‌স্বরূপ হয় বৈকি।"

ভাবের আভাষ ও স্থিতির পার্থক্য

গোলার পৈতার কথা একটু একটু চলিতেছে; এখন ও স্থির হয় নাই। মা বলিতেছেন, "যাহা হইবার হইয়া যাইবে।"

১৬ই চৈত্র, বুধবার—আজও ভোরে কীর্ত্তন হইল। পরে মাকে হাত মুখ ধোয়াইয়া একটু দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। দুপুরের ভোগের সময় সকলে চারিদিকে গিয়া বসিলেন। মায়ের থালা হইতে কিছু কিছু প্রসাদ পাইবার অনেকেরই ইচ্ছা, কিন্তু মুখে বলিতে পারিতেছেন না। মা অমনিই বলিতেছেন, "তোমরা খাইবে? আমিও প্রসাদ পাইতেছি তোমরাও পাও; সকলেই আমরা প্রসাদ পাই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বৈকালে একটী সন্ন্যাসী আসিয়া মাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, এই যে সব আমরা আছি, এই সবই ত একস্থান হইতে আসিয়াছি, এক স্থানেই যাইব, সবই ত এক, তবে এই সব ভেদবুদ্ধি কেন হইল?" মা বলিলেন, "কর্ম্মেতেই ভেদবুদ্ধি হইয়াছে। আবার কর্ম্মেই এই ভেদ বুদ্ধি যাইবে।" আবার

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিন্তার স্থান কোথায়?" মা মৃদু হাসিয়া ব্রহ্মতালুতে হাত দিয়া বলিলেন, "এই স্থান হইতেই আসে।" তিনি বলিলেন, "আমি বলি হৃদয় হইতে আসে"। মা হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, হৃদয় হইল সুখ দুঃখের অনুভবের স্থান। সেইখানেই ভগবানের আসন পাতিতে হয়! মূলেই ত সব কিনা, মূল হইল মস্তক। আবার, সবখানেই মূল আছে।"

আর একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাতিভেদ রাখা উচিত কিনা।' মা বলিলেন, "তোমার কি মনে হয়?" তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয় রাখাই উচিত।" মা বলিলেন, "তবে রাখাই তোমার দরকার, কারণ কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই। তোমার সংস্কারানুযায়ী তোমার ভাব। তোমার সেই রাস্তা দিয়াই চলিতে হইবে। সকলের জন্য এক পথ ত নয়। এই দেখ না, হিন্দুরা যাহা শুদ্ধ ভাবের আচার বিচার বলিয়া মনে করে। মুসলমানেরা বা খৃষ্টানেরা তাহা মনে করে না। তাই বলিয়া কি তাহাদের মধ্যে মহাপুরুষ নাই? এই সব হইল যার যেই রকম সংস্কার সেই রকম চলিতে হয়।"

জাতিভেদ

"আবার, সংস্কারটা কিভাবে হইল তাও কিন্তু দেখিতে হইবে। কতকটা হয়, আলস্যের জন্য তোমরা কতকগুলি আচার নিয়ম পালন কর না। আবার, কখনও কখনও ছোটবেলা হইতেই এক ভাবে চলিতে চলিতে একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে সেই ভাবেই চলিতেছে, কিন্তু ভিতরে সংস্কার ভিন্ন রকম। সেই সংস্কারের জন্য নানা সংশয় জাগিতেছে। কিন্তু অভ্যাসে তাহাকে নিজ সংস্কার অনুযায়ী কাজ করিতে দিতেছে না। এই রকম কত আছে।"

আজও সন্ধ্যায় কীর্ত্তনাদি হইল। রাত্রিতে কথায় কথায় মা আবার আমার কাছে সমাধির কথা বলিতেছেন। "দেখ, কত রকম আছে তাহা

ধরা সাধারণের সাধ্য নাই। কখনও পিতলকে সোনা বলিয়া মনে করিতেছে, কখনও সোনাকে পিতল বলিয়া মনে করিতেছে।” এই বলিয়া একটু স্থির ভাবে চাহিয়া রহিলেন। আবার অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, “দেখ, যে সব ভাবের কথা শুনিলে তাহা সমাধি না হইলেও কিন্তু এ’ পথের সহায়ক। যাহাদের শুধু জ্ঞান বিচারের দ্বারাই আত্ম স্থিতির প্রকাশ, তাহাদের কিন্তু চঞ্চলতা, জড়তা ইত্যাদি ভাবাভাবের বিশেষ প্রকাশ কাহারও কাহারও পাইবে না। ভাবাভাব-গুলিও কাহারও কাহারও ভক্তিভাবের ভিতরই বেশী ফুটিতে পারে। কাহারও কাহারও সংস্কার অনুযায়ী জ্ঞান বিচারের দিকটা তীব্র ভাবে ধরিয়া থাকার শক্তির প্রকাশটা কম।

সংস্কার অনুযায়ী ভাবের প্রকাশ

১৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার—আজও শিশির বাবু আসিয়াছেন। রোজই প্রায় এখানে আসেন। আজ ডাক্তার পান্থ বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার চাকর সুরসিংহের হাত হইতে একটি সতরঞ্চি গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া যায়। সে সেইটি ধুইতেছিল। চাকর ত ভয়ে অস্থির, ডাক্তার সাহেব, আসিয়া কি বলিবেন!

এ’দিকে ইহার পূর্ব্বের ঘটনা হইল, মা যখন এখানে আসিয়া ধর্ম্মশালায় ছিলেন, মা’র খুব অসুখ, তখন একদিন এই ডাক্তার সাহেব মাকে দেখিতে গিয়া বলিয়া আসিলেন, “মা, আমি আজ গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, যাহাতে আপনার ভাল হইবার ভাবটা জাগে। মা, আপনি ভাল হইয়া উঠুন, আমার লজ্জা রক্ষা করুন। এই ঘটনার পর মাকে ডাক্তারের বাড়ী নিয়া আসিলে মা যে’দিন মাটিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রথম কাপড় ছাড়িলেন সেইদিন পরিত্যক্ত কাপড়খানা ডাক্তার সাহেবকে দিয়া মা গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছেন।

আজ ডাক্তার সাহেব ফিরিয়া আসিলে মা তাহাকে একান্তে নিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি ত আমার আরোগ্যের ভাব জাগিবার জন্য গঙ্গামার নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলে, তাই গঙ্গা মাকে নিজের হাতে আমার কাপড়খানা দিয়াছ। আবার গঙ্গামা তোমার সতরঞ্চিখানাও নিয়া গিয়াছে।" ডাক্তার সাহেব যেন মা'র ভাবটা ধরিয়াই বলিলেন, "তা'ত ঠিকই হইয়াছে মা, ধুতি নিয়াছে, শয্যা ত নেওয়া চাই, তাই নিয়াছে।" মা'ও হাসিয়া এ'বাক্যের সমর্থনই যেন করিলেন। যেদিন সতরঞ্চিখানি ভাসিয়া গেল, সেই দিনই বৈকালে মা ছাতে গিয়া পায়চারী করিতে করিতে বলিলেন, "গঙ্গা নিয়া গিয়াছে, বলিতেছে"—এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "তোমাকে বলিতেছে বুঝি?" মা'ও অপরে কেহ না শোনে এই ভাবেই কথা বলিতেছিলেন। বলিলেন, "একেবারে পরিষ্কার, যেমন তোমরা কথা বলিতেছ, দেখিতেছি এই রকম।"

গঙ্গামা'র কাপড় ও সতরঞ্চি গ্রহণে মায়ের রোগমুক্তি

আজ শিশিরবাবু মাকে একটা তরকারী রাঁধিয়া খাওয়াইলেন। আজ অমাবস্তার স্নান হইল। সাধুদের মেলা বাহির হইয়াছে, সে এক বেশ চমৎকার দৃশ্য। আমি বলিতেছিলাম, 'এ যেন শিবের সংসার। সবই সন্ন্যাসী, তাদের আবার কত হাতী, ঘোড়া, সাজসজ্জার অভাব নাই। আমরা মা'র সঙ্গে ছাতে দাঁড়াইয়াই সব দেখিতেছি। গঙ্গার ওপর দিক দিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাধুরা চলিয়াছে। কেহ হাতীর উপর, কেহ পাল্কীর ভিতর, বাজনার দল সঙ্গে লইয়া সব চলিয়াছে। নাগা সন্ন্যাসীরা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া চলিয়াছেন, দেখিলে মনে হয়, শিবের অনুচর বহু চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পুলিশ কর্ম্মচারীরা চলিয়াছে। চার পাঁচ দলে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত এই স্নান-যাত্রা চলিল। লোকে লোকারণ্য।

কুম্ভস্নানে সাধুদের শোভাযাত্রা

আজও নিয়মিতরূপে রাত্রি ১০টায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু আজ কয় দিন যাবৎ মার শরীর চুপ হইয়া পড়িতেছে না।

সন্ন্যাসীদের ঐশ্বর্য্য এই মেলার সময়ই দেখান হয়। ব্রহ্ম কুণ্ডে স্নান ও সন্ন্যাসীদের মেলা দেখিতে হরিদ্বার লোকে লোকারণ্য ' রাস্তার ধারেও জায়গা নাই। কাহারও বাসায় কেহ ঢুকিয়া পড়িলে আর যাইতে চাহিতেছেন না। কতকটা জবরদস্তি ভাব। কি করিবে, যায়গা নাই। অথচ, পূণ্য সঞ্চয় করিতেই হইবে। তাই তাড়াইয়া দিলেও কেহ তাড়িত হইতেছে না। এই অবস্থা! অবশ্য, এই সময়তে যিনি যতটা পারিতেছেন যাত্রীদের সেবা করিতেছেন। সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারা, বস্ত্র দান এখানে ওখানে রোজই শুনা যাইতেছে। এ' এক বিরাট উৎসব। শিবরাত্রিতে প্রথম স্নান, দ্বিতীয় স্নান মধ্যে অমাবস্যাতে, তৃতীয় স্নানই 'কুম্ভ স্নান'—চৈত্র সংক্রান্তিতে হইবে। প্রবাদ এই যে, অমৃতের এক বিন্দু এই স্থানে পড়িয়াছিল। তাই ব্রহ্মকুণ্ড হিন্দুদের মহাতীর্থ।

মায়ের ভক্তেরাও দলে দলে ব্রহ্মকুণ্ড স্নান উপলক্ষ করিয়া মাতৃদর্শনে আসিতেছেন। কিন্তু মার শরীর অসুস্থ বলিয়া ১২টা হইতে ৪টা এবং রাত্রি ১০টার পর দরজা বন্ধের নিয়ম চলিতেছে। কিন্তু মা'র শরীরটা যেন সারিতেছে না। কি কারণ বুঝিতেছি না। মা বলেন, "তোমাদের ভিতরকার ভাবেই এইরূপ হইতেছে।" আজও প্রতিদিনের মত রাত্রি ১০টায় দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

১৮ই চৈত্র, শুক্রবার—আজ কলিকাতা হইতে বিমলা মা, আনন্দ ভাই, শচীদাদার বোন (মেজদি), দিদিমা প্রভৃতি আসিয়া পৌছিলেন, উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনা নাই।

১৯শে চৈত্র, শনিবার—আজও ভোরেই মা উঠিয়া বসিলেন, শুইবার ভাবই নাই। খাইতে বসিলেও যেন কেমন কেমন ভাব, খাওয়ার দিকে

খেয়ালই নাই, অপরাপর কথা বলিতেছেন। যদিও এই ভাবটা সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু কখনও বিশেষভাবে ফুটিয়া ওঠে। খাওয়ানো মুস্কিল, কিছুই প্রায় নিতে চাহেন না। কয়দিন যাবতই বলিতেছেন, "দেখ খুকুনী, এখন কিন্তু শরীরটার ভিতর ভুল ভ্রান্তির মত খুব দেখিবে।" সত্যই তাহা দেখিতেছি। আজ সেই কথা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখ্, কাহারও কি বলিয়া কহিয়া ভুল ভ্রান্তি হয় নাকি? ইহা কি রকম জান? যেমন, আজ দোলখেলা করিতে হইবে, খুব খেলা হইল, মাটি, কালি ইত্যাদি মাখিয়া সব ভূত হইল। অথচ জানে—আমি খেলিতেছি আবার ধুইবার জন্য স্নানের জলও তৈয়ার করিয়া রাখিতেছে। বেশ জানে, খানিক সময় খেলিয়া গিয়া সব ধুইয়া ফেলিবে।

মা একভাবে থাকিলেও শরীর দিয়া নানাভাবের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে

অথচ রং মাখিবার সময় ত্রুটী নাই, খুব মাখিতেছে। রং খেলিবার উপযোগী কাপড় পরিয়া নেওয়া হইয়াছে। তারপর, খেলা শেষ করিয়া সাবান দিয়া গরম জল দিয়া স্নান করিয়া সব রং উঠাইয়া ফেলিয়া আবার যেমন তেমন হইয়া বসিল।" এই বলিয়া হাসিয়া বলিতেছেন, "সেই রকম আর কি?" মা'র নানাভাবের কথা এবং শরীর দিয়া নানাভাবের ক্রিয়া হইয়া যাইতেছে।

আমি একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "মা, তোমার এই সব ভাবের কতগুলি ত আমরা অনুকরণ করিয়া নিজের জিনিষ বলিয়া চালাইতে পারি। ধর কেহ যদি তাহা করে তবে ধরিবার উপায় কি?" মা বলিলেন, "তাহা হইলে আঘাত পাইবে। কারণ, যাঁহারা এ'বিষয় একটুও অনুভব করিয়াছেন, সেই সব লোকও এই নকল ভাবটা নিশ্চয়ই ধরিয়া ফেলিবে। আর নকল করিতে গেলে নিজেও আছাড় খাইবে, আরো ব্যথা দিবে।" তারপর বলিলেন, "দেখ, মহাপুরুষেরা সাধনের জন্য

যাহা যাহা বলেন, একলক্ষ্য ধরিয়া স্বাভাবিকভাবে তাহা ধরিয়া থাক। তাঁহারা যাহা করেন তাহা করিতে যাইও না।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে গান মিলাইলেন—

'সহজ ভাবের সহজ নাম,
পূর্ণ হয় মনস্কাম।'

তারপর নিজের কথা বলিতেছেন, "জানই ত পড়াশুনা কিছুই নাই, তারপর অনুকরণ করা ত দূরে থাকুক, যখন সাধনার খেলাটা এই শরীরের ভিতর প্রকাশ পাইতেছিল সেই সময়টায় কাহারও জীবনী বা কোন ধর্ম্ম গ্রন্থাদি কোনরূপ গল্প বা নাটক বা নভেল, যাহাই হউক, কেহ শুনাইতে আসিলেই বিদ্যুৎ লাগিলেই যেমন শরীরে একটা শক্ লাগে সেইরকম একটা ধাক্কা দিয়া যে যাহা শুনাইতে আসিত সে'সব কথা কোথায় উড়াইয়া নিয়া যাইত। শরীরের যে স্বাভাবিক গতিটা তাহাই সব সময় প্রবলভাবে স্থিত থাকিত, বাহিরের কিছু সেখানে আসিতেই পারিত না। কেমন জান? যেমন একটা দেওয়ালে ছোট একটা ইঁটের ঢেলা ছুঁড়িয়া মারিলে দেয়ালে লাগিয়া তাহা ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া যায়, দেয়ালে দাগও লাগে না। দেয়াল হইতে ইঁটের ঢেলা যদি বেশী শক্ত জিনিষ হইত তবেই না দেয়ালটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারিত।"

'আবার এখন যে যাহাই শুনায় কাছে বসিয়া থাকি, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি। একদিন সারদা শঙ্কর ভাগবত শুনাইতে আসিয়াছিল খানিক সময় ঐভাবে থাকিয়া পরে একলা অবস্থায় উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম। আরও একদিন একজন কি শুনাইতে আসিয়াছেন, কাছে বসিতেও পারি নাই। এই দুই দিন ছাড়া আর কেহ কখনও শুনাইতে আসেও নাই। অবস্থা দেখিয়াই কেহ আর আসিত না। যাহাকে শুনান যায় যদি দেখা যায়

তাঁহার শুনিবার মত কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে না, তবে কি কেহ তাঁহাকে শুনাইতে যায়!"

একদিন, শিশিরবাবু মাকে একান্তে নিয়া কথা বলিতেছেন, আমিও নিকটে ছিলাম। শিশিরবাবুর প্রশ্ন এই যে, 'মা, শুনিলাম আপনি দীক্ষা দেন না, এক সময়তে ইহা আমার কাছে খুব ভাল লাগিত, কিন্তু শোভা বলিয়াছে, 'দীক্ষা না দিলে বাস্তবিক শক্তি সঞ্চার করা যায় না।' তাই যদি হয় তবে ত আপনাকে ধরিয়া যাহারা বসিয়া আছে বাস্তবিক পক্ষে আপনি তাহাদের কিছু করিতেছেন না।' মা বলিলেন, "দেখ, যা'র যা দরকার হইয়াহ যাইতেছে। কাণে মন্ত্র না দিলেই যে হয় না, তা' নয়। কি ভাবে যে কাহার কাজ হইতেছে, তাহা বলা চলে না।"

দীক্ষা না দিলেও শক্তিসঞ্চার করা চলে

মা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বল ত তুমি"—আমি বলিলাম, "অনেক সময় দেখা গিয়াছে মা'র চরণে শরণ নিয়াছে, মা ত কাহাকেও দীক্ষা দেন না, কিন্তু সে স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় নিজের ভিতর হইতে বীজমন্ত্র পাইয়াছে। তাহাতেই কাজ হইতেছে। তাহার এই রকম আরও কত রকম আছে। মা আমার এই কথা সমর্থন করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।

রাত্রিতে মার কাছে আমি বসিয়া আছি, আর কেহ নাই। মা ঐ কথা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি রকম জান! যেমন বীজ হইতে গাছ হইল, তারপর কলম করিয়া আবার গাছ করা হইল। বীজের দরকার হইল না, কিন্তু সেই কলমের গাছ হইতেও ফল ফুল সব পাইতেছে। এই রকম নানাভাবেও কাজ হইয়া যাইতে পারে। ইহার ভিতর অনেক রকম ব্যাপার আছে।" আমি বলিলাম, "মা, শুনিয়াছি মহাত্মাগণ নানারকম ভাবে দেহ ধারণ করিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, সকলকেই যে

মাতৃগর্ভের ভিতর দিয়া আসিতে হইবে তা' নয়।" এই কথা শুনিয়াই মা উপরোক্ত কলমের কথা বলিলেন।

২০শে চৈত্র, রবিবার—আজ সকালে দিনাজপুরের রায়সাহেব রাধাগোবিন্দবাবুর ছেলে, পূর্ণেন্দুবাবু আসিয়াছেন। তিনি মাকে কয়েকটী প্রশ্ন করিবেন বলিয়াছেন। ইনি প্রায়ই মা'র কাছে আসেন। তীর্থাদিতে খুব ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি মাকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মা; ভাগবান কি বাস্তবিক আছেন? তাঁহাকে কি দেখা যায়?" মা বলিলেন, "আছেন এবং দেখাও যায়। যেমন তোমাদের দেখিতেছি, তোমরা আমাকে দেখিতেছ, এ'কথা হইতেও অতি সত্য।"

ভগবান আছেন?

তারপর তিনি বলিলেন, "তবে, তিনি আমাদের দুঃখ বুঝিতেছেন না কেন? তিনি এত নির্ম্মম কেন?" মা বলিলেন, "তিনি নির্ম্মম নহেন, সুখ দুঃখ সব অবস্থার ভিতর দিয়া তিনিই তোমাদের পূর্ণ করিয়া নিবেন বলিয়াই এই সব দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া তোমাদের নিতেছেন। তা' ছাড়া, আরও কথা এই যে, তিনি নিজেকে লইয়াই নিজে খেলা করিতেছেন, এই তাঁর লীলা।"

পূর্ণেন্দুবাবু বলিলেন, "আচ্ছা, মনটাকে স্থির করিতে পারি না কেন? এত তীর্থ ভ্রমণ করিতেছি, চুপ করিয়া নাম করি, কিছুতেই মনটা স্থির হয় না কেন?" মা বলিলেন, "দেখ, আমি ত আবোল তাবোল বলি, তোমার মেয়ে ত?" পূর্ণেন্দুবাবু বলিলেন, "বেশ' মেয়েই যদি হও, ভীমরতি ধরেছে বাবার, তাকে মেয়েরই ত বোঝান দরকার, বল মা!" মা বলিতেছেন, "কথা হইল কি জান? তপস্যা হইল তাপ সহা। এই যে দুঃখ পাইতেছ তাঁকে পাবার জন্য, ইহাই হইল তপস্যা।"

সুখ-দুঃখ—তাঁরই লীলা

পূর্ণেন্দুবাবু বলিলেন, "তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়া লাভ কি?" মা বলিলেন, "প্রভাব একটা পড়ে। আর, তা' ছাড়া সব দেখিয়া নিলে, আর ঔৎসুক্য থাকিবে না, স্থির হইয়া বসিতে পারিবে। সবই দরকার। আরও, তীর্থাদিতে সাধু সন্ন্যাসীদের দর্শন হওয়াও সম্ভব। ভাগ্য অনুযায়ী তীর্থাদিতে বিশেষ বিশেষ লাভের আশা। তীর্থও কৃপা করে কিনা! আমি যে বাবা কিছুই ভুল বা খারাপ বলিতে পারি না। আমি দেখি কি জান? সবই দরকার। আর, যে যেস্থান হইতে যাহা বলিতেছে. সবই সত্য। সকলে একস্থানে দাঁড়াইয়া আছে, তা'ত নয়।"

আজ সকালে, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী দেবানন্দ ঢাকার প্রসন্নবাবুকে সপরিবারে মা'র কাছে নিয়া আসিয়াছেন। প্রসন্নবাবুর স্ত্রী চমৎকার গান করেন; তিনি কয়েকটী গান করিলেন, সকলেই আনন্দ পাইল। আর একটী স্ত্রীলোককে এক ভদ্রলোক নিয়া আসিয়াছেন। বেশ, এক ভাবের—পাগল। সুন্দর গান করে ও ভাবে নাচে। সঙ্গে কেহ নাই, আপন মনে আছে, শুনিলাম, স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

দুপুরে মা কয়েকটী কথা বলিলেন। মা শুইয়া আছেন, আমি বসিয়া আছি, ঘরে অন্য লোক নাই। মা বলিতেছেন, "দেখ এই যে কত সময় হয়, কথা বলিতে বলিতে আর বলিতে পারি না, বাহির হয় না; এ'র ভিতর অনেক কথা আছে, কখনও হয়, দরকার নাই, তাই হয় না অথবা উপস্থিত সকলের ভাবানুযায়ী কথা বাহির হয় না। আবার, কি রকম হয় জান? কথা বলিবারও ত একটা স্তর আছে, সেই স্তর পার হইয়া চলিয়া গেলে আর কথা বাহির হয় না। সব যেন লয় হইয়া গেল। নির্ব্বিকল্প সমাধি আবার যে ভাবের প্রকাশ, তখন, সেই ধরনা কেন? অবতারই বল, যাহাই বল, জন্ম গ্রহণ দেখা গেলেই, একটা সীমায় বদ্ধ

দেখা যায় ত ? সেই রকম, কতটা সময় কি রকম খেলিতে হইবে তাহাও ঠিকই থাকে, এই রকম দেখা যায়। সেই অনুযায়ী খেলা হইয়া যায়, তাহাই প্রকাশ পায় ; দেখ সীমার মধ্যে অসীম, অসীমের মধ্যে সীমা।

"আবার আর একটা কথা শোন, এই যে প্রসন্ন বাবুর স্ত্রী গান করিলেন সুর তালের কত ওস্তাদি শুনিলে ত ? যখন এই শরীরটা হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইত তাহা যে কত ছন্দে হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। সবই যেন অনন্ত, কত বলিব। একে একে, স্তোত্র না কি বল

ছন্দ হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইয়া ছন্দেই লয় হয়

তোমরা বাহির হইতে লাগিল, ছন্দের পর ছন্দ বাহির হইয়া যেন আবার ছন্দেই মিলাইয়া গেল। সুর তালই বা কত রকমের। সব গিয়া একে একে যেন, সুর সেই মহাসুরে, শব্দ সেই মহাশব্দে মিলাইয়া যাইত।"

আমি বলিলাম, "মা, কলিকাতা প্রমথ বাবুর বাসায় একবার তুমি হরিবোল কত সুরে বলিয়াছিলে তাহা শুনিয়া প্রফেসার খগেন মিত্র মহাশয়ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া ছিলেন, হরি-বোল যে এত সুরে হইতে পারে তাহা আমার

সুর অনন্ত

ধারণাই ছিল না। তিনি ত একজন সুগায়ক।" মা বলিলেন, "বলিতেছি যে সবই অনন্ত ওখানে আর কতটুকু বাহির হইয়াছিল। তবে তা'ও তোমরাই বাহির করিয়াছ, কারণ তোমরা যে যে ভাব নিয়া সম্মুখে উপস্থিত হও, সেই সেই ভাবের ক্রিয়াগুলিই অনেক সময় শরীরের মধ্যে হইয়া যায়, খগেন মিত্র সুগায়ক, তিনি গান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানা সুর বাহির হইল। সব সময় কিন্তু হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ত আমি কখনও গান শিখি নাই, গ্রামে যেমন মেয়েরা সকলেই গালে হাত দিয়া গান করিতে বসে, সেই রকমই ত। এত সুর কোথা হইতে বাহির হইল ?

তোমরা যেমন করাইয়া নিতেছ তাই হইয়া যাইতেছে। যতটুকু দরকার ততটুকুই হইতেছে। কেহ প্রশ্ন করিতে পার, কেন তুমি ভাল গায়ক হইলে না? এই 'কেন'র ত শেষ নাই, তবে ত ইহাও বলা চলে, কেন ইংরেজী কথা বল না? কেন তাহাদের পোষাক পর না? কেন মুসলমানের খাদ্য খাও না ইত্যাদি অনেক কথাই ত বলা চলে। তাই বলি, যাহা যাহা দরকার তোমরাই করাইয়া নিতেছ।"

আবার, এক সময়তে আমাকে বলিতেছেন, "দেখ, সাধকদের যে কত রকম অবস্থা হয় ধরা বড় মুস্কিল, কথা বাহির হয় না—এই ভাবটাও কত ভাব থেকে হইতে পারে। এক ত আছে, শিশুর; যেমন প্রথম যখন ভাষা বাহির হয়, 'বাব্বা' বলিয়া শব্দ করে আর কিছু বলিতে পারে না। এমন নয়, যে তাহার জানা আছে, তাহা বলিতেছে না, তাহার জানাও নাই বলিবার ক্ষমতাও নাই। আর একটা আছে, কোন একটা ব্যাপার দেখিয়া যুবক বা বৃদ্ধেরা—'আঃ' এই কি?' বলিয়া অবাক হইয়া নির্ব্বাক হইয়া যায়। শিশুও 'বাব্বা' বলিয়া নির্ব্বাক হইল আর কিছু ফুটিল না, যুবক বা বৃদ্ধেরাও নির্ব্বাক হইল। কিন্তু এই দুইটা ভাবের মধ্যে যেমন প্রভেদ অনেক দেখিতে পাও, সাধকদের মধ্যেও এই রকম পার্থক্য আছে। কাজেই বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সব সময় ধরা যায় না।"

সাধকদের একই বাহ্য অবস্থা হইলেও প্রভেদ থাকিতে পারে।

আজ বৈকালে শিশিরবাবু আসিয়া দাঁড়াইতে মা বলিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ না হাসিতেছ?" তিনি বলিলেন, "কেন বলুন দেখি?" মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করিলাম।" পরে তিনি বলিলেন, "মা, ঠিকই ধরিয়াছেন, আজ একটু ঘটনা আছে। তা' সকলের কাছে বলিব না, শুধু একা আপনার কাছেই বলিব।"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মা ছাতে রহিলেন। তারপর নীচে আসিয়া খাওয়া দাওয়া হইল। পরে দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আজও রাত্রিতে মা'র সঙ্গে একান্তে বসিয়া আছি। মা কথায় কথায় বলিতেছেন, "দেখ, শিশুরা প্রথম কি করে, না কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ করে মাত্র। কিন্তু জ্ঞান হয় নাই, তারপর ক্রমে ক্রমে শব্দ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে—কিন্তু তখনও জ্ঞান হয় নাই। তারপর, ধীরে ধীরে তুই একটী শব্দ বাহির হইল, তখন পর্য্যন্ত পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন তাহার সেবাই করিয়া যাইতেছে। তারপর যখন সে আরও একটু বড় হইল ২।৪টী কথা অস্পষ্ট ভাষায় বলিতে শিখিল, তখনই তাহার জিজ্ঞাসা—'এটা কি?' 'ওটা কি?' ইত্যাদি। তখন, সকলে তাহার জবাব দিতে লাগিল। সেও শিখিয়া লইতে লাগিল। জগত তখন তাহার গুরু হইল, আর সে জিজ্ঞাসু-শিষ্য। সাধকেরও ঠিক এই অবস্থা।"

শিশু ও সাধকের উপমা

২১শে চৈত্র, সোমবার—সকালে আজ মা উঠিয়া বসিয়াছেন। একটী ছেলে মাকে গান শুনাইতে আসিয়াছে। আরও অনেকে আসিয়াছেন। গান হইতে লাগিল। তারপর এইসব করিতে করিতে বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। মায়ের মুখ ধোয়াইয়া ভোগ দেওয়া হইল। আজ আর প্রাতে কিছু খাইলেন না। মা একবার বলিতেছিলেন, "এত টাইম মত তোমরা খাওয়া দাওয়া সব চালাইয়া শরীর আরও খারাপ করিয়া দিতেছ। পূর্ব্বে যেমন খাওয়া শোওয়ার কোন নিয়মই ছিল না, সেই রকম করিলে হয় না?" ডাক্তার সাহেব মা'র শরীরের অবস্থা দেখিয়া সেই ভাবে চলিতে দিতে সাহস পাইতেছেন না, বলিতেছেন, "মা, শরীরেরও ত একটা ধর্ম্ম আছে? আপনি নিজের ভাবে থাকেন, আর শরীরের দিকে খেয়াল হয় না। তাই শরীরটা নষ্ট হইয়া যাইতেছে।" কখনও ত খাওয়া

শোওয়ার নিয়ম চালান যায় নাই। কখনও হয়ত সারাদিন পর সন্ধ্যায় খাইলেন, কতটা সময় চলিল, খাওয়াই নাই; আবার হয়ত চলিল, যে আসিতেছে সেই কিছু কিছু মুখে দিয়া দিতেছে—মা'ও মুখে নিতেছেন। দেরাদুনে কিছুদিন বিশেষ ভাবে এই অবস্থা চলিয়াছিল। কাশীবাবুর স্ত্রী লছমী রাণী প্রভৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন যে মা সারাদিনরাত্রি ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকজন আসা যাওয়া করিতে পারিত ততক্ষণ পর্য্যন্ত, লোক কিছু না কিছু নিয়া আসিতেছে, আর মা'র মুখে দিয়া দিতেছে মা'ও মুখে নিতেছেন। কোন রকম বিরক্তিও নাই।

বৈকালে একটি লোক আসিল, সে গলায় এমন শব্দ করে যেন বাঁশী বাজিতেছে, আবার স্বরের মধ্য দিয়া বীনার শব্দ বাহির করে। সে কীর্ত্তনাদি করিল। মা গিয়া ছাতে বসিলেন, বহু স্ত্রী পুরুষ মাকে ঘিরিয়া বসিয়া কীর্ত্তনাদি শুনিলেন। সন্ধ্যার পর শিশিরবাবু ও গোপীনাথবাবু মাকে নিয়া বসিলেন। শিশিরবাবুর কি সব প্রশ্ন আছে। মাকে নিয়া শিশিরবাবু, গোপীনাথবাবু ও আমি দরজা বন্ধ করিলাম। গোপীনাথবাবু মা'র শরীর লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, "মা শরীরটা ভাল হওয়া দরকার।" মা হাসিয়া বলিলেন, "বলত বাবা কা'র শরীর?" গোপীনাথবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে আবার দার্শনিক তত্ত্ব নিয়া আসিলেন। আমাদের ভাবে বলিতেছি—আপনার শরীর।" মা বলিলেন, "তবে কিন্তু বাবা, আমিও তাই বলিব। আমাকে বলে আমি নাকি সোজাসুজি কিছু বলি না।" গোপীনাথবাবুও হাসিয়া বলিলেন, "মা আগেই কথা ঠিক করিয়া রাখিতেছেন।"

শিশিরবাবু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা এই যে অবতার সব আসেন অর্থাৎ

রাম বা কৃষ্ণ ইঁহারা সাধারণ জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা ?

অবতারদের পূর্ব্ব জন্ম আছে কি ?

কাহারা অবতরণ করেন। অবতারদের পূর্ব্ব জন্ম আছে কিনা ? যেমন রাম, কৃষ্ণ ইঁহারা পূর্ব্ব জন্মে জীব ছিলেন কিনা ?" মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই যে আছ সব, সবই ত অবতার।" শিশিরবাবু বলিলেন, "আমাদের বুঝিবার মত করিয়া বলুন।" তখন মা বলিলেন, "দেখ, রাম, কৃষ্ণ, এই সব অবতারদের পূর্ব্ব জন্ম আছে কিনা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলা হয়, কত রাম কত কৃষ্ণ ত আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু তোমাদের মত জন্ম নয়।" তখন শিশিরবাবু বলিলেন, আমাদের মত জীব হইয়া আসেন কিনা ?" উত্তরে মা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, জীব উচ্চস্তরে যাইতে যাইতে ভগবানের মত হয়, আর ভগবানের অবতার হইয়া জীবের মত ব্যবহারের প্রকাশ দেখায় মাত্র।"

তারপর, মা আবদারের সুরে গোপীবাবুকে বলিলেন, "বাবা তুমি এ'বিষয়ে একটু বল না, শাস্ত্রে কি আছে।" গোপীবাবু বলিলেন, "দুই রকম আছে। এক হইল, সাধক উচ্চস্তরে উঠিতে উঠিতে ভগবানের মত হইয়া যায়, আর এক, ভগবান স্বয়ং।" শিশিরবাবু প্রশ্ন করিলেন, "এই দুইয়ের মধ্যে অবতার হইয়া আসেন কে ?" মা উত্তরে বলিলেন, "স্বয়ং ভগবানই প্রকাশ হন। তিনি যে স্বয়ম্ প্রকাশ। তিনিই যে সব—সর্ব্বভাবে ও রূপে। একেতে যিনি রন, ভাগে ভাগেও তিনিই হ'ন। পূর্ব্ব, পর জন্ম তোমার কাছে। সর্ব্ব জন্মই যে তাঁর জন্ম, আবার তাঁহার ত জন্মই নাই। পূর্ব্বে পরের প্রশ্ন কোথায় ?"

শিশিরবাবু প্রশ্ন করিলেন; "তবে কি যাঁহারা সাধনা করিতে করিতে ভগবানের মত হইয়া যান তাঁহারা আর আসেন না ?" মা বলিলেন, "তাঁদের আর আসা যাওয়া কি করিয়া থাকে ? আসা যাওয়ার গণ্ডি

ছাড়াইবার জন্যই ত সাধনা। আবার একভাবে বলিতে পার তাঁহারা আসেন, কেমন ভাবে আসেন জান, যেমন গঙ্গার জলে ঝরণার ও নালার জল আসিয়া মিলে, তারপর আবার গঙ্গা হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া নাও। সেই সঙ্গে যেমন নালার ও ঝরণার জলও আংশিক ভাবে আসিল, কিন্তু বলা হইবে কি, না, 'এক ঘটি গঙ্গাজল নিয়া আসিলাম।' ঝরণা ও নালার জল গঙ্গায় মিশিয়া গঙ্গার জলই হইয়া গিয়াছে। কোনই পার্থক্য নাই।" মা শিশিরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমাকে না তুমি সোজাসুজি ভাবে তোমার বুঝিবার মত বলিতে বলিয়াছিলে, তাই সোজাসুজি ভাবেই বলিলাম। এ'ও কিন্তু একদিকের কথা। আবার দেখ, যে সব সাধক ভগবানের তুল্য হইয়া গিয়াছে—যদি স্বয়ং ভগবান অবতার হইলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের মত যে সাধক, তাঁহারাও আসিলেন। কারণ তাঁহারা যে ভগবানের সঙ্গে অভেদ হইয়া গিয়াছেন। যে যেদিকে দেখ্‌বে, ভেদেও পাবে, অভেদেও পাবে।"

মুক্ত পুরুষদের পুনর্জন্ম

শিশিরবাবু বলিলেন, "ভগবান ত পূর্ণ, তাঁর আবার দয়া করুণা এ'সব কি? যেমন গীতায় লিখিয়াছে—"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য"—ইত্যাদি কেন লিখিয়াছে? লোকের দুঃখ দেখিয়া কি করুণা হয়? তাই কি তিনি নামিয়া আসেন? তবে তাঁর করুণা দয়া আছে?" মা বলিলেন, "দেখ, তোমার করুণা দয়া ইত্যাদি আছে, তাই করুণা, দয়া প্রকাশ পাইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা করুণা-দয়া নয়।

"আবার, দয়া; তাঁর মধ্যে করুণা, দয়া না থাকিলে তোমরা পাইলে কোথা হইতে? তিনিই ত সব, সবটার মধ্যে তিনিই ত আছেন, করুণা দয়ার কোন প্রশ্নই নাই। আবার, করুণা দয়া তাঁহাতেই আছে, উভয়ই তাঁহাতেই। তিনি পূর্ণ বলিয়াই যে তাঁহাতে

সব সম্ভব। এই যে বলিলে, কি রকম জ্ঞান? ইহা তাঁহার একটা স্বাভাবিক গতি মাত্র। যেমন মেঘ হইলেই গর্জ্জন বিদ্যুৎ ইত্যাদি হইবেই, তাহাতে কোনরূপ ইচ্ছার দরকার হয় না। আবার ইচ্ছাটাও যে তাঁহাতে ক্রমেই স্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে। তেমনই, মেঘ অর্থাৎ লোকের হাহাকার উঠিলেই তাঁহার প্রকাশ স্বাভাবিক। এই যে বলা হইতেছে ইহাও কিন্তু এইরূপ, বলিতে গেলে, তিনি আবার আসিবেন কি? তিনি ত আছেনই। যেমন তুমি যাঁর, তাঁর প্রকাশ চাওয়াও তোমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই বলা হয়, নিজকে জানিলেই সব জানা হয়।"

তারপর একটা অবস্থার কথা বলিতেছেন, "একটা অবস্থায় গেলে আর কথাই বাহির হয় না, সবই লয়ের প্রকাশ পায়। তাহারও একটা প্রকাশ থাকে, বলা হয়, কথা বাহির হইতেছে না। বাহিরের ভাবেও কখনও কখনও কথা ভিতর হইতে আসে, বাহিরের কোন বাধাতেই তাহা বাধা পায় না, বাহির হইয়াই যাইতেছে।"

নির্ব্বিকল্পের পরের অবস্থা

তারপর, কথা হইল, নির্ব্বিকল্পের পর আর কোন অবস্থা আছে কিনা? মা বলিলেন "আছে, নির্ব্বিকল্প সমাধির স্থিতিতে কাহারও শরীর ত্যাগ হইয়া যাইতেও পারে। আবার কাহারও নির্ব্বিকল্পে যাইয়াও, সুইচ বন্ধ করিয়া দিলেও পাখাটা যেমন চলিতে থাকে সেই রকম, তাহাদের শরীর থাকিয়া যায়, কারণ ছাড়া শরীর থাকিতে পারে না। সমাধি ত একটা অবস্থা না বাবা?" গোপীনাথ বাবু বলিলেন, "অবস্থাই ত মা"।

মা বলিলেন, "ঐ সবই ত এক এক দিকের কথা।" তারপর শিশি বাবু প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা মা, "নির্ব্বিকল্পের পরও যাহারা কোনও কথা

থাকিয়া যায়, তাহাদের কাছে জগতের নানাতত্ত্ব থাকে কিনা? এবং জগতটা তাঁহারা কি ভাবে দেখেন"—মা হাসিতে হাসিতে একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়াই তারপর বলিতে লাগিলেন, "দেখ বাবা, তোমার শরীরের হাত ধরিয়া কেহ যদি বলে—এ' কে? তুমি বলিবে—"আমি", পা ধরিয়া কেহ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবে—"আমি", আঙ্গুলটি ধরিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও বলিবে—"আমি", অথচ, পা, হাত আঙ্গুল এ'সব ভিন্ন নামেও এক আমিই, বলিবে। সেই রকম আর কি, ধর না?" শিশির বাবু বলিলেন, "এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই যে, একস্থানে দেখিতেছি—নর নারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার ত লিখা আছে, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—ইহার সামঞ্জস্য কি?" মা তখন বিশেষ-ভাবে গোপীনাথ বাবুর কাছে আব্দার করিতে লাগিলেন, "বাবা বল না, শাস্ত্রে কি আছে?" শিশির বাবু বলিলেন, "আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই।" মা বলিলেন, "বেশ আমি বাবার মুখে শুনিতে চাই, বাবা বুঝিয়াছে।" গোপীনাথ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "মা, এ'কথার জবাব দিবেন—যে যেই স্তরে দাঁড়াইয়া আছে, সে সেই স্তরের কথাই ত বলিবে। মা বলিলেন, "দেখ এই জাতীয় কথা বলিতে গেলে সবটার সঙ্গেই সবটার সামঞ্জস্য আছে দেখা যায়। কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না, সবই যে অনন্ত। ভোলানাথ আমাকে বলে "আপীলেশ্বরী" অর্থাৎ সব কথাই ঠিক বলি, কিন্তু আসল কথা কি জান, আমি যে দেখি সবটার সঙ্গেই সবটার যোগ আছে। সব কথায় 'হয়' 'হয়' করিয়া গেলেও চলে না, আবার না করিলেও ঠিক হয় না তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়। একত্বও অনন্ত। ইহা যে অতি সত্য কথা।"

২২শে চৈত্র, মঙ্গলবার—আজ রাত্রিতে মা আমার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ বলিতেছেন "দেখ, খেলা হইয়া গেল;

কি হইল জান? একটি স্থান, স্থানটি ভয়ানক সংকীর্ণ, যেন খসিয়া পড়িতেছে, ধরিবারও কিছু নাই। ঐ স্থানে কয়েকটি পুঁটুলি জাতীয় জিনিষ রহিয়াছে; খেলায় পালানো ভাবে সেইখানে এই শরীরটা যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরীরের পড়িবার মত অবস্থা। ওখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, "কেমন করিয়া আসিব?" এই শব্দ শুনিয়া নানাস্তরের দল আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, তাদের নিকট যাইবার জন্য অতি ব্যস্তভাবে রাস্তা করিয়া দিল। ঐ শরীরটা পুঁটুলীগুলি একটি একটি ধরিতেছে আর খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, এ শরীরটা ক্রমশঃ তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই শরীরটার দিকেই তাদের লক্ষ্য, তাই তাদের পুঁটুলী যে পড়িয়া যাইতেছে সে দিকে লক্ষ্য নাই। এ'র মধ্যে তাহাদের যে প্রধান সে, যে অগ্রসর হইয়া এই শরীরটাকে নিতে আসিল এবং ব্যস্ত ভাবে এই শরীরটাকে রাস্তা করিয়া দিয়াছিল, তাহাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার সন্তোষ হউক।" যিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তিনি এই শরীরটা"—এই বলিয়া নিজের শরীর লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "যাহাতে তাহার কাছে যায় সেই লক্ষ্যেই তিনি একমনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ খেলার উদ্দেশ্য কি মা। মা বলিলেন, "আত্মা পরমাত্মার লুকোচুরি খেলা আর কি? পুঁটুলীগুলি বাসনা কামনার গ্রন্থি আর কি। মন বুদ্ধিই রাস্তা করিয়া দিবার সহায়ক। যিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন তিনিই জীবাত্মা। প্রবেশ—পরমাত্মার নিজকে নিয়া নিজের লুকোচুরি খেলা।

একটি ঘটনা—আত্মা-পরমাত্মার লুকোচুরি খেলা

২৩শে চৈত্র, বুধবার—আজ কথা বলিতে বলিতে মা আমাকে বলিতেছেন, "সেদিন যে কথা হইল, হাত ধরিলেও তুমি বলিবে—'আমি'

পা ধরিলেও তুমি বলিবে—'আমি,' আঙ্গুল ধরিলেও তুমি বলিবে—'আমি' কথাটা কি জান? আগুনে কোন জিনিষ ফেলিলে তার যেমন স্বভাব তৎস্বরূপ করিয়া লওয়া সেই রকম স্বভাবে পৌছিলে তুমি যা' তাই। এক ছাড়া ত দুই নাই একেতেই সব লয়। এক বলিলেও বলা হয় না, দুই বলিলেও বলা হয় না, তাই অব্যক্ত। আবার ব্যাপার কি জান? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কোন কথাই নাই।" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আবার বলিতেছেন, "দেখ, এ সব কথা স্বভাবের কর্ম্ম দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিলে ঠিক ঠিক ধরিতে পারিবে না, গল্পের মত মনে হইবে।" আমি বলিলাম, "সৃষ্টি, স্থিতি অনন্ত, একত্বটা কি তবে?" মা বলিলেন, "ইহাই যে স্বভাব, স্বয়ং প্রকাশ। অখণ্ড আনন্দ চাওয়া যেমন তোমার স্বভাব। নিজেই হাতে তালি দিতেছে, নিজেই গান গাহিতেছে, নিজেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের পরে শান্ত হইয়া যাইতেছে।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "দেখ খুকুনী, কি সুন্দর তামাসা, তুমি নিজেই বেশী করিয়া খাইতেছ, আবার সাঁতরাইয়া মহা আনন্দে বহুক্ষণ স্নান করিতেছ, আবার নিজেই পেটের অসুখ ও সর্দ্দিতে ভুগিতেছ, আবার মনে করিতেছ, 'কতদিনে আমার এই সব রোগ দূর হইবে? আমি যেমন আগে ছিলাম তেমনি হইব', এই সব ভাবিয়া ব্যস্ত হইতেছ। আচ্ছা বলত, কি সুন্দর তামাসা! তাই বলি, যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু গ্রহণ কর। তা হলেই, যেমন তেমনটির প্রকাশ। তবেই দেখিতেছ, তুমি রোগী হইয়াও নিরোগীর আভাসটা সব সময়তেই তোমার কাছে স্থায়ী রহিয়াছে। তাই বলি, তখনও আনন্দ চাওয়া তোমার স্বভাব। অর্থাৎ, তুমি যা,' তাহাই চাহিতেছ।

"আবার, গুণগুলি যেই জাতীয়, তাহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়া, এক এক

মূর্ত্তির আকারে পরিণত। এর মধ্যে শুভ-মূর্ত্তি, অশুভ মূর্ত্তি নানাত্ব আসিয়া গেল। এই নানাত্ব হইতে একত্বে যাইতে হইলে শুভ মূর্ত্তির আশ্রয় নিয়া যাইতে হয়। এর মধ্যেই সগুণ নির্গুণ ইত্যাদি জাতীয় সব কিছুই আসিয়া যায়। তবেই না শিবের খেলা। আবার, সর্ব্বগুণ ও রূপের বিশেষ প্রকাশ অনুযায়ী "জীবকোটি", "ঈশ্বরকোটি" তোমরা যাহা বলিয়া থাক, সবই প্রকাশ হইয়া থাকে। পুনরায়, তুমি স্বভাবের কর্ম্মে যাইয়া তুমি যেমন পূর্ণ, সুস্থ, ছিলে, তেমন পূর্ণ, সুস্থ ও শান্ত। দেখ ত, কেমন বাহারের খেলা। খেলা না বলিয়া তোমরা কোথায় যাইবে? ঘরের ছেলে ঘরে।"

আবার বলিতেছেন, "দেখ, এই সব কথা কেন হইল শুন্‌বে? গঙ্গার উপরে বাড়ীতে আছি, দেখিতেছি সকলে গঙ্গায় খুব স্নান করে, সাঁতরাইতেছে, আবার খুব করিয়া কাশিতেছে, জ্বরও হইতেছে। আর সকলে পরম পরিতৃপ্তির সহিত খাইতেছে। কাহারও কাহারও জ্বর, সর্দ্দি ও পেটের অসুখ হইয়া পড়িতেছে, আবার ডাক্তারের বাসায় ত আছি, ঔষধ পত্রও দরকার মত দিতেছে। তাই এই সব দেখে শুনে কথাগুলি এসে গেল যে, আমি এখন কি করব বল!" হাসিতে হাসিতে এই সব কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।

একটি আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে মা ত কোন কথা সাধারণ ভাবে নিজে নিজে ইচ্ছা করিয়া বলেন না, যখন বাহির হইতে থাকে তখন কেহ শুনুক না শুনুক বলিয়াই যাইতেছেন। আজও এই রকম ২।১টী কথা বলিতে-ছিলেন। আমি ও দিদিমা বসিয়া ছিলাম, মা শুইয়া আছেন; আশ্চর্য্যের বিষয় আমি ও দিদিমা মার কথা শুনিলাম কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে ভুল। সব আমারও মনে রহিল না। মা হাসিয়া বলিলেন, "যাহা দরকার তাহাই ত হইবে।" দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তাঁরও কিছু মনে নাই। মা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে বল মা'র কাছে বসিয়া

লিখিতে পারি না, মা কিছু বলেন না। এখন দেখিলে ত ঘটনা চক্রে মুখ দিয়া বাহির হইল, তোমারও আপশোষ হউক। বেশ সুন্দর।”

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া এসব কথা বলিলেন। এখন দরজা বন্ধ করিলেও সব সময় চুপ থাকেন না। তবে আমাদের পক্ষের বাজে কোন কথাই শুনেন না, বা বলিতে দেন না, নিজের ভাবে যাহা আসে, তাহাই বলিয়া যান। আজও অনেক রাত্রি অবধি বলিয়া যাইতেছেন। আমি বলিলাম, “কত কি বলিতেছ মা।” মা বলিলেন, “আমি কি করিব, যাহা হইতেছে, তাহা বলিয়া যাইতেছি।”

আজ মৈমনসিংহ হইতে বিনয় বাবু ও জ্ঞানবাবু সপরিবারে আসিয়াছেন। ডাক্তারের বাড়ীখানি ভরিয়া গিয়াছে। ভোলানাথ সকলকে নিয়া আনন্দে খুব কীর্ত্তন করিতেছেন। কীর্ত্তনে তিনি যেন মাতিয়া যান, একটা আনন্দের ভাব এখন তাঁহার মধ্যে বেশ চলিতেছে। বাহিরে হরিদ্বারের চারিদিকেই আনন্দের মেলা।

২৪শে পৌষ, বৃহস্পতিবার—আজ ভোরেই গিরীন বাবু আসিয়া মঙ্গল আরতির গান আরম্ভ করিলেন। তারপর ভোলানাথ সকলকে নিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ওপারে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া আবার ধীরে ধীরে সকলে ফিরিলেন। ফিরিয়া আসিয়াও সকলকে নিয়া ভোলানাথ খুব কীর্ত্তন করিলেন। মহা আনন্দ!

কথায় কথায় আমার জিজ্ঞাসায় মার অবস্থার কথা আমাকে বলিতেছেন, ‘দেখ, কিছু সময় এমন গিয়াছে; দেব দেবীর আসন ত শরীরটার মধ্যে হইয়াই যাইত, এমন কি যে সব দেবতার চারি হাত সেই দেবতার ভাবটা যখন শরীরের মধ্যে খেলিত; তখন হাতের ভঙ্গি, দাঁড়াইবার ভঙ্গি এমন হইয়া যাইত, যেন আরও ২টা হাত আছে। আবার দেবতাদের যে সব

সাধনার অবস্থা—দেবদেবীর ভাব

জিনিষ থাকে, ঠিক ঠিক সেই সেই ভাবগুলি খেলিয়া যাইত। তবে, ঐ সব ত ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বৌ অবস্থায় সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছি, তারই মধ্যে হইয়া গিয়াছে। খেলা আর কি, সবই ত খেলা!"

দুপুর বেলা একজন আসিয়া কাপড় চাদর পড়াইয়া দিল। একটী ছেলে নিজের গান্ধীটুপী মাকে পরাইয়া দিল। মা হাসিতেছেন, সকলেই মার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মা আবার ছেলেটীকে নিজের চাদরখানা পরাইয়া দিলেন। মার, টুপী মাথায়, কাপড় চাদর পরা রূপ দেখিয়া সকলেই মার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। মা সব ঘরে ঘরে সেই পোষাকে দুষ্টামী করিতেছেন। খানিক্ষণ এই খেলা চলিল, তারপর আবার সব ছাড়িয়া গিয়া নিজের বিছানায় বসিলেন।

মার দুইটী হাতেই ব্যথা হইয়াছে, ডাক্তার ও অন্যান্য ভক্তদের কথায়, মা জামা গায় দিয়াছেন। শরীরটাতে রোজই একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে। ডাক্তার আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'মা আজ কেমন আছেন?' মা একটা না একটা রোগের কথা বলেন, আবার চুপি চুপি আমাদের কাছে হাসিয়া বলেন, "ডাক্তার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিল, সাবধান মত রোগীর ব্যবস্থা করিতেছে, রোগী সাজিয়া, রোগের কথা বলিয়া বলিয়া ডাক্তারকে অস্থির করিয়া তোলা হইবে"—এই বলিয়া হাসিতেছেন।

২৫শে চৈত্র, শুক্রবার—সংজ্ঞাদেবীর মেয়ের গাড়ীতে আজ মা গঙ্গার ওপারে অচলানন্দ ব্রহ্মচারীর (কুলদা ব্রহ্মচারীর শিষ্য) আহ্বানে যজ্ঞ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়ও মাকে নিজের তাঁবুতে নিয়া গেলেন। মার চরণে পড়িয়া মার হাতখানা ধরিয়া বলিতেছেন, "মা আমার মাথায় একটু হাত দেও।" মা মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "মেয়েকে কি এই রকম বলে!" কিন্তু দরবেশ মহাশয় কিছুতেই শুনিতেছেন না;

কিরণচাঁদ দরবেশ

তখন মা বলিলেন, "উঠিয়া বস দেখি"। তিনি উঠিয়া বসিতেই মা তাঁহার মাথায় গায়ে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, বলিলেন, "এক মাথায় স্পর্শ করিতে নাই, সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলাম।" তিনি কৃতার্থ হইয়া ছল ছল চোখে মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

খানিক পরে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। প্রতিদিনের মত বৈকালে সকলে মার দর্শনে আসিলে মাকে নিয়া ছাতে বসান হইল। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করিয়া মাকে নীচে নিয়া আসা হইল। রাত্রি ১০টার দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

২৬শে চৈত্র, শনিবার—আজ রাত্রিতে মা কথায় কথায় নিজের অবস্থার কথা বলিতেছেন, "দেখ, মুদ্রা ইত্যাদি ত কিছুই আমার নামও জানা ছিল না, কিন্তু দেখিতাম কি জান? এক এক দেবতার প্রণাম এক এক রকম মুদ্রা দ্বারা হইতেছে।" আবার অঙ্গন্যাস করন্যাস হওয়ার কথায় বলিতেছেন, "যেমন ছবি দেখ না, গরুর গায়ে কত দেবতা আছে, সেই রকম এই শরীরের ভিতরও বীজ মন্ত্রে যেন ভরা, আর প্রত্যেক বীজের দেবতাও সঙ্গে সঙ্গে আছে। যখন ক্রিয়াদি হইত, তখন হাত দিয়া সেই সেই স্থান সব স্পর্শ হইয়া যাইত। পরিষ্কার সব দেখা যাইত। এই সবই সাধকের অবস্থাগুলি খেলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছি ত, যখন কাহাকেও ছোঁয়া হইত না, সেই অবস্থায় কেহ সামনে দিয়া গেলেও শব্দ না শুনিলেও হয়ত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছি, কিন্তু টের পাইতাম।" আমি বলিলাম, "কি করিয়া ইহা জানা যায় মা?" মা বলিলেন, "কি রকম জান? যেমন সূর্য্যের রশ্মি, সেই রকম একটা রশ্মি সর্ব্বদাই শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইত। কাজেই শরীর হয়ত ছোঁয়া যায় নাই, কিন্তু সেই রশ্মি ত সীমা বদ্ধ, সেই সীমার মধ্যে যদি কেহ আসিয়া পড়িত

সাধনার অবস্থা—মুদ্রা অঙ্গন্যাস, করন্যাস

তাহাতেই শরীরটায় ছোঁয়া হইয়া যাইত। তাহাতেই এই শরীরটা স্পর্শ না করিলেও নিকটে আসিয়া পড়িলেই টের পাওয়া যায়। এই সবই কিন্তু স্তর।"

২৭শে চৈত্র, রবিবার—আজ বিলাসের পৈতা হইল। ব্রহ্মচারীণীর বেশে তাহাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। ভোলানাথই আচার্য্য গুরু হইলেন। আজ কলিকাতা হইতে যতীশ গুহ, তাঁর মা ও মেয়ে, প্রাণকুমার বাবু সপরিবারে সব আসিয়াছেন। মার শরীর অসুস্থ বলিয়া অনেক সময় দরজা বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু ভক্তেরা মার দর্শনের জন্য অস্থির, তাই দরজা খুলিলেই ভয়ানক ভীড় হইয়া পড়ে।

আজ কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা মা, অপরের মনের ভাব কি করিয়া বোঝা যায়?" মা বলিলেন, "কি রকম জান?

অপরের মনের ভাব বোঝা

তোমরা যেমন হয়ত রান্না করিতে দেখ নাই, কিন্তু তরকারী খাইয়া বলিতে পার নুন মরিচ কম হইয়াছে, সেই রকম আর কি? আবার, কখনও কখনও হয় কি জান? হয়ত কি রান্না করিতেছে দেখ নাই, কিন্তু গন্ধেই বুঝিতে পারিতেছ কি পাক হইতেছে, সেই রকম, না দেখিয়া বা নাম না শুনিয়াও ভাবের কথা বলা যায়। আয়নার মত দেখা যায়। সব কথা বলাইলে না, যতটুকু বলাইলে—বলা হইল।

মার চরিত্রের কথা অলোচনায় নানা কথা উঠিতেছে। মার গায়ে একবার অনেক কিছু গহনা ছিল, ট্রেণে একটা পড়িয়া গিয়াছে মা দেখিয়াছেন, কিছুই বলেন নাই; নামিয়া গিয়া যখন আমরা গহনা দেখি নাই, তখন হাসিয়া বলিতেছেন, "গাড়ীতে পড়িয়াছিল দেখিয়াছি তোমাদের বলিবার ভাব হয় নাই, তাই বলিতে পারি নাই। কত জিনিষই ত পড়িয়া থাকে।" এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিতে লাগিলেন।

দুপুরে মা খাইতে বসিয়াছেন, রামতারণ বাবুও কাছে বসিয়া কিছু কিছু প্রসাদ পাইতেছেন সংজ্ঞা দেবীও কাছে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন। কি কথায় কথায় রামতারণ বাবু একটা দুষ্টামীর কথা বলিয়াছেন; মা হাসিয়া বলিতেছেন, "তুমি ভারি শয়তান।" সকলে হাসিতেই, মা বলিলেন, "শয়তান কি জান? স্বয়েতে যে-তান ধরেছে, তাহাকেই বলে শয়তান।" ঐ কথায় রামতারণ বাবুর মহা আনন্দ। আমরাও বলিলাম, 'মা এই একটা নূতন অর্থ বাহির করিয়াছে। এখন শয়তান কথাটী নিন্দার না হইয়া প্রশংসারই কথা হইবে।'

শয়তান অর্থ

আজ কয়দিন যাবতই ডান হাতখানায় খুব বেদনা। গ্ল্যাণ্ডগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে। বাম হাতেও অপর একটী বেদনা। মার ত খেয়াল থাকে না। আনন্দময়ী মুর্ত্তিতে সকলের সঙ্গেই আলাপ করিতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিতেছি শরীরটা যেন ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। একটা না একটা অসুখ লাগিয়াই আছে। ডাক্তার পান্থ বলিতেছেন, "মা, আপনি নিজের ভাবেই ভাল হউন, নতুবা আমরা কি করিতে পারি। ৫ দিন আমরা কিছু বলিব না। আপনি নিজের ভাবে এইটা ভাল করুন।" মা বলিতেছে, "একবার যখন শরীরে ঔষধ পড়িয়াছে। দেখ কতটা বাহির হয়, কত ঔষধ তোমরা দিবে!" এই বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

২৮শে চৈত্র, সোমবার—মার হাতের অবস্থা একই রকম চলিতেছে। ডাক্তার ও স্বামী অখণ্ডানন্দজী চিন্তায় পড়িয়াছেন। লোকে লোকারণ্য। সর্ব্বদাই হরিদ্বার মুখরিত হইয়া আছে। কোথাও যজ্ঞাদি হইতেছে, কোথাও ভাণ্ডারা হইতেছে; বাজনা দিন রাতই শুনা যাইতেছে। আমি একান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা মা, অখন্দভাবঘন কি?" মা বলিলেন, "যাহা স্থায়ী,

'অখণ্ডভাবঘন'

অস্থায়ী, অনিত্য, নিত্য, যাহা কখনও খণ্ড হয় না। এখন বুঝিয়া লও।" বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

আজ বিনয় সেন কি কথায় মাকে বলিতেছেন, "মা, তুমি এত দুষ্টামী কথা বোঝ কি করিয়া? তুমি ত ও ভাবের ভিতর যাও নাই"—তিনি ভাবিলেন মাকে নির্ব্বাক করিলেন। মা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, তোমরা যে সব কত রকমের লোকদের" বিচার করিয়া রায় দেও, কি করিয়া বোঝ? তোমরা কি সে সব কাজ করিয়া আসিয়াছ?" এই বলিয়া হাসিয়া দিতেই উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বিনয়বাবুও হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মিষ্টি জুতার বাড়ী দিয়াছ মা।" মা—"আমি যে কিছু বিচার করিয়া বলি, তা'ত নয়, যাহা বাহির হইয়া যায়। তবে আর একটি কথা শোন। এখানে যে বোঝাবুঝির প্রশ্ন নাই। তিনিই যে নানাভাবে নানারূপে, সত্ত-প্রত্যক্ষ। যা বল তাই।"

২৯শে চৈত্র, মঙ্গলবার—হরিদ্বারের বায়ুমণ্ডলও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শ্বাস ফেলা মুস্কিল। রাস্তা ঘাট সবই লোকে লোকারণ্য, তাই একটা কোলাহলের শব্দ দিন রাত লাগিয়াই আছে। কানে যেন তালা লাগিয়া যাইতেছে। আগামী কল্য স্নান। আজ কলিকাতা হইতে শচীবাবু, রায় বাহাদুর সুরেনবাবু, তাঁর মেয়ে ননী প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্থির হইয়াছে আগামী কল্য পাণ্ডের বাড়ীতে মার পূজা ও অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনাদি হইবে। আজ সন্ধ্যায় অধিবাস ইত্যাদি করিয়া রাখা হইল। গঙ্গার ধারে কীর্ত্তন হইবে।

৩০শে চৈত্র, বুধবার—আজ কুম্ভস্নান। ১২ বৎসর পর এই স্থানে এই যোগ। লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়াছে। পুলিশ এবং আরও কয়েকটী সেবা সমিতির দল। শান্তিরক্ষা করিতেছে! কিন্তু তবুও লোক আহত হইতেছে। অনেক

কুম্ভস্নান

কুসের কুটিয়া, তাবু, লোক থাকিবার জন্য তৈয়ার হইয়াছে, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়া সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে; অনেক সময় লোকও মারা যাইতেছে, ভয়ঙ্কর অবস্থা।

ভোর বেলা কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে—

"হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরেরাম, হরেরাম, রাম রাম হরে হরে"।

সকালে, প্রতিদিনের মত ভোলানাথ কীর্ত্তনের দল নিয়া বাহির হইলেন। গঙ্গার ধারে কীর্ত্তনের স্থানেও কয়েকজন নাম রক্ষা করিতে লাগিলেন। চারিদিক সাজানো হইয়াছে। মধ্যস্থানে মঞ্চ প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেলা প্রায় ৯টায় মার পূজা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত মন্মথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পূজা করিলেন।

পূজার পর মার ভোগ হইল। পরে বিশ্রাম করিবার জন্য দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু আজ মা বেশী সময় শুইলেন না। ভক্তেরাও মাকে দর্শন করিবার জন্যই ছুটিয়া এতদূর আসিয়াছেন, কেহ কেহ হয়ত ২।৪ দিনের বেশী থাকিতেও পারিবেন না। মা দুপুরে একবার নীচে কীর্ত্তনের কাছে নামিয়া গেলেন। পরে সকলের প্রার্থনায় গঙ্গায় গিয়া একটু নামিলেন এবং গঙ্গা হইতে মাথায় একটু জল দিলেন। ভক্তেরা তখনই সেই জল নিজেদের মাথায় দিলেন। অনেকে আর ব্রহ্মকুণ্ডে গেলেন না। মার চরণ-স্পর্শ গঙ্গাজল নিজেদের মাথায় দিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আজ মা ঘরে গরম জল দিয়া স্নান করিলেন। এদিকে দুইখানা হাতই ভয়ানক ব্যথা, নাড়িতেও পারেন না। সর্দ্দি ও জ্বর জ্বর ভাব। ডাক্তারকে বেশ ছেলেমানুষের মত সব দেখাইতেছেন। ডাক্তার বলিতেছেন "মা, আপনার মধ্যে ভাল হইবার ভাব একটু জাগান তাহা হইলে ওসব ব্যারাম ভাল হইয়া যায়, আমাদের এই প্রার্থনা রক্ষা করুন।"

রাত্রিতে ১০টার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিবার খানিক পরই মা আবার উঠিলেন। বৈকাল বেলা হইতেই দেরাদুন যাওয়ার কথা উঠিয়াছে। মা'ও বলিতেছেন, "বেশ চেষ্টা করিয়া দেখ।" কিন্তু সহরের যে অবস্থা তাহাতে বাহির হওয়া অসম্ভব। রাত্রি প্রায় ১১টায় মা নীচে কীর্ত্তনে গিয়া বসিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষ সকলে একত্রে মার নিকট কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মালা চন্দন সকলকে পরাইয়া দেওয়া হইল। ঝম্‌ঝম্ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মাকেও মালা চন্দন দিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে মা দাঁড়াইয়া তালে তালে হাত দোলাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন। মাকে ঐরূপ হাত দোলাইতে দেখিয়া ভক্তের দল আরও উচ্চৈঃস্বরে নাম করিতে লাগিলেন। চন্দ্রালোকে চারিদিক হাসিতেছে, তার মধ্যে গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এই নামের ধ্বনি কি যে মধুর লাগিতেছিল, উপস্থিত সকলেই তাহা উপলব্ধি করিতেছিলেন। বিশেষতঃ এই যোগ উপলক্ষে নানা স্থান হইতেই কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। সন্ন্যাসীর দল 'হর হর গঙ্গে' বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। গঙ্গার ওপার দিয়া সাধুদের শোভাযাত্রা যাইতেছে; সকাল বেলা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। রাত্রিতেও ২।১ দল হাতি, উট সাজাইয়া চলিয়াছে। আমরা মাকে নিয়া কীর্ত্তনে মাতিয়া আছি, ২।৪ জনের উপর নাম রক্ষার ভার দিয়া সকলেই গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি অনেক চেষ্টায় ২।৪টি স্ত্রীলোককে নীচে নামাইয়া কীর্ত্তনে নিয়া গেলাম।

সমাপ্ত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

পঞ্চম ভাগ

বিস্তারিত বিষয়-সূচী

(বিষয় অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে সজ্জিত)

মায়ের শরীরের সাধনার খেলা

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অপরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ	২৮৩
আসন ক্রিয়া ত্রাটক	২১১, ২১৩
ঋষি-ভাব	২২৩
একাত্মত্ব	২২০
কৃচ্ছ্র-সাধনা	২৭৯
কুমারী-পূজা	২৮৭
কালীমূর্ত্তী	১৫
গণ্ডুষের ক্রিয়া	১৫৪
জল ও বায়ু দর্শনে তদ্‌ভাবাপন্ন	২৮৫
দীক্ষার কথা	১৩৮, ২০১
দেবদেবীর পূজা	২৯৩, ৩৪০
পূজা-যজ্ঞ	২৩৫
প্রণামের নানা অবস্থা	৩১৬
পূর্ব্ব-কথা	১৫৩
পূর্ব্ব-কথা, শাহবাগের	২৮২
মার মধ্যে সাধকের বিভিন্ন অবস্থা	৩১৭
মুদ্রা অঙ্গন্যাস করন্যাস	৩৪২
শরীরের পরিবর্ত্তন	২৮৩
স্তব ও মন্ত্র	৩০১, ৩২৮
স্তব ও মন্ত্রের উৎস	২১৫

সূক্ষ্মে মায়ের দর্শন

"অখণ্ডভাবঘন মা"—কল্যাণ বনে	২৫৮, ২৬৬, ২৭৪, ৩০৫, ৩৪৪
আত্মা পরমাত্মার লুকোচুরি খেলা	৩৩৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
তারাপীঠে বিচিত্র দর্শন	২২০
রোগমূর্ত্তী—বালিকাবেশে	২৫৭, ২৬০
সূক্ষ্ম শরীরী	১৪

মায়ের সম্বন্ধে নানাকথা

আকর্ষণী	৭,৫৪
ইচ্ছা-অনিচ্ছা	২৩৭, ২৭৬, ৩০৯
এক ভাবেই আছেন	৩২৪
খেয়াল	২২১
গান	১৯৫
দূর-দৃষ্টি	২৬, ৪৯
নাম কি, বাড়ী কোথায়	২২৫
পড়াশুনা	২২২
প্রথম ঔষধ গ্রহণ	২৫৩
পূর্ণা মা	১২
প্রয়োজন রহিতা	১৪৩
বিবাহের সম্বন্ধ—ফটোগ্রাফ	৩০৫
রোগমুক্তি	৩২২
সর্ব্বময়ী মা	২৪৩
হাত ও পায়ের ছাপ	৩০৫, ৩১১
হাতে ত্রিশূল ও ধনুর্ব্বান চিহ্ন	১২৫
হিংসা করিলেও (মাকে) কল্যাণই হইবে	২৭২

আশ্রম ইত্যাদি

আশ্রম ও মা	৩০৬
রমণা আশ্রমের পূর্ব্ব-কথা	১৭১

বিষয়	পত্রাঙ্ক
রমণা আশ্রমের কালীমূর্ত্তি সম্বন্ধে নানাকথা	১৭৮, ৩০৯
জাতিভেদ ও মা	৩২১

মায়ের লীলা

অলৌকিক ঘটনা	১৯
আমাদের বিপদে মার কষ্ট	১৯০
গঙ্গার জামা দান	২৩
দীর্ঘ উপবাসের পর ভাত পথ্য	১২৭
ভাইজীর মহাপ্রয়াণের পর—মা	১০৮

মায়ের উপদেশ

অবতারদের মধ্যে ভাবের খেলা	১৩৬
অবতারদের পূর্ব্বজন্ম	৩৩৩
অজ্ঞেয় ব্রহ্ম কি উপায়ে জানা যায়	১৫৬
অদ্বৈত উপাসকদের অবস্থা	৩০২
অপরের মনোভাব জানা	৩৪৩
অর্থ—	
মায়া	১৮৩
শাস্ত্র ও শিষ্য	২১৭
শয়তান	৩৪৪
আসন প্রাণায়াম মনের গতি অনুযায়ী হয়	২৬৮, ২৮০
আধ্যাত্মিক অবস্থার বিচার প্রয়োজন	১৮১
একই বাহ্য অবস্থায় স্থিতির পার্থক্য	৩৩০
এক ছাড়া দুই নাই	৩৩৮
কৃষ্ণ-তত্ত্ব	২৩৯
রাধাকৃষ্ণ-লীলা অদ্বৈতের খেলা	১৮২

বিষয় | পত্রাঙ্ক

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ১৪৯
গুরু চিনা ২৩৩
গুরুর আদেশ পালন ১৪১
ঘা দিলেই শক্তি জাগরিত হন ২১৪
"চলিতে থাক, হিসাব করিও না" ২৭০
দীক্ষা ছাড়াও শক্তিসঞ্চার করা চলে ৩২৫
নামসাধনা ১৪১
পূর্ব্বজন্ম ১৫৬
অবতারদের ৩৩৩
মুক্ত পুরুষদের ৩৩৪
ভগবান আছেন ৩২৭
ভগবানের দয়া— ২৯৮

মায়ের লীলা সহচর

অভয় ২২৮
উদাসের উপনয়ন ৩১০
কালীকান্ত বিশারদ ও নাপিত কন্যা ১৯৩
কুম্ভ-স্নান ৩২১, ৩৪৫
কিরণ চাঁদ দরবেশ ৩৪১
জ্যোতিষ দাদা
অসুস্থতা ৮৩
মা মৌণী ৯১
মৃত্যুশয্যা ৯৩
মহাপ্রয়াণ ৯৯
সন্ন্যাসের বিবরণ ১০১, ১৭৪
ডাক্তার পান্থের দর্শন ২৬৯

বিষয়	পত্রাঙ্ক
দাদামহাশয়	
মৃত্যুশয্যা	২১৯. ২২৬, ২২৮
বৈরাগ্য—	২৩১
সন্ন্যাস	২৩৭, ২৪৫
দু'চার জনের মনোভাব, মার সম্বন্ধে	১২১
নমাজের সময় মাকে দর্শন	১৬৫
নন্দুর অমঙ্গল কাটাইতে ডান হাত অবশ	১৮৮
নরেশ দাদার মাকে দর্শন—শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়	১৭৮
পূর্ণানন্দ স্বামী	২৩৬
ফরাসী মহিলার দর্শন—জ্যোতির্ম্ময়ী মা	১৬৬
ভোলানাথ	
উৎসাহ	২৮
দীক্ষা	১৩৮
মায়ের প্রতি মাতৃভাব	২৯৩
ভৈরবী মা—	২০৯
রমাদেবী	২১
রামতারণবাবু—মার নানা নাম	১৩৮
লাবণ্যের ভাবাবেশ—	২৮৩
শ্রীকৃষ্ণরূপে মাকে দর্শন	১৬৮
শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ	১৮৩
শশাঙ্কবাবুর বাড়ীতে অঙ্গহীন বলি কাটাইতে মার পায়ে আঘাত	১৯০
শঙ্করী মা	৩০৮
শিশির রাহা	৩১৩
স্ত্রীলোকের উপবীত গ্রহণ	১৮৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সারদার সুন্দর অবস্থা	২৬৪
হরকুমার	১৮৫

মায়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

অনুসূয়া দেবীর মন্দির	১৪৬
আলমোড়া	৯৩
আহমেদাবাদ	১৩৭
আস্কোট	৯, ৮৭
কালাপানি	৩৬, ৭১
কর্ণালী	১৬৮
কলিকাতা	২১৮
কাশী	২৩০, ২৩৫
গণই ও বেণীনাগ	৬
গারবিয়ান	২৯
গৌরীকুণ্ড	৫৬
চান্দোদ	১৩২
ছাইলেক	২৮
ডেড়িঢাট	৮
ডাকুর—দ্বারকানাথের মন্দিরে অন্নলুট	১৬২
তাকলাকোট	৩০, ৬৪
তারাপীঠ	২০৯
দীপ্তি	২৪
দেরাদুন	১১৬, ২৪৬
ধারচুলা	১১, ৮৩
ধানকেনা	৫৩

বিষয়	পত্রাঙ্ক
নর্ম্মদা	১৪৪
পঙ্গু	২৩
বারছিনা	১
বালিয়াকোট	৯
বোধি	২৭
বুন্দ	৫৩
বেরেলী	১১৫
ব্যাস	১৪৫
বরোদা	১৫১, ১৬৪
বিন্ধ্যাচল	২৩৫
বর্দ্ধমান	২২৬
মানস সরোবরের পথে দস্যু	৪৬
রংগুং	৪৪
রাক্ষস তালাও	৫০, ৬২
রমণিকা আশ্রম	১৭৩
রায়পুরে মায়ের জ্বর	২৪৯
লিপুপাস	৩৯, ৭০
লামাদের মন্দির	৫১, ৬৭

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থাবলী

সদ্‌বাণী, (বাংলা)—৺ভাইজী	১৲
ঐ (গুজরাটি অনুবাদ)—শ্রীকান্তি ভাই ব্যাস	১৲
ঐ (ইংরাজী অনুবাদ)—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	১৲
মাতৃদর্শন—৺ভাইজী—দ্বিতীয় সংস্করণ	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী (১ম ভাগ)—ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া	২৲
(২য় ভাগ)— দ্বিতীয় সংস্করণ	২৲
(৩য় ভাগ)	২৲
(৪র্থ ভাগ) দ্বিতীয় মুদ্রণ	২৲
(৫ম ভাগ)	২৲
(৬ষ্ঠ ভাগ)	২৲
(৭ম ভাগ)	২৲
ঐ ১ম ভাগের হিন্দি অনুবাদ—ডাঃ পান্নালাল	২৲
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, প্রত্যেকটি	১৲
মা আনন্দময়ীর আগমনে—শ্রীঅরুণ প্রকাশ বন্দোপাধ্যায়	॥৵০
মা আনন্দময়ীর বাণী—অভয়	॥০
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী লীলা-কথা, ১ম খণ্ড—অভয়	১॥০
মা আনন্দময়ীর কথা ”	॥০
Ma Anandamoyee—by Devotees.	৩॥০
মা—(মায়ের ৬খানি তুই বর্ণ চিত্র সম্বলিত বাংলা এ্যালবাম্)	১॥০
MA— ৬খানি তুই বর্ণ চিত্র সম্বলিত ইংরাজী এ্যালবাম্)	১॥০

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রী কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দময়ী আশ্রম পুস্তক প্রকাশ কেন্দ্র, বি ২।৭৪ ভদৈনী, বেনারস ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

১। কিষণপুর, দেরাদুন

২। রায়পুর „

৩। ডোঙ্গা „

৪। উত্তরকাশী, টীহরি, গাড়ওয়াল

৫। পাতালদেবী, আলমোড়া

৬। অষ্টভূজা পর্ব্বত বিন্ধ্যাচল

৭। বি ২।১৪ ভদৈনী, বেনারস

৮। ভীমপুরা; নর্ম্মদাতীর, চান্দোদ্, গুজরাট

৯। ৪।৪ একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা

১০। স্বর্গদ্বার—সমুদ্রতীর, পুরী

১১। রমণা, ঢাকা

১২। সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা

১৩। খেওড়া, ত্রিপুরা